মেম বোষ্টমী

রমাপতি বসু

ত্রয়ী c/o সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

[] প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯॥

[] শ্রীমতী দেবযানী ঘোষ কর্তৃক বি ১/৯৫ কল্যাণী,
নদীয়া হইতে প্রকাশিত ॥

[] শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী কর্তৃক স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স, ২নং ছিদাম মুদি লেন,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ॥

[] প্রচ্ছদ : শ্রীবিজন ভট্টাচার্য ॥

MEM BOSTOMI
A BENGALI NOVEL
BY RAMAPATI BASU

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু-র করকমলে

। ১ ।

রাধারানীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দয়াল আশ্রমের সামনে বেশ কিছু মানুষ সকাল থেকে জমায়েত হয়েছে।

সকলের মুখে শুধু এক কথা—'রাধারানীকে পাওয়া যাচ্ছে না'।

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাধারানী কি আশ্রমকন্যা? সে কি স্বেচ্ছায় আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছে, না অন্য কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় সে এমন কুকর্ম করে বসলো? দয়াল আশ্রমের প্রধান ফটক আজ সকাল বেলা থেকেই বন্ধ। সর্বত্র বিষাদের ছায়া। যারা আশ্রমের সামনে ভিড় করেছিল তাদের মুখ থেকে শোনা গেল: রাধারানীর বিগ্রহটি ছিল অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী এবং সারা অঙ্গে ছিল মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণালঙ্কার। গত রাত্রে সন্ধ্যারতি ও ভোগনিবেদনের পর যথারীতি মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আজ প্রত্যুষে, স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে এসে প্রথমেই লক্ষ্য করেন মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং রাধারানীর বিগ্রহটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দ আশ্রম-প্রহরীদের ডেকে পাঠান এবং ক্রমে এই দুঃসংবাদ আশ্রমবাসীদের গোচরীভূত হওয়ায় 'দয়াল আশ্রম' মুহূর্তে বিষাদময় হয়ে ওঠে। সকলেই কেমন যেন হতবাক বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

স্বামীজীর নির্দেশে আজ আশ্রমের প্রধান ফটক বন্ধ রাখা হয় এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এ সংবাদ জানানো হয়।

সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ 'দয়াল আশ্রমে' এসে যথারীতি প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। এই তদন্ত চলাকালে পুলিশের সামনেই ভক্তদের মধ্যে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। আবার অনেকে অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। স্বামী মাধবানন্দকে বেশ চিন্তিত দেখা যায়। তবে তিনি বিশ্বাস করেন পুলিশের হস্তক্ষেপে এর একটা নিশ্চয় সুরাহা হবে। আর পুলিশ যদি সক্রিয় হয় তবে রাধারানীর বিগ্রহটি নিশ্চয় উদ্ধার হবে।

রাধারানীর বিগ্রহটি অষ্টধাতুর হলেও তা খুব প্রাচীন নয়। তাই যারা মূর্তি চুরি করে বিদেশে পাচার করে তাদের কাছে এ বিগ্রহের তেমন কোন মূল্য নেই। যদি কেউ স্বর্ণালঙ্কারগুলির জন্য চুরি করে থাকে, তবে তারা মূল্যবান জিনিস-গুলি খুলে নিয়ে বিগ্রহটিকে মাঠে ঘাটে বা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ফেলে দিতে পারে। কাজেই এখনই তৎপর হলে রাধারানীর বিগ্রহটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

স্বামী মাধবানন্দ এই আর্জি পেশ করলেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসারের কাছে। পুলিশ অবশ্য মোটামুটি প্রাথমিক তদন্ত করে এবং যাবার সময় বলে যায়, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এসে আরো তদন্ত করে যাবে।

ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরময় বিগ্রহ চুরির সংবাদটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো।

মেয়ে ভক্তরা রাধারানী চুরি যাওয়ার সংবাদ শুনে শুধু মর্মাহত নয়, একেবারে ভেঙে পড়েছে বলা যায়।

পুরীর স্বর্গদ্বারের অদূরে বিদুরের মন্দির। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে যে পথটি চলে গেছে—সেই পথে কিছু দূর গেলেই দেখা যাবে এই 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম'। যখন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই অঞ্চলে জনপদ বা লোকালয় বলতে কিছুই ছিল না। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। নবদ্বীপের শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাছে দীক্ষিত হয়ে শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী এই 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন; শ্রীকৃষ্ণরূপেই আমাদের মধ্যে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নরলীলায় মানুষের মনে ভক্তি, প্রেম ও বাৎসল্যরসের সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবও এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ। তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বাঙলা দেশে দেখা যায় নবজাগরণ। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলন উৎসবের সে এক অপরূপ সমারোহ। এই সময় গ্রামে গ্রামে দেখা গেল কবি, গায়ক ও ভক্তবৃন্দ। সকলের মুখে শোনা যায়—শুধু কৃষ্ণ নাম। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। আবার একথাও শোনা যায় সূর্যের যেমন জ্যোতির্বলয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা। অর্থাৎ একে অন্যের পরিপূরক। সারা বাঙলায় তখন নামগানের প্লাবন। এই নাম মাহাত্ম্য ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম দিয়ে যে গান—সে গানই হলো উপাসনার 'মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন: শ্রীকৃষ্ণ মানুষের আপনজন; তাকে মানুষের

ন আবদ্ধ করা যায়। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমই নিঃশ্রেয়স লাভের পরম য়, প্রেমই অমৃত। মানুষ চিরকাল অপবিত্র থাকবে কেন? কেন সে দিন অপবিত্র থাকবে? প্রেমেই তার পবিত্রতা আনবে, প্রেমই তাকে মুক্ত ব। প্রেমের প্রেমময়ী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় হৃদয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদমূলে াগতিই এই প্রেমপ্রাপ্তির প্রশস্ত পথ। তাই শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন: সর্বমানবই ব।

এই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে এসে 'দয়াল ম' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই নীলাচলে এসে লীন হয়ে গিয়েছিলেন; কারণে শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী এই স্থানটি আশ্রমের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে করেন। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।

এই সেই শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র। যিনি বিষ্ণু, তিনিই কৃষ্ণ, আবার তিনিই য়ণ। নারায়ণ বিষ্ণু ও কৃষ্ণের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে মহাভারতের পর্বে গীতার সংযোগ ঘটিয়ে।

শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী বিশ্বাস করতেন, নামগানের দ্বারা ঈশ্বরলাভ সহজ হয়। নামগানের মাহাত্ম্য প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

তাছাড়া পূজা অর্চনায় বিধিবদ্ধ কোন পদ্ধতি এই আশ্রমে তিনি প্রবর্তন ননি। শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চললে ভক্তির অনটন ঘটার সম্ভাবনা বেশী। াধ্য দেবতাকে যেভাবে স্মরণ করলে ভক্তমন তৃপ্ত হয়—সেই পথই প্রশস্ত। কোন কথিত সমারোহের প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণবরা তাই নামগানকে পূজা অর্চনার ক উপায় বলে মনে করে।

শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী উপলব্ধি করেছিলেন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলে বলে শলে গোপতনয়া রাধাকে আত্মসাৎ করেছিলেন। শ্রীরাধা আত্মসমর্পণে, দেহদানে হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের ভগবান। সংসার, সমাজ, স্বজন, সকল থেকে শ্রীরাধাকে মুক্ত করতে শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্যের কোন সীমা ছিল না। এ সবই চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বিশদভাবে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী নতুন ভঙ্গি, নতুন ভাব ও নতুন ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই বৈষ্ণবধর্মে নতুন মাত্রাযোগ দিয়েছিলেন। ধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও 'দয়াল আশ্রম' স্থাপনের মূলে কিন্তু পতিতকে উদ্ধার, ার সর্বধর্ম পরিত্যাগের বাণী সেই সঙ্গে বেদান্ত প্রতিপাদ্য রসের মিলনে যে বীয় পরিমণ্ডল গড়ে উঠবে, তার প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। আর সেই

সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন: সেখানে সকল শ্রেণীর মানুষের থাকবে অবাধ অধিকার।

স্বামী মাধবানন্দ শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'দয়াল আশ্রমের' পঞ্চ অধ্যক্ষ। রাধারানী যে অপহৃত হবেন—এতো মাধবানন্দের কল্পনাতীত। তিনি এই ঘটনায় মর্মাহত, কিন্তু সংকল্পে নির্বিশঙ্ক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করছেন।

স্বামী মাধবানন্দের মনে অস্থিরতা এবং তিনি মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ পাদচারণ করতে থাকেন। তারপর হঠাৎ দেখা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে উপবিষ্ট হয়ে 'দশাবতার বন্দনা' শুরু করলেন।

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। তুমি প্রলয় সাগর জলে নৌকারূপে অনায়াসে বেদসমূহকে ধারণ কর। মৎস্যরূপধারী তোমার জয় হোক। এই মীন হচ্ছে বীভৎস রসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে পৃথ্বী স্থির হয়েছেন। সেই ধরণীধারণের জন্যই তোমার পৃষ্ঠে চক্রাকারে শুষ্ক কঠিন ব্রণচিহ্ন। কূর্মরূপধারী তোমার জয় হোক। এই কূর্ম অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। স্বয়ং ধরণী তোমার দশনশিখরে বিলগ্না হয়ে শশিনিমগ্ন কলঙ্ক কলাবৎ অবস্থিতি করেন। শূকররূপধারী তোমার জয় হোক। বরাহ হচ্ছে ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। তোমার করকমলে অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভৃঙ্গ বিদলিত হয়। নরসিংহরূপধারী তোমার জয় হোক। নৃসিংহ বৎসল রসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। অদ্ভুত বামনরূপে দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কর। তোমার পদনখপৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিত্রতা বিধান করছে। বামনরূপধারী তোমার জয় হোক। বামন সখ্যরসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। তুমি ক্ষত্রিয়কুল বিনাশপূর্বক তাদের শোণিত সলিলে স্নান করিয়ে ধরণীর পাপ দূর ও তাপ প্রশমিত কর। পরশুরামধারী তোমার জয় হোক। পরশুরাম রৌদ্ররসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণাপরবশ হয়ে তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক বেদ সমূহের নিন্দা কর। বুদ্ধরূপধারী তোমার জয় হোক। বুদ্ধ শান্তরসের অধিষ্ঠাতা।'

'হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। ম্লেচ্ছসমূহকে বধ করবার জন্য তুমি ধূমকেতুর ন্যায় করাল তরবারি ধারণ করেছ। কল্কিরূপধারী তোমার জয় হোক। কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতা।' 'হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে। তোমার জয় হোক।'

প্রথমে যা অশ্রুত ছিল পরে তা মাধবানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে গীত হল। প্রণাম করে তিনি লক্ষ্য করেন—ভক্তবৃন্দ তাঁরই চারিপাশে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। সকলে ভক্তিরসে আপ্লুত।

এই সময় একজন বালক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল: রাধারানীকে পাওয়া গেছে। যাঁরা মন্দির চত্বরে এতক্ষণ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরা এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। অনেক ভক্তের মুখে অস্ফুট স্বর শোনা গেল: হে শ্রীহরি তোমার করুণা অপার।

স্বামী মাধবানন্দ উঠে পড়লেন। আশ্রমবাসীদের মধ্যে বেশ ত্রস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে শোরগোল না বলে আনন্দের আতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আশ্রমের প্রধান ফটক খুলে দেওয়া হলো। দেখা গেল পুলিশের একটি ভ্যান মন্দির চত্বরের সামনে এসে থামল। ভ্যান থেকে একজন পুলিশের অফিসার এসে স্বামী মাধবানন্দকে বিনীতভাবে জানালেন: রাধারানীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপহরণকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে।

মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন: রাধারানীকে কি অলঙ্কারসমেত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন?

পুলিশ অফিসার এর উত্তরে বললেন: বিগ্রহের কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের ধারণা বিগ্রহের বেশভূষা ও অলঙ্কার যথাযথ আছে। তবু আপনারা একটু দেখে নিন।

স্বামী মাধবানন্দ মনে মনে বললেন: হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে। তোমার করুণা অপার।

পুলিশ অফিসার মাধবানন্দকে নিরুত্তর থাকতে দেখে পুনরায় বললেন; আইন মাফিক অপহৃত দ্রব্য আসামীর বিচার ও শাস্তিলাভের পরেই প্রত্যর্পণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এর একটু ব্যতিক্রম দেখা যাবে। আমরা অপহৃত দ্রব্যের একটি তালিকা করে এনেছি। আপনি যদি সেই তালিকাটি নির্ভুল বলে মনে করেন, তাহলে আপনি তালিকাটিতে একটি দস্তখত করে দিন। এরপর বিগ্রহটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে আমাদের আর কোন অসুবিধা দেখা দেবে না।

আমাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

মাধবানন্দ পুলিশ অফিসারের কথামত রাধারানীর বিগ্রহটি ভ্যান থেকে নি এসে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের পাশে অর্থাৎ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই মত পুনর স্থাপন করলেন। তারপর সমবেত কণ্ঠে হরিধ্বনি দিয়ে ভক্তবৃন্দ করযো সাশ্রুনয়নে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

রাজ্য পুলিশের এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু অপহরণকারী দেখে সকলের মুখেচোখে বিস্ময়ের উদ্রেক লক্ষণীয়। অপহরণকারী আশ্রমবাসি দের খুব পরিচিত। নাম গোপীনাথ। একসময় সে এই আশ্রমেরই কর্মী ছিল উদ্যানের কাজে সে নিযুক্ত ছিল। তার এই দুর্বুদ্ধির জন্য সকলেই হতবাক ব যায়। গোপীনাথ যে এমন কাজ করতে পারে—তা প্রায় সকলেরই কল্পনাতীত কি উদ্দেশ্য ছিল? আর কেনই বা সে এমন কাজ করতে গেল তা কেউই সঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবে রাধারানীকে ফিরে পাওয়ার জন্য সকলেই আ আনন্দিত। সে কারণে আইন ও আদালত অপরাধীর যা শাস্তিবিধান করবে— তাই হবে। গোপীনাথকে তার কৃতকর্মের ফল পেতেই হবে। গোপীনাথ এই আশ্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিল। তার মধ্যে কোনদিনই অপরাধ প্রবণত দেখা যায়নি। উপরন্তু সে তার কার্যকালে সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে ভক্তিভাব ছিল। তবে কি গোপীনাথ কোন দুষ্টচক্রের হয়ে এমন কাজ করেছে? এ প্রশ্ন সকলেরই মনে, কিন্তু এ নিয়ে কেউ আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়।

গোপীনাথ ইচ্ছে করলে রাধারানীকে নিয়ে রাজ্যের বাহিরে কোথাও চলে যেতে পারত। স্বর্ণালঙ্কারগুলি বিক্রি করে সে যথেষ্ট লাভবান হতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি। উপরন্তু পুলিশের কাছ থেকে শোনা যায়; গোপীনাথ নিজের বাড়িতে রাধারানীকে নিয়ে গিয়ে সারা রাত ধরে সে পূজা করেছিল।

গোপীনাথ রাধারানীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তার মধ্যে চৌর্যবৃত্তির চেয়ে ভক্তিভাবের লক্ষণই বেশী দেখা যায়। কিন্তু আইন তার পথে চলবে। গোপীনাথ চুরির অপরাধে অপরাধী। সে যে-কোন কথাই বলুক না কেন— আদালত তা বিশ্বাস করবে না। ধর্মভাবে আঘাত করা ও মূল্যবান দ্রব্য অপহরণের জন্য যে দণ্ডবিধান আছে—তা তাকে পেতেই হবে। এর কোন হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই।

। ২ ।

'দয়াল আশ্রমে' আজ মহোৎসব। নব সাজে সাজানো হয়েছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। পীত বসন। হৃদয়ে বিরাজিত মণিমালা, শ্যামল সুন্দর দেহ। লাবণ্য যেন নীলমণির দর্পণ। কুসুমিত কেশপাশে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া। মনে হয় চন্দ্রিমার আলোয় বিরাজিত শ্রীরাধারমণ। ললাটে চন্দন তিলক। কি মনোহর বদন, আর অধরে রসাল মুরলী। অপরূপ সে রূপ। যেন শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত মুখমণ্ডল। ঘনশ্যাম তনুকান্তি। নয়ন শতদল। ভুরু যুগলের ভঙ্গিমা দেখে মনে হয় যেন ভ্রমর সারিবদ্ধ হয়ে মধুমত্ত।

শ্রীরাধারমণের পাশে নবসাজে সজ্জিত হয়েছেন শ্রীরাধা। মেঘমালার সঙ্গে যেন বিদ্যুল্লতা। তাঁর বক্ষের অর্ধভাগ হতে অঞ্চল শিথিল হয়ে পড়েছে। নীল-বসনা গৌরাঙ্গীর মুখে ঈষৎ হাসি, অর্ধেক নয়নে তরঙ্গ। অর্থাৎ নয়নে কটাক্ষ চাহনি। অর্ধেক অঞ্চলে আবৃত অর্ধেক পয়োধর দৃষ্টিগোচর হয়। অধর বিম্বফল সদৃশ, দন্তরাজি দাড়িম্ব বীজ। একে গৌর তনু, তার উপর স্বর্ণনির্মিত কৌটার ন্যায় পয়োধরে কাঁচলি যেন কামদেব। বক্ষের উপর বিলম্বিত হার যেন মনকে বন্দী করবার জন্য প্রসারিত কামদেবের ফাঁস।

বিদ্যাপতি 'শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ' বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীরাধার এইরূপ বর্ণনা করেছেন :

'এক তনু গোরা কণয় কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাস।
হার হরল মন জনু বুঝি ঐ সন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দখন মুকুতাপাতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আসা ॥'

বিদ্যাপতি বলেন—মুক্তা পঙক্তির ন্যায় সুন্দর দশন অধরে মিলিত হয়েছে।

সখীদের সহিত মৃদু মৃদু কথা বলছে। দেখে দেখে আশা মিটল না, অতএব সেই দুঃখ রহে গেল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নব সাজে সজ্জিত। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। কিছু বিদেশী ভক্ত এসেছেন—তাঁরা এ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত নন। রথযাত্রা উপলক্ষে অনেকে পুরীতে এসেছেন তাই এসে উৎসবে যোগদান করেছেন। এঁরা কৃষ্ণভক্ত, সে কারণে মহোৎসবে যোগদান স্বাভাবিক। কিন্তু 'দয়াল আশ্রমে' বিদেশী কিছু ভক্ত আছেন—যাঁরা একসময় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন তাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্থানীয় বাসিন্দারা এঁদের সাহেব বা মেম ভক্ত বলে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সময় উল্লেখ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব বিদেশীরা ভক্তাগ্রগণ্য। শুধু বেশভূষায় নয়—আচার আচরণে এরা পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের সার বস্তুটি এঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

আশ্রমে আজ পূজা অর্চনা ছাড়া, নামকীর্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। স্বামী মাধবানন্দ পূজাপাঠ শেষ করে আরতি করছেন। কাঁসর, ঘণ্টা, শ্রীখোল, করতাল ও শঙ্খ ধ্বনিতে হয়ে উঠেছে মুখরিত 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম'।

জনৈক বিদেশী ভক্ত পরমানন্দ গোস্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরতি লক্ষ্য করছিলেন। আরতি শেষ হয়ে যাবার পর ভক্তটি পরমানন্দকে পঞ্চপ্রদীপের তাৎপর্য সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। আসলে উক্ত ভক্ত ইতিপূর্বে বহুস্থানে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে দেবদেবীর আরতি দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মনে সর্বদাই প্রশ্ন জেগেছিল এই পঞ্চপ্রদীপ সম্পর্কে। এ কি ধর্মীয় সংস্কার না পূজার উপাচার? না অন্য কোন তাৎপর্য আছে?

অন্য কারুর কাছেই এই প্রশ্নটি করতে সাহস হয়নি ভক্তটির। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তিনি পরমানন্দ গোস্বামীকে কাছে পেয়ে তাঁর জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

পরমানন্দ বললেন: পঞ্চপ্রদীপ হচ্ছে একটি প্রতীক। এ প্রতীক পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি চেতনা পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি আলোক শিখারূপে কল্পনা ও গ্রহণ করা হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা এ মহাবিশ্বজীবন হতে যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করে থাকি। এ বিশ্বজীবনকে বরণ ও গ্রহণ করার মাধ্যম হলো এই পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ ও উপলব্ধিতে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

প্রদীপ্ত হয়। আর এর ব্যতিক্রম হলে অর্থাৎ কোন একটির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি বিবেক বুদ্ধিলোপের কারণ হয়। তাই সকল ধর্মের সাধনমার্গের মূলকথা—ইন্দ্রিয় জয় করা। পঞ্চেন্দ্রিয়ের শিখায় পরমাত্মার আরতি করা। পঞ্চপ্রদীপ তারই প্রতীক। ঈশ্বর সাধনায় ও মুক্তিচেতনায় ভক্ত ও সাধক এই দেবারতিই করে থাকেন।

পরমানন্দের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন বিদেশী ভক্তটি। তিনি কিছুক্ষণ পরমানন্দ গোস্বামীর দিকে মুগ্ধাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বলে উঠলেন : হরে কৃষণ, হরে কৃষণ।

পরমানন্দ বুঝলেন ইনি ইস্কনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বোধহয় ভদ্রকে যে কেন্দ্র আছে সেখান থেকেই এখানে এসেছেন। এ নিয়ে আর অন্য কোন কথা হলো না। পরমানন্দ স্থানত্যাগ করলেন।

এক সময় এই আশ্রমের নাম ছিল 'শ্রীশ্রী ৶ রাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম।' পরবর্তী-কালে সেই আশ্রমের রূপ ও চরিত্র সম্পূর্ণ বদল হয়ে যায়। শ্রীমদ্ শতপথ গোস্বামী আশ্রমের কার্যাবলী পূজা অর্চনা ও নামসংকীর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনিই আশ্রমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার, গুরুকুল স্থাপনা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পতিত জমিতে কৃষিকর্মের প্রবর্তন করে আশ্রমকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসী হন।

তাঁরই প্রবর্তিত মত ও পথে আজও 'দয়াল আশ্রম' পরিচালিত হয়ে আসছে। স্বামী মাধবানন্দ হচ্ছেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর দীক্ষিত শিষ্য। বর্তমানে তিনিই আশ্রমের কর্ণধার। স্বামী মাধবানন্দ বয়সে নবীন, কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাবান বলে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। দয়াল আশ্রম একদিকে যেমন সাধনপীঠ বলে পরিচিত, অপরদিকে সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনমানসে চিহ্নিত।

আজকের জনসমাবেশ দেখে মনে হবে—এ যেন ভারততীর্থ, পুণ্যতীর্থ। বহু মানুষের সমাগম। দেশী ও বিদেশী ভক্তরা এই উৎসবে যোগদান করেছেন। ভক্তদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা আছেন। পরিধানে কারুর গৈরিক বসন, আবার কারুর বা শ্বেতশুভ্র। মুখমণ্ডলে রসকলি চিত্রিত ও কণ্ঠে তুলসীমালা। এঁদের অনেকের হাতে জপমালা। ছোট বটুয়ার মধ্যে জপমালা নিয়ে জপে চলেছেন। একি মোক্ষলাভের অভীষ্ট পথে যাত্রা, না শ্রীহরির সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল বাসনা? নামজপের মাহাত্ম্য আছে। এতে শুদ্ধাভাব আসে।

দয়াল আশ্রমে কয়েকজন বিদেশিনী ভক্ত আছেন। তাঁরা গৃহী নাম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবী হয়েছেন। এখানে এঁরা রঞ্জাবতী, দেবলীনা, কৃষ্ণা, রুক্মিণী প্রভৃতি নামে পরিচিতা। অবশ্য সকলেরই নামের শেষে দাসী যুক্ত আছে। এঁরা সবাই স্বামী মাধবানন্দের শিষ্যা। বিদেশী ভক্তদের মধ্যে এখন মাত্র দুজন আছেন। এঁরা হচ্ছেন—কৃষ্ণচৈতন্য দাস ও চিদানন্দ দাস। এই সব ভক্তরা দয়াল আশ্রমের নানা কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

দয়াল আশ্রমে উৎসবের সংবাদ শুনে বহু কৃষ্ণভক্ত এসে সমবেত হয়েছেন। পুরীর দেবরথ দেখার জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে এঁরা এসেছেন। মুণ্ডিত মস্তক, শিখা ও রসকলি চিত্রিত মুখমণ্ডল। প্রথম সম্ভাষণে বলেন: হারে কৃষণ, হারে কৃষণ।

নানা গোষ্ঠির মানুষের সঙ্গে এঁরাও এসেছেন। এঁরা কৃষ্ণভক্ত এবং নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেন। ইস্‌কন—যার ইংরাজি নাম ইণ্টারন্যাশানাল সোসাইটি ফর কৃষণ কন্‌শাসনেস। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই কৃষ্ণচেতনার কেন্দ্র। প্রথম এর যাত্রা শুরু হয় আমেরিকায়। তারপর ধীরে ধীরে এশিয়া, ইওরোপ, ডারবান, নাইরোবি, মোমবাসা, মরিসাস প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভারতেও এই সংস্থার আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভদ্রক, ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, তামিলনাড়ু ও বৃন্দাবনে শাখা আছে। আর পশ্চিমবাঙলায় আছে—কলকাতা, মায়াপুর ও হরিদাসপুর সীমান্তে ছয়ঘরিয়ায়।

দেবারতির পর গৌরশক্তি ও রঞ্জাবতী উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জানালেন: আপনারা পাশের মাঠে উপস্থিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করুন ঐ স্থানে আমরা পঙক্তি ভোজনের আয়োজন করেছি।

রঞ্জাবতীকে প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ রাধারানী এসে উপস্থিত হয়েছেন। রঞ্জাবতীর গৌর তনু। তাঁর লাবণ্য জল, কুন্তল শৈবাল, মুখমণ্ডল যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, অলকরূপ ভ্রমর তাতে শোভা পাচ্ছে। নয়ন নীলকমল, নাসিকা মৃণাল দণ্ড, গণ্ড যুগলে অসংখ্য মহুয়া ফুল শোভা পাচ্ছে। রঞ্জাবতী যেন সরোবরময়ী। ওঁর হাস্যকুমুদ ও দন্ত পুন্নাগ পুষ্প, ব্যক্ত অধরে তা প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। বাহু মৃণাল, করতল নিশ্চয় রক্তপদ্ম। অপরূপ স্তনদ্বয় যুগল চক্রবাক, নাভিস্থানে ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। রঞ্জাবতীর ত্রিবলী ঘাটের স্বর্ণরচিত সোপান। আর গুরু নিতম্বপাট শিলারূপে বিদ্যমান। বিধাতা শোভিত জঘনে স্বর্ণপাট আরোপণ করেছেন। গুরু উরু যুগল মৃণালদণ্ড, পদদ্বয় হেমকমল। অনুমান করা যায়

নূপুর পরিহিত হলে—না জানি নিক্কণ ধ্বনি ভ্রমর গুঞ্জন বলে ভ্রম হবে। বৈষ্ণব কোন কবি রঞ্জাবতীকে দেখলে রাধারানী বলে নিশ্চিত ভ্রমান্ধ হয়ে যেতেন। কিন্তু না রঞ্জাবতী আশ্রম কন্যা। পূর্বাশ্রমে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পিতা ও ফরাসী মাতার একমাত্র কন্যা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী এবং পরবর্তীকালে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। আসল নাম রোজি শেরউড। ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ থাকার জন্য সব কিছু ছেড়ে তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ভারতে এসে তিনি বিভিন্ন আশ্রম ও মঠে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু কোথাও তাঁর মন বসেনি। অবশেষে তিনি এসে উপস্থিত হন দয়াল আশ্রমে। স্বামী মাধবানন্দই তাঁর রোজি শেরউড নামের পরিবর্তে তাঁকে 'রঞ্জাবতী' বলে অভিহিত করেন।

আশ্রমিকরা পঙক্তি ভোজনের সময় তদারকি করতে থাকেন। যাঁরাই আজ উপস্থিত হয়েছেন—তাঁরা যেন প্রত্যেকেই প্রসাদ পান সেদিকে সকলের লক্ষ্য। মহোৎসবের দিনে কোন মানুষই যেন প্রসাদলাভে বঞ্চিত না হন। সে দিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি। দেখতে দেখতে মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন হয়ে গেল। এই মহোৎসবে সকলেই তৃপ্ত ও আনন্দিত।

সন্ধ্যায় আর একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রখ্যাত পণ্ডিত গৌরীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ 'বিষ্ণু—বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস' শীর্ষক আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন। এই সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যোগদান করবেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ তদনুরূপ সব ব্যবস্থা করেছেন।

প্রথমে মঙ্গলাচরণ করলেন পণ্ডিত গৌরীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ। তারপর তিনি শুরু করলেন :

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঋগ্বেদে বিষ্ণুদেবতার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ঋগ্বেদের সঠিক কালনির্ণয় নিয়ে বিতর্কের অবতারণা দেখা গেছে, তবু এ কথা সত্য যে সাম্প্রতিক কালে কতকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদের এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করেছে।

প্রথমতঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে আর্য জাতির ভারতে আগমণের পূর্বে সিন্ধুনদের অববাহিকায় এক স্বতন্ত্র নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তার বিকাশকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ বলে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর ওদিকে ঋগ্বেদকে স্থাপন করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে হিসাইট

নামে এক জাতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর প্রারম্ভে মেসোপটেমিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করে। এই রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অর্থাৎ উত্তর সিরিয়াতে মিট্টানি নামে আর এক জাতির রাজ্য ছিল। উভয় জাতিই প্রাচীন ভারত—ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করত। এই পরিবেশে একটি দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে—যার কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০। এটি একটি সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রে দেখা যায় একপক্ষে ছিলেন হিসাইটদের রাজা স্থবিলুলিয়াজু ও অপর পক্ষে ছিলেন মিট্টানির রাজা দসরত্তের পুত্র মত্তিয়ুয়াজা। এই সন্ধিপত্রে কয়েকজন দেবতার নাম স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয়। এঁরা সকলেই ঋগ্বেদে উল্লেখিত দেবতাগণ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের মানুষ ঋগ্বেদের দেবতাদের নামের সহিত পরিচিত ছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের কাল যুক্তিসঙ্গতভাবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়।

এই ঋগ্বেদে বিষ্ণু দেবতার কথা যা উল্লেখিত আছে, তাতে দেখা যায় ইনি খুব প্রভাবশালী না হলেও একজন প্রধান দেবতা যিনি সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবনে অবস্থিতি করেন। বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপের বিষয় আমরা অবহিত আছি। তাহলে তৃতীয় পদক্ষেপটি বলতে কি বোঝায়? সম্ভবতঃ এই তিন পদক্ষেপ সূর্যেরই আকাশে তিন স্থানে অবস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। তাহলে এই কথাই প্রমাণিত হয় বিষ্ণু হচ্ছেন ঋতুর নিয়ামক দেবতা।

এদিক থেকে বিচার করলে বিষ্ণু সূর্যেরই সমস্থানীয় দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে অসুর নিধন ধর্মে বরুণ, বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সহকারীরূপে দেখা গেছে। বিষ্ণুকে আমরা কখন দেখেছি দীক্ষাগুরু রূপে, আবার কখন বা দ্বাররক্ষী রূপে। মৈত্রী উপনিষদে পৃথিবীপালক খাদ্যকে ভগবৎ বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি পরম দেবতা।

আবার তাঁকে গোবিন্দ ও দামোদর বলা হয়েছে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম শ্রীবিষ্ণু যে পরমতত্ত্ব এবং অন্যান্য দেবতাগণ যে শ্রীবিষ্ণুর অন্তর্গত তা বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে কোন ধর্ম গড়ে ওঠেনি, তবে বৈষ্ণব শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের শেষ ভাগে।

এরপর বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। আর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আমরা দেখি: 'নারায়নায় বিদ্মহে বাসুদেবায়

ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।'

এখানেই দেখা যায় বিষ্ণু নারায়ণ ও বাসুদেব অভিন্ন। অর্থাৎ বিষ্ণু, নারায়ণ ও কৃষ্ণের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তক্ষশীলায় আনটিয়ালু কাইভাস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দূত হোলিয়োডোরাস কৃষ্ণ বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি একটি গরুড় মন্দির স্থাপনা করেন। এ ছাড়া মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়—কৃষ্ণ এর আরো দুইশত বছর আগে থেকে পূজিত হয়ে আসছেন।

ভারতবর্ষে মৌর্য ও গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজত্ব কাল থেকে বৈষ্ণবধর্ম নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং ক্রমে সাধারণ মানুষ এই ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাঙলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান শ্রী, মধু, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক। এর কোনটাই কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম নয়।

বাঙলাদেশের বৈষ্ণব সমাজে নতুন করে জোয়ার আনেন শ্রীচৈতন্যদেব। কৃষ্ণ-ভাবনায় তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, অপরদিকে তেমনি সহজিয়া ও কর্তাভজা সম্প্রদায়। আরাধ্য দেবতা এক হলেও আচার, বিচার, অনুষ্ঠান পর্ব ইত্যাদি একের সঙ্গে অন্যের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলেই কিন্তু কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা, ধর্ম ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান লক্ষণীয়।

শেষাস্তে আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি :

"তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।"

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে জ্ঞানীগণ সর্বদা দেখেন। যা উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

পণ্ডিত গৌরীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এইভাবে শেষ করলেন। এরপর অবশ্য অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। সভাশেষে ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্যরা শান্তভাবে সভাস্থল ত্যাগ করে যান।

। ৩ ।

পরমানন্দ গোস্বামী দয়াল আশ্রমের পরিপালক। তাঁর দায়িত্ব অনেক। আশ্রমের আয় ব্যয় থেকে আরম্ভ করে গুরুকুল, সেবা প্রতিষ্ঠান সব কিছুই তিনি দেখাশুনা করে থাকেন। স্বামী মাধবানন্দ পূজা অর্চনা ও আশ্রমের প্রধান উপদেষ্টা। সে কারণে পরমানন্দের ভাবনা চিন্তার কোন শেষ নেই। সর্বদাই তিনি ব্যস্ত। আশ্রমের যে কোন সমস্যার সমাধান বা যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব। তিনি প্রকৃত বিনয়ী ও সদাহাস্যময় রূপে আশ্রমের কাজে নিবেদিত প্রাণ।

পরমানন্দ বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। আশ্রমের এক প্রান্তে একটি নির্জন কক্ষে তিনি বাস করেন। এই কক্ষে সাধারণত কারোরই প্রবেশাধিকার নেই বললেই হয়। প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দ যখন বিশ্রাম করেন তখন আশ্রমের কেহই তাঁকে বিরক্ত করেন না। তা ছাড়া কতটুকুই বা বিশ্রাম করার সুযোগ পান পরমানন্দ? রাত্রিটুকু তাঁর বিশ্রাম বা নিদ্রার সময়।

আজ পরমানন্দের মন অস্থির। ভগবৎ চিন্তায় যিনি সব সময় আচ্ছন্ন থাকেন—আজ তার মধ্যে কেন এই অস্থিরতা? পরমানন্দ নিশুতি রাতে তাঁর কক্ষ সংলগ্ন দক্ষিণের বারান্দায় বসে আপন মনে গান করেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ সর্বজনবিদিত। তিনি আপন মনে গান করছেন: রামকিরী রাগ, যতি তাল।

"চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মনি কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড যুগস্মিতশালী।।
হরিরিহ মুগ্ধবধুনিকরে।
বিলাসিনি বিলসিত কেলিপরে।। ধ্রু।।
পীনপয়োধরভারভরেন হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদাঞ্চিতপঞ্চমরাগম।।
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচন খেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্।।

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারুচুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরণুকুলে ।।
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকুলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেন দুকূলে ।।
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ।।
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ।।
শ্রীজয়দেবভনিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনতু শুভানি যশস্যম্ ।।'

গান যখন শেষ হলো তখন পরমানন্দের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত। কিসের ভাবে তিনি বিভোর ; এমন সময় মধ্যরাত্রে তাঁর অন্ধকার কক্ষ থেকে শোনা গেল কে যেন বলে উঠল : অপূর্ব !

নারী কণ্ঠস্বর শুনে চমকিত হয়ে ওঠেন পরমানন্দ। প্রশ্ন করেন : কে ওখানে ?

—আমি দেবলীনা।

পরমানন্দ আলো জ্বালতে লক্ষ্য করেন দেবলীনা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পরমানন্দর দিকে।

তিনি এবার বিরক্ত হয়ে বলেন : এই নিশুতি রাত্রে তোমার এখানে এইভাবে আসা উচিত হয়নি দেবলীনা।

—প্রভু। দেবলীনার কণ্ঠস্বরে আর্তির ভাব।

পরমানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর শান্তস্বরে বললেন : তোমার কি কিছু বলার আছে ?

দেবলীনা বললেন : তপোধন, নানা প্রশ্ন আমার মনে হয়—যার ঠিক কোন উত্তর আমি খুঁজে পাই না। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন প্রভু। আমি বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। আজও আমার মন অত্যন্ত অস্থির। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারিনি। ছুটে এসেছি আপনার গান শুনে। মনে হয়েছে ঈশ্বরদত্ত না হলে এ কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া যায় না। গানের মধ্যে ভক্তির যে লক্ষণ আছে—তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন আমি বিদেশিনী। দেবভাষা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তপোধন, আপনি যদি আমাকে গানের অর্থটা একটু বুঝিয়ে দেন—

তা হলে আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

পরমানন্দ দেবলীনাকে বললেন: তুমি বসো। আমি তোমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এই গভীর রাত্রে তোমার এখানে আসাটা মোটেই সমীচীন হয়নি।

দেবলীনা বললেন: আপনার যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তবে আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

—না। তুমি যেয়ো না। পরমানন্দের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়।

তিনি আরো বললেন: তুমি স্থির হয়ে বসো।

'আলোটা নিভিয়ে দিলেন পরমানন্দ। মুহূর্তের মধ্যে সারা কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরমানন্দ ও দেবলীনা এখন মুখোমুখি হয়ে বসেছেন।

দেবলীনা বললেন: আমি কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ বুঝতে ইচ্ছা করি।

পরমানন্দ শুরু করলেন:

'আমি তুমি হয়ে যাই, তুমি আমি হয়ে যাও; আমি দেহ হয়ে যাই, তুমি প্রাণ হয়ে যাও, পরে যাতে কেউ না বলে আমি আর তুমি ভিন্ন।' এই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ। যার মধ্যে এই উপলব্ধি সে সার্থক। অনুভবেই সত্য ধরা পড়ে যায়। আমরা দেখেছি কৃষ্ণর জন্য রাধার ব্যাকুলতা। বৈষ্ণব কবিরা রাধার যাতনাময় স্বরূপটি আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। যাতে বিরহর জ্বালা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। কৃষ্ণ রাধার প্রেমের জন্য আগ্রহী, অথচ কেমন যেন উদাসীন। কৃষ্ণের একাকীত্ব বোঝা যায়—যেমন বোঝা যায় রাধার যাতনাময় এবং বিরহীবোধ।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং রাধা মানবী। কাজেই বিশ্বস্রষ্টা যদি নিষ্ঠুর হন—তবে তাঁর আসল উদ্দেশ্য আপন স্বরূপকে প্রকাশ করা। যিনি জ্যোতির্ময় তিনি তো চাহিবেন তাঁর সৃষ্টিকে বাজিয়ে দেখতে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি উদাসীন ভাব দেখালেন—কিন্তু রাধার দেহমনের আকুলতা ও আত্মসমর্পণ যে তৃপ্তি—তা প্রেম ছাড়া আর কি? কাজেই যখন দেখি বৈদান্তিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, আমি চিনি খেতে ভালবাসি, কিন্তু চিনি হতে চাই না। তখন এই ছোট্ট কথায় তাঁর ঈশ্বর-ভাবনা আমাদের কাছে কত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাম আর কৃষ্ণ মিলে যদি রামকৃষ্ণ হয়—তবে কৃষ্ণের মধ্যে নিজে বিলীন হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে প্রেম। তার স্বাদ আলাদা, বর্ণ ভিন্ন। একাত্মা হতে পারাটাই হচ্ছে পরম ও চরম তৃপ্তি। আর

আনন্দ হচ্ছে এমনি একটি বস্তু—বিশ্ববিধাতার সব কিছু সুন্দর থেকে তা আহরণ করে নিতে হয়। সকলে কিন্তু আনন্দকে আদায় করে নিতে জানে না।

পরমানন্দ মুহূর্তের জন্য একটু থামলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছিলাম—তা হচ্ছে তুমি আর আমি যদি এক হতে পারি তবেই উপলব্ধি করতে পারা যায় প্রেম জিনিষটা কি? কৃষ্ণ প্রেমেও যদি মাতোয়ারা হতে হয়—তবে অভিন্ন হতে হবে। তোমরা যে সব সময় বলে যাও: হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বা রাম রাম হরে হরে। এ তো মুখের কথা। যেদিন এই মুখের কথা অন্তরের কথা হবে—সেদিন মুখ বুজিয়েই উপলব্ধি করা যাবে পুরুষোত্তমের অস্তিত্ব।

দেবলীনা তন্ময় হয়ে শোনেন পরমানন্দের কথা।

পরমানন্দের জীবনে কোন নারীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক হয়নি। তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তিনি শুচিস্মিত। তাই তাঁর মধ্যে নারী সম্পর্কে কোন শুচিবায়ুগ্রস্ত ভাব দেখা যায় না।

দেবলীনা তাঁর অজ্ঞাতে পরমানন্দের খুব কাছে এসে বসেছেন। তিনি বললেন: কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে বেশ সময় লাগবে। তবে আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো।

দেবলীনা বললেন: তপোধন, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি যে গানটি করছিলেন তার অর্থটি যদি আমাকে বলেন তবে আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

পরমানন্দ বললেন: গানটির মূল কথা হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণের বসন্তলীলা।

পরমানন্দ চোখ বুজিয়ে যেন সব কিছু দেখছেন। এমনিভাবে তিনি শুরু করলেন: পীতবসন পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর শ্বেতচন্দনে শোভিত। তিনি ক্রীড়ামত্ত, তাই তাঁর মণিমাণিক্যখচিত কুণ্ডল দুলছে এবং তারই বর্ণময় ছটায় তিনি যখন মৃদু মৃদু হাসছেন—তাঁকে অপূর্ব দেখতে লাগছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধা বধুগণের সঙ্গে হরি বৃন্দাবনে কেলিবিলাসে রত হয়েছেন।

অনুরাগভরে কোন গোপবধূ পীনপয়োধরপীড়নে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গে উদাত্ত পঞ্চমরাগে গান করছেন।

আবার কোন মুগ্ধা বধূ মধুসূদনের সরোজবদন ধ্যান করছেন। তাঁর বিলাস-বিলোল দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী মদনমদে উল্লসিত হয়ে উঠছে।

কোন নিতম্বিনী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কিছু বলার ছলে তাঁর কপোল বদন স্পর্শ করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এতে পুলকিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে সেই সুন্দরী তাঁকে মধুর চুম্বন দান করছেন।

আবার কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্তী বেতসকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের বসনপ্রান্ত আকর্ষণ করছেন।

কোন যুবতী মুরলীর কলধ্বনির সঙ্গে তাল দিচ্ছেন, আর তাল দেওয়ার সময় তার বলয়গুলি শিঞ্জিত হওয়ায় নবরসের সৃষ্টি হচ্ছে; হরি রাসরসে নৃত্যপরা যুবতীর প্রশংসা করছেন।

হরি কাহাকে আলিঙ্গন করছেন, কাহাকেও চুম্বন করছেন, আবার কাহারও সঙ্গে রমণ করছেন। কোন রমণীর প্রতি কটাক্ষ করছেন, যাতে তার মানভঞ্জন হয়, আবার কোন গোপিনীর পিছু অনুধাবন করছেন।

পরমানন্দ এবার বললেন: শ্রীজয়দেব কবি বৃন্দাবনের বনে বিলসিত কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহস্য বর্ণনা করলেন। আর প্রার্থনা করলেন—'এই যশস্কর মধুরলীলা সকলের মঙ্গল বিধান করুক'।

মুহূর্তের মধ্যে পরমানন্দ অনুভব করেন; তিনি দেবলীনার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁর প্রতিরোধ করার কোন শক্তি নেই। পরমানন্দ পুরুষ, আর দেবলীনা প্রকৃতি। আত্মাহুতি দিলেন পরমানন্দ। এতদিনের যা কিছু সঞ্চয়—তা এই মুহূর্তে নিঃশেষিত হয়ে গেল। দেবলীনা পূর্ণগ্রাস করে ফেলেন পরমানন্দ ব্রহ্মচারীকে।

সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন বহে গেল। অনভিজ্ঞ পরমানন্দ কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না।

দেবলীনা আলিঙ্গন করলেন। লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, অনেকটা সেইরকম।

তারপর অধরের সঙ্গে অধরের সংযোগে অসংখ্যবার চুম্বন করলেন। অলি মধুপুষ্প চুম্বন করে উড়ে চলে যায়, কিন্তু এ যেন আকণ্ঠ চুম্বন। পারে না নিজেকে সংযত রাখতে পরমানন্দ। বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত করতে চান দেবলীনাকে। বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে সারা অঙ্গে। উত্তপ্ত শোণিত—তীব্র এক উন্মাদনার মধ্যে দুটি হৃদয় বুঝি মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এই মুক্তিই এনে দিতে পারে চরম ও পরম তৃপ্তি।

সমুদ্রে তরঙ্গোচ্ছ্বাস। উত্তাল ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে সমুদ্র তটে। সে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি—যেন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা ছিল

ন্ধু—তা যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার নাগিনী ফণা তুলে সমুদ্রকে ফেনিল করে তুলেছে। চলে মন্থন···মন্থন।

তারপর সব শান্ত। বর্ষণের পর ধরণী যেমন শান্ত শীতল হয়, অনেকটা সেই রকম। দেবলীনা তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে পরমানন্দের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন: আমি তুমি হয়ে যাই, তুমি আমি হয়ে যাও; আমি দেহ হয়ে যাই, তুমি প্রাণ হয়ে যাও, পরে যাতে কেউ না বলে আমি আর তুমি ভিন্ন।

পরমানন্দ ক্লান্ত, কিন্তু তিনি পুলকিত অনুভব করেন। এবার তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

ধীরে ধীরে দেবলীনাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকেন পরমানন্দ। দেবলীনার দেহের উষ্ণভাব প্রত্যক্ষ করেন। এতদিন তিনি যা জানতেন না—তা জানার জন্য দেবলীনার শরীরকে নিয়ে তিনি খেলায় মেতে ওঠেন। বড় ভাল লাগে দেবলীনার। পরমানন্দকে দেখার পর থেকেই দেবলীনার মনে মনে খুব লোভ ছিল। আজ তাঁর এই মূহূর্তে যেন গভীর তৃপ্তি। তৃষ্ণা নিবারণের পরে যেমন তৃপ্তি হয়—অনেকটা সেই রকম। কিন্তু পরমানন্দর ভাবনা অন্য।

তাঁর মনে পড়ে, রুক্মিনী স্বকীয়া, গোপী পরকীয়া। তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নেই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমি তোমার মধ্যে সর্বদাই আছি। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধার স্বরূপিনী, সকলের এবং আমার শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও এ বিষয় নির্ণয় করতে পারে না। হে অক্ষরে তুমি সর্বরূপা, আমি সর্বরূপ।

এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী রাধিকার অংশকলা—যিনিই স্ত্রী, তিনিই তিনি।

প্রেমলীলায় ভগবান রমণ—ভক্ত রমণী।

আবার ব্রজে শ্রীকৃষ্ণই একা পুরুষ, আর সবাই প্রকৃতি।

দেবলীনা যেন দেহবল্লরী। পরমানন্দ আর স্ববশে থাকতে পারেন না। দেবলীনার স্পর্শ, ঘ্রাণ, মৃদুগুঞ্জরণ তাঁকে যেন অমৃতলোকে নিয়ে যায়। দেবলীনাও বিহ্বলা। বড় বিস্ময় জাগে। যা ঘটে গেছে—তারও বুঝি শেষ নেই।

পরমানন্দর মনে হয়: কাম, কামনা ও কামিনী কি হৃদয়ের তন্ত্রীতে এই ভাবে ধ্বনিত হয়। একবার তাঁর ইচ্ছে হলো দেবলীনাকে খুব করে নাড়া দিয়ে বলেন: তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধুময়। পারলেন না পরমানন্দ নিজেকে প্রকাশ

করতে। হৃদয়ে একটা অনুচ্চারিত বেদনা তিনি অনুভব করতে লাগলেন।

নিজেকে দেবলীনার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো বা খুঁজছেন কোথায় এখন সাতাশটি তারকাপুঞ্জের মধ্যে ভরণী পুষ্যা, মৃগশিরা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধাদের অবস্থান! না তারা মেঘের অন্তরালে সকল সত্তা বিসর্জন দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে?

দেবলীনা কিসের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, আর পরমানন্দ এখন প্রসারিত নেত্রে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধাদের।

পরমানন্দর মনে পড়ে: রাধার আকুল উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সঙ্গমলিপ্সা। এ যে 'অনুদিন বাড়ল, অবধি না গেল।' না না শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকল নরনারী প্রকৃতি। এই তো ভজনের রীতি। উত্তমপুরুষ ভগবানকে কামার্পণ করা।

এখানে কামকে দমন করতে নেই, গভীরতায় গিয়ে শুদ্ধা হতে হয়। বিশেষতঃ ভগবানে কামার্পণের ফলে প্রকৃত কাম অপ্রাকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অতএব 'কাম প্রেমে বহুত অন্তর।'

যিনি 'অপ্রাকৃত কামী, যিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে সেই চিরসুন্দরে কামার্পণ করে তাঁকে মধুরভাবে ভজনা করেন, তাঁর প্রাকৃত কামানন্দ অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লসিত হয়।

কিন্তু এসব জানা কি সব ব্যর্থ হয়ে গেল পরমানন্দের? না তিনি আজ যা সম্যক উপলব্ধি করলেন—তা 'অনির্বচনীয়। এ অনিবারণীয়।

পরমানন্দ অপার আনন্দলাভ করেছেন, এতদিন তিনি ভ্রান্ত ধারণাবলে আত্ম-বঞ্চনা করে এসেছেন। কিন্তু তবু যেন কিসের জন্য দ্বিধা হয় তাঁর। এ কি সংস্কার না আত্মোপলব্ধি?

রাত্রি শেষ প্রহর। পরমানন্দ দেবলীনাকে দেখলেন নিদ্রাচ্ছন্ন। তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে চলে এলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তিনি ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর মুখে চোখে লাগিয়ে বড় তৃপ্তবোধ করলেন। নিজের অজ্ঞাতে তিনি কখন যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন—তা তিনি নিজেই জানেন না।

আজ রথযাত্রা। সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ এখানে এসেছেন। জনসমুদ্র, দেখলে মনে হবে এ যেন ভারততীর্থ। আবালবৃদ্ধ বনিতা সবাই এসেছেন পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে। রথযাত্রার শুভতিথি হল আষাঢ়মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া। স্কন্দ পুরাণের পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে মহর্ষি জৈমিনি প্রদত্ত বিবরণ অনুসরণ করে রথের আকার, গড়ন ও সাজসজ্জা ইত্যাদি নির্মিত হয়ে থাকে। কিন্তু কালক্রমে তার যে রূপান্তর ঘটেনি সে কথা কেউই তা জোর দিয়ে বলতে পারে না। তবে এ কথা সত্যি যে পুরীর জগন্নাথদেবের যে রথ নির্মাণ করা হয়—তা শাস্ত্রসম্মত এবং ভক্তি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যবাহী।

আজ সেই রথযাত্রা। কেউ কেউ বলেন, এ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। আবার লোকপরম্পরায় শোনা যায়: সারা বছর শ্রীজগন্নাথদেব চার দেয়ালে বন্ধ থাকেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে তিনি বাহিরে আসেন। এখানে তিনি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তো জগতের নাথ। পরিত্রাতা, তাঁর কাছে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। এই রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেব তাঁর মাসির বাড়ি যান এবং সেখানে সাতদিন অবস্থানের পর হয় পুনর্যাত্রা। যা উল্টোরথ যাত্রা বলে প্রচলিত। আসলে রথ দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে যায় গুণ্ডিচা বাড়ি বা গুণ্ডিচা মন্দির। শোনা যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও তাঁর পত্নী গুণ্ডিচা দেবী এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালে বর্তমান মন্দির নির্মিত হলে মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু এবং নবমী তিথিতে পুনর্যাত্রা হয় বলে এই অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে নবদিগন্তিকা বা বহড়া উৎসব।

পুরীতে তিনটি রথ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূর্তি তিনটি নয় চারটি, অর্থাৎ চতুর্ধা। জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র। সাধারণত মন্দিরে তিনটি দারু মূর্তি দেখা যায়, চতুর্থ হচ্ছেন সৃষ্টি রহস্যের প্রতীক। সে কারণে রথযাত্রার দিন মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাদের ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগের পর দারু মূর্তি-গুলিকে ফুল, অলঙ্কার ও নানা বর্ণের পোষাকে সজ্জিত করে একে একে মন্দিরের

বাহিরে আনেন পূজারীরাই। মন্দির থেকে দেবতারা যখন বাহিরে আসে তখন শঙ্খ, ঘণ্টা ও নানারকমের বাদ্যধ্বনি হয়ে থাকে। এই নিস্ক্রান্ত হও অনুষ্ঠানকে স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে পহণ্ডি। রথারোহণ পর্বে মন্দির থে প্রথমে নির্গত হন সুদর্শনচক্র এবং তিনি অধিষ্ঠিত হন সুভদ্রার রথে। তারপ নিয়ে আসা হয় বলভদ্রের মূর্তি এবং পরে সুভদ্রা। সর্বশেষে আসেন জগন্নাথদেব মূর্তিগুলি রথারূঢ় হবার পর পুরীর রাজা আসবেন রথের সম্মুখে এবং তি তিনটি রথের তিনটি সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বের ভূমি ঝাঁট দিয়ে পবিত্র জল ছিটি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে 'ছেরা পহরা' অনুষ্ঠান সমাপন করার পরই রথের রশি সকলে মিলে টানা শুরু হবে। তখন ভগবান ও মানুষের মধ্যে যেমন কো ব্যবধান থাকে না, তেমনি জাতি-বর্ণের কোন বৈষম্য থাকে না। রথযাত্রা উৎস আনন্দ উৎসবের রূপ নেয় এবং শ্রীক্ষেত্র হয়ে ওঠে মহাতীর্থ।

এই চিরাচরিত প্রথায় আজও রথযাত্রা শুরু হয়েছে।

প্রথমে চলছে বলভদ্রের রথ, নাম তালধ্বজ। বলভদ্রের হাতে দর্পণ থাকে- তিনি ত্রিলোক দর্শন করেন। তাঁর রথের তাল চিহ্ন থাকে বলেই রথের নামক করা হয়েছে তালধ্বজ। উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট এবং চাকার সংখ্যা চোদ্দ। চতুর্দ মন্বন্তরের প্রতীক। রথের নির্মাতা ময়দানব এবং সারথি হলেন দারুক। অশ্বগুলি নাম: ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। রথাধীপ হলেন বৃহৎনাস এবং রক্ষাক আদিশেষ। দ্বাররক্ষী হচ্ছেন অতিশীল ও সুশীল। জয়দুর্গা হচ্ছেন রথশক্তি এ ঋষি অঙ্গিরা।

অনুরূপ সুভদ্রার রথের নাম পদ্মধ্বজ। উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট এবং বার চাকা যুক্ত। এই বারটি চাকা হচ্ছে—বার মাসের প্রতীক। রথের সারথি হচ্ছে দেবদত্ত এবং অশ্বগুলির নাম হচ্ছে: প্রজ্ঞা, অনুজ্ঞা, ঘোরা ও অঘোরা। রথে অধিপতি হচ্ছেন জয়দুর্গা এবং রক্ষাকর্তা হরিহর। রথশক্তি হচ্ছেন সুদর্শন এ ঋষি হচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক্য। সুভদ্রা হচ্ছেন শ্রী ও কল্যাণের প্রতীক, তাই তাঁর রথ হচ্ছে পদ্ম।

নান্দীঘোষ হচ্ছে জগন্নাথ দেবের রথের নাম। উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট এবং চাকা সংখ্যা ষোল। এই ষোলটি চাকা ষোলটি মূল তত্ত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পঞ্চভূত, প জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মন। সারথি হচ্ছেন মাতলি এ অশ্বগুলির নাম যথাক্রমে—শঙ্খিকা, মোচিকা, ও জলিনী। রথাধীপ হলেন গরু এবং রক্ষাকর্তা দ্বাবিংশভুজ নৃসিংহ। রথশক্তি হচ্ছেন বিমলা, অধিষ্ঠিত ঋষি পাণ্ডু

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়—বলভদ্রের রথের সারথি হচ্ছেন দারুক, তাঁর পোষাকের রঙ সবুজ। সুভদ্রার রথের সারথির নাম দেবদত্ত, তাঁর কাল রঙের পোষাক এবং জগন্নাথদেবের রথের সারথি হচ্ছেন মাতলি, তাঁর পীতবর্ণের পোষাক।

শর্মিলা এই রথের দিনে অসিতকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে এসেছে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তাকে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অফিসের হলিডেহোম বুক করা, লীভ এনক্যাশমেণ্ট করে টাকা যোগাড় করা, অসিতের অফিস থেকে তার ছুটি নেবার ফন্দি ফিকির বাতলে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে শর্মিলার মার কাছেও পুরী আসার কথাটাও গোপন রাখতে হয়েছে। যাতে এই ক'টা দিনের জন্য অসিতকে নিয়ে সে খুব কাছাকাছি থাকতে পারে। শুধু এই গোপন বাসনাটা চরিতার্থ করার জন্যই শর্মিলা প্রায় এক মাস আগে থেকেই এই সব ব্যবস্থা করেছে। শর্মিলার বহুদিনের স্বপ্ন—অসিতের সঙ্গে কয়েকটা দিন সহবাস করবে।

প্রথমে অসিত রাজি হয়নি, কিন্তু পরে শর্মিলার কথায় সে রাজি হতে বাধ্য হয়। সমুদ্রের ধারে শর্মিলার সঙ্গে কয়েক দিন কাটানোর মধ্যে বেশ রোমান্স আছে। এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? এই কথা ভেবেই অসিতের শর্মিলার প্রস্তাব আরো বেশী ভাল লেগেছিল। অবশ্য অসিতও তার অফিসের কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। তবে শর্মিলা বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। কেননা অসিত যদি টাকা নাও আনতে পারে তাতে পুরী আসা আটকাবে না। সব কিছুরই ব্যবস্থা করেছে শর্মিলা। শুধু অসিতকে কয়েকটা দিন একান্তভাবে পাবার জন্য। কেননা এটা তার বহুদিনের বাসনা। একটা অতৃপ্ত বাসনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। শুধু এই কথা ভেবেই শর্মিলা কেমন বিভোর হয়ে থাকে। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই শর্মিলা অসিতকে শুধু দয়িত নয়, খুব কাছের মানুষ—আপনজন মনে করতে শুরু করে দেয়। এখন আর কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। শর্মিলা ও অসিতের আসল সম্পর্ক যাই হোক না কেন—সে কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ওরা নববিবাহিত দম্পতি। মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন করতে পুরীর সমুদ্র তীরে চলেছে। কলকাতা থেকে পুরী আসতে ট্রেনে ওরা দুজন শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছে। তবু শর্মিলা অসিতকে এরই মধ্যে একটু আধটু আলগা আদর করেছে। ট্রেনের কামরায় একটু বেশী ভিড় ছিল। তা না হলে অসিতও শর্মিলার মতন এই সময়ের অপচয় কিছুতেই হতে দিত না। প্রতিটি মুহূর্ত ওদের

কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়। কিন্তু লোকলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। তাই না ওরা ট্রেনে যতটুকু সংযত ও ভদ্র আচরণ করা উচিত, ঠিক ততটুকুই শুধু করে গেছে। তা যদি না হতো তবে শর্মিলা পারলে ট্রেনের মধ্যেই তার মনের যা কিছু সঞ্চিত বাসনা—সবই উজাড় করে দিতো। অন্তত যারা দেখতো—তারা বুঝতো ভালবাসা প্রকাশের কত রূপ, কত ভঙ্গি। অবশ্য এর কোন ব্যাকরণ নেই। যে যার ইচ্ছে মতো তা প্রকাশ করে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে—ভালবাসা উজাড় করে দেবার পদ্ধতিটাই যেন বন্য, অথচ ঠিক মতন অন্বেষণ করলে তার মধ্যে নাচের মুদ্রার স্বরূপটি দেখা যায়। ছন্দতো আছেই—যার নাম গতি। লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য শুধু অসম পদক্ষেপ।

ট্রেন এসে যখন থামল—তখন লোকে লোকারণ্য। শর্মিলা অসিতের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নামলো। স্যুটকেস দুটো পোর্টারের মাথায় তুলে দিয়ে ওরা ভিড় ঠেলে স্টেশনের বাইরে চলে এলো। এখানেই শর্মিলা মনে মনে ভেবে নিয়েছিল রথযাত্রার দিন পুরীতে আসাটা ঠিক হয়নি। এত মানুষ—সকলেই এসেছে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে। এও তো লোভ—পূণ্য অর্জন করার লোভ। শর্মিলাও এসেছে লোভের বশে। অবশ্য সেটা শূন্য তা নয়, পূর্ণতার লোভে। একটা অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থ করার লোভে। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেটা সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের জন্য করে থাকে। এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে একটি মেয়ে একটি ছেলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোন বন্ধন নয়, মুক্ত বিহঙ্গের মতন শুধু সাময়িক নীড় বাঁধার স্বপ্নে বিভোর শর্মিলা। জীবনকে পূর্ণভাবে জানার অদম্য ইচ্ছা। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল অসিত শর্মিলাকে ভালবাসে। অন্তত সে সেই কথা বোঝাতে চেষ্টা করে শর্মিলাকে এবং বিয়ে করে শান্তির নীড়ের স্বপ্নও দেখে। অসিতের ধারণা শর্মিলার সঙ্গে এখন তার যা চলছে তা পূর্বরাগ। পরিণয়ে তা হবে পূর্ণতা। মনে মনে সে অনেক দূর এগিয়ে যায়। চাকরিতে পদোন্নতি, নিজস্ব একটি অ্যাপার্টমেন্ট, তারপর শর্মিলাকে নিয়ে সংসার। কিন্তু শর্মিলা অন্য কথা ভাবে। বিয়ের পর মেয়েদের ডিভ্যালুয়েশন হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনে প্রেম ভালবাসা সব বাষ্পের মতন কেমন যেন উবে যায়। কাজেই সময় থাকতে জীবনকে ভাল করে উপভোগ করে নিতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে।

হলিডেহোমে আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা করা ছিল। স্টেশন থেকে সোজা ওরা এখানে এসে উপস্থিত হলো। দোতলায় একটি সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরে থাকার ব্যবস্থা। সামনের বারান্দায় বসে দেখা যায় সমুদ্র। কিন্তু এখানেও

ভিড়। এত মানুষ-জন যে এ সময় পুরীতে আসবে—তা শর্মিলা ভাবতেও পারেনি। অন্তত তার মনে হয়েছিল—হলিডেহোমে অন্তত সে একটু নির্জনতার স্বাদ পাবে। দেখে মনে হয় সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ এখানে এসে জড় হয়েছে। হিপি, বিটল্‌, সাধু, সন্ন্যাসী থেকে সব শ্রেণীর সাধারণ মানুষ আজ এখানে এসেছে—দেবরথ দেখতে। জগন্নাথ দেবের রথ—যা আজ গণরথ হয়ে উঠবে। রথের রশিতে একটু হাত ছোঁয়াতে পারলে অক্ষয় স্বর্গলাভ না হলেও নিশ্চিত পুণ্যলাভ। এ বিশ্বাস কিন্তু সকলের।

শর্মিলা যতটা উৎসাহ নিয়ে এখানে এসেছিল—এখন আসার পর তার মনটা একটু মুষড়ে যায়।

অসিত জিজ্ঞাসা করে: কি হলো?

—কিছু না। বলে শর্মিলা একটু জোর করে হাসে।

অসিত বুঝতে পারে শর্মিলার মধ্যে কিসের ভাবনা যেন পেয়ে বসেছে। এমন সময় হলিডে হোমের কেয়ারটেকার এখানে শর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করে নেয়—কি খাবার ব্যবস্থা করবে।

শর্মিলা বলল: ট্রেন থেকে সোজা এখানে এসেছি। আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। তারপর ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ দেবেন। তবে আমরা নন-ভেজ। কাজেই সী ফিস ছাড়া, চিকেন, মটন, ফিস্‌ সবই চলবে। বাট্ মাস্ট্ বী ফ্রেস।

কেয়ারটেকার একটু স্মিত হেসে বললেন: এখানে অফিসার ও ভি আই পিরা আসেন। কাজেই সব কিছুই ভাল পাবেন। অবশ্য ব্যাঙ্কের আর একটি হলিডে হোম বা রেস্ট হাউস আছে, সেখানে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর যদি কেউ রান্না-বান্নার ঝামেলা পছন্দ না করেন—তবে তাঁদের জন্য অর্ডার মাফিক্ সরবরাহ করা হয়।

শর্মিলা ব্যাঙ্কের অফিসার, কাজেই সে কেয়ারটেকারকে যা বলল—তা হুকুমের নামান্তর। তবে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায়।

কেয়ারটেকার চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বেয়ারা এসে একপট চা ও কিছু বিস্কুট দিয়ে গেল।

শর্মিলা অসিতকে বলল দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

অসিত দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শর্মিলা তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে চুমু খেল।

অসিত ঠিক অপ্রস্তুত হয়নি—তবে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল: আগে

একটু চা দাও, তুমি এমন ভাব করছো যেন তুমি এ সুযোগ আর পাবে না।

শর্মিলা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে সুরেলা কণ্ঠে বলল : 'জীবনের পরম লগন কোরনা হেলা।' গানটা মনে আছে ?

অসিত সামনের চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলল : তুমি একটু গাও না।

—দূর পাগল। এখন কোন গান নয়। স্নান সেরে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে, শুধু বিশ্রাম।

অসিত বলল : রথ দেখতে যাবে না ?

শর্মিলা এর উত্তরে বলল : তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে অসিত ?

—কেন ?

—এই ভিড়ে কোন ভদ্রলোক রাস্তায় বার হয় ?

অসিত শর্মিলার এই কথা শুনে বেশ বিস্মিত হয়ে বলে : পুরীতে রথের সময় এলে অথচ তুমি রথযাত্রা দেখবে না ?

শর্মিলা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে : তুমি দেখে এসো। আমি ততক্ষণ বিশ্রাম করবো। জানোই তো আমার ভিড় সহ্য হয় না।

—কিন্তু, দেখার মতন। এই উৎসবকে স্থানীয় লোকেরা বলে গুণ্ডিচা উৎসব। আবার কেউ কেউ বলে খোলযাত্রা।

শর্মিলা চায়ের পেয়ালার শেষ চা-টুকু যেন তারিয়ে তারিয়ে পান করলো। তারপর মুখ তুলে বললে : অসিত, তুমি সন্ধ্যেবেলায় একটু বেরিয়ে দেখে এসো। তারপর রাত্রে তুমি আর আমি ঐ বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে তোমার মুখ থেকে রথযাত্রার সব কথা শুনবো।

এরপর শর্মিলা অসিতের মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে একটু আদর করে বললে : এখন আমি স্নানটা সেরে আসি। তুমি ততক্ষণ সুটকেস থেকে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলো বার করো।

অসিত শর্মিলার কথামত সুটকেস থেকে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসগুলো বার করে ফেলে। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন যেন বিমোহিত হয়ে যায়। সমুদ্র নীল, আকাশ নীল। সব কিছুই নীলিমায় নীল। অসিত বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে গেয়ে ওঠে :

'কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে।।'

ওর কণ্ঠস্বর মধুর। তাই এই মুহূর্তে গানটি স্ফূর্তিতে সবল মনে হয়। স্বাভাবিকতায়

স্বচ্ছন্দ এবং গভীর, স্বাদু ও সংবেদনশীল।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শর্মিলা বললে : মেয়েদের বধ করার যাদুমন্ত্রটি বেশ জানা আছে। দোহাই অসিত গান থামিও না। বড় ভাল লাগছিল। আমার সব ক্লান্তি এই মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

অসিত হো হো করে জোরে হেসে উঠলো। তারপর সে বললে : গান আমার আসে না। সমুদ্রের ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছে সবটাই যেন সোনালী ঢেউ। দেখতে দেখতে মনে হলো জলের ওপর সোনার তবক দিয়ে সবকিছুকে মায়াময় করে তুলেছে।

শর্মিলা বললে : তুমি পাহাড় পছন্দ করো না ?

অম্লান বদনে অসিত বললে : করি, তবে ছোট ছোট পাহাড়। যা হাতের মুঠিতে ধরা যায়।

শর্মিলা বলে উঠলো : যা—অসভ্য।

অসিত এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে : স্নানটা সেরে নিই। দাড়ি কামাতে হবে। তোমাদের বেশ এ সবের ঝামেলা নেই।

—না কামিয়ে রেখে দিলেই পারো।

—এখন বলছো, তারপর যখন গোঁফ, দাড়ি রাখতে শুরু করবো—তখন তোমার কাছ থেকেই আপত্তি উঠবে বেশী।

শর্মিলা যেন কিশোরী, এমনি ভঙ্গি করেই সে বললে : আমার বয়ে গেছে আপত্তি করতে। তা ছাড়া তুমি রাখ আর না রাখ তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।

অসিত বললে : তুমিই তো আমাকে একদিন বলেছিলে, আমি ক্লীন শেভ পছন্দ করি।

এই কথায় শর্মিলার চোখ দুটো কেমন যেন চকচক করে উঠলো।

সে বললে : সত্যি আমি পছন্দ করি। তা ছাড়া ছেলেরা দাড়ি কামানোর পর ঐ যে একটা নীলাভ ভাব থাকে না—সেটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। অবশ্য রঙটা যদি ফর্সা হয়। যাদের রঙ কালো তাদের কিন্তু তেমন ভাল দেখায় না।

অসিত বললে : আমার রঙতো কালো।

—বিনয় করো না। তুমি বেশ ফর্সা। তোমার নামের সঙ্গে চেহারার মিল নেই।

অসিত শর্মিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যেন নিজেকে শর্মিলার চোখে

দেখতে চেষ্টা করে। এমনভাবে সে শর্মিলাকে কোনদিন পায়নি। এই কথাটা ভেবে সে বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

শর্মিলা অসিতকে স্নানের ঘরের দিকে একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিল। সময়ের যে দাম আছে—তা অসিত বোধ হয় বোঝে না। প্রতিটি মুহূর্ত শর্মিলার কাছে মূল্যবান।

অসিত চলে যাবার পর শর্মিলা বিছানার ওপর গড়াগড়ি খায়। ভারি ভাল লাগে তার। আজ সে যা খুশি তাই করবে। কোন বন্ধন নেই। সব চেয়ে বড় কথা, এখানে চেনা জানা কেউ নেই। সবাই অপরিচিত।

হঠাৎ বাইরের আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সমুদ্রের রূপ গেল বদলে। অশান্ত সমুদ্র। ঝড়ো বাতাস সব কিছুকে অস্থির করে তুলেছে। সেই সঙ্গে শুরু হলো বৃষ্টি।

এমনি বর্ষণমুখর দিন শর্মিলার কাম্য ছিল। স্নান আহার শেষ করে শর্মিলা ও অসিত এখন বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। পথের ক্লান্তি আর সেই সঙ্গে বাইরে সজল মেঘের কোমল কালোয় সব একাকার।

কি মনে হলো শর্মিলা অসিতকে কাছে টেনে নিয়ে গাইতে লাগল :

'এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ।।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর ।।'

তারপর শর্মিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আবার কি যেন ভাবে। এবার বেশ গলা ছেড়ে সে গাইতে লাগল :

'ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
সে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে

সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।।'

অসিত গান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা শর্মিলার জানা নেই। গান শেষ হবার পরও সে কিছুটা ঘোরের মধ্যে থাকে। তারপর যখন খেয়াল হলো তখন সে লক্ষ্য করে-অসিত নিদ্রাচ্ছন্ন। ওকে জাগাতে মায়া হয় শর্মিলার। ঘুমন্ত অসিতকে সে বেশ কিছু সময় নিরীক্ষণ করে। বেশ ভাল লাগে শর্মিলার। বিমোহিত হয়ে যায় সে। অসিতকে আদর করার খুব লোভ হয়, কিন্তু ভয় হয় পাছে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই প্রথম ভাল করে অসিতকে দেখল শর্মিলা। অসিতের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও চেহারার মধ্যে পুরুষোচিত ভাব ধর্ম স্পষ্ট। মেয়েরা এমনি চেহারার পুরুষদের বেশী পছন্দ করে। শর্মিলা অসিতকে এত কাছ থেকে কখন দেখেনি। দেখার সঙ্গে ভাবনা আসে। শর্মিলাও নিদ্রা-কর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়।

বেয়ারা এসে দরজায় মৃদু শব্দ করতে ওদের দুজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে হয় হয়। চা নিয়ে এসেছে বেয়ারা। শর্মিলা বিছানা ছেড়ে স্নানের ঘরে চলে গেল। অসিত দরজা খুলে বেয়ারাকে টেবিলের উপর চায়ের ট্রে-টা রেখে দিতে বলল।

চা রেখে দিয়ে বেয়ারা যখন চলে গেল তখন শর্মিলা মুখে চোখে জল দিয়ে এসে অসিতের চোখাচোখি হতে হেসে ফেলল। এ হাসির একটা গভীর তাৎপর্য আছে, কিন্তু অসিতের তা বোধগম্য হলো না। মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েরাই এসব ভাল করে বোঝে।

চায়ের সঙ্গে কিছু স্ন্যাক দিয়ে গেছে। ওদের বেশ ভালই লাগল।

চায়ে চুমুক দিতে শর্মিলা বলল : বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশে আর মেঘ নেই।

অসিত বলল : খুব ভাল হয়েছে, চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

—তুমি যাও। আমার ভিড় একদম সহ্য হয় না।

অসিত বলল : আজ মহোৎসবের দিন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। জগন্নাথ হচ্ছেন পৃথিবীর প্রভু, পরমেশ্বর। যিনিই জগন্নাথ তিনিই বিষ্ণু, আবার তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। দেবরথ হয়ে যাবে গণরথ। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ আজ রথের রশি ধরে টানবে। কোন জাতবিচার নেই। দেখবে কত হিপি বা রকার, বাংক বা জোনার, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, ভক্ত, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী সবাই এই উৎসবের সামিল হয়েছে। এমন সুযোগ হয়তো আমাদের জীবনে কখনো আসবে না।

শর্মিলা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল : তুমি আমার হয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে এসো। আমি এখানে বসে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মা হয়ে যাই।

অসিতের কথাটা ভাল লাগে না। চুপ করে বসে থাকে।

শর্মিলা বোঝে তার কথাটি অসিতের মনঃপুত হয়নি। তাই সে বলল : এই শুনছ, বিশ্বাস করো আমি খুব সহজভাবেই বলছি, তুমি একটু ঘুরে এসো। তবে দেরী কোর না। তাহলে কিন্তু আমি অস্থির হয়ে পড়বো।

এ কথায় অসিতের মুখে হাসি ফুটল। সে বললে : না, দেরী করবো না। আমি শুধু দেখে আসবো কেমন রথ সাজিয়েছে, কত মানুষ এই উৎসবে এসে যোগ দিয়েছে। তাছাড়া—দোকান পসারও তো দেখার আছে।

—ঠিক আছে, যা দেখার তা তুমি দেখে এসো। তবে কিছুতেই যেন দেরী কোর না। অসিত তবুও আর একবার শর্মিলাকে বলল : তুমি বলছো ঘুরে আসতে ? তোমার রাগ হবে না তো ?

—না না। তুমি ঘুরে এসো।

এ কথাটা শর্মিলা খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বলল।

অসিত মুহূর্তে উঠে পড়ে স্নানঘর থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে পোষাক বদলে শর্মিলার সামনে উপস্থিত হলো।

অসিতকে দেখে শর্মিলা মনে মনে ভাবে : ও এখন কত সরল, ওর মধ্যে এখনও বেশ ছেলেমানুষী ভাব আছে।

শর্মিলা হাসি মুখেই বিদায় দিল অসিতকে।

অসিত চলে যাবার পর শর্মিলা স্নান করে একটা তুঁতে রঙের তাঁত সিল্ক শাড়ি পরলো। সেই সঙ্গে সুন্দর করে সাজল। বহুকাল সে এমনভাবে যত্ন নিয়ে সাজেনি। প্রসাধন সামগ্রী যা এনেছিল—তা একের পর এক ব্যবহার করে সে নিজেকে নবসাজে সাজাল। আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখেই তার নিজের ভাল লেগে গেল। এ যেন অভিসারিকার সাজ। আজ সে অসিতকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করবে। বহুদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা আজ তার পূর্ণ হবে। এই সব ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। কন্যাকুমারীর মতন অধীর প্রতীক্ষায় না থেকে সে অসিতের জন্য নিজেকে খুব করে সাজাল।

যখন সাজার পালা শেষ তখন তো শর্মিলার আর কিছু করার নেই। একবার মনে হলো নিচে গিয়ে বেয়ারাকে কিছু খাবার পাঠাবার কথা বলে আসবে। কিন্তু

পরমুহূর্তে তার মনে হলো অসিতকে বাদ দিয়ে কিছু খাওয়া শোভন নয়। অসিত এলে তখন না হয় যা হোক কিছু খাবারের কথা বলে দিলেই হবে। কিন্তু অসিত বড় দেরী করছে। তাকে যেতে না দিলেই যেন ভাল হতো। বড় অস্থির অস্থির মনে হয় শর্মিলার।

এদিকে বেশ একটু খিদে পেয়েছে তার। শর্মিলা অগত্যা নিচে নেমে গেল। সামনে বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে বলল: কফি আর তার সঙ্গে কিছু পাঠিয়ে দাও।

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল: কি খাবেন? এখন চীজ পাকওড়া বা ফ্রায়েড প্রণ দিতে পারি।

শর্মিলা কফি ও ফ্রায়েড প্রণের অর্ডার দিয়ে ওপরে চলে এলো।

কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা দু'কাপ কফি ও দু'প্লেট ফ্রায়েড প্রণ দিয়ে গেল।

শর্মিলা ইচ্ছে করেই বেয়ারাকে একজনের জন্য কি দুজনের জন্য কফি—তা স্পষ্ট করে বলেনি। কেননা অসিত তো যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। কাজেই যদি বেয়ারা একজনের জন্য পাঠাত তা হলেও সে কিছু বলতো না, আর দুজনের জন্য পাঠানো তো স্বাভাবিক। অসিত যে নেই তা বেয়ারা কি করে জানবে?

শর্মিলা কোন চিন্তা না করেই নিজের মতন করে এক পেয়ালা কফি আর এক প্লেট ফ্রায়েড প্রণ নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল।

সামনে সমুদ্র। আসে পাশে ঝাউ, দেবদারু ও যুক্যালিপটাস গাছ বাতাসে দুলছে। বারান্দায় বসলে সমুদ্রের হাওয়া এসে তার মুখ চোখ ভরিয়ে দিচ্ছে। বড় ভাল লাগছে শর্মিলার। বেশ স্বাধীন স্বাধীন মনে হচ্ছে। মনে একটা আত্মবিশ্বাস, আর সেই সঙ্গে ইচ্ছাপূরণের প্রবল বাসনা। ঠিক এই মুহূর্তে অসিতের কথা মনে পড়তে ওর মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। অস্থির অস্থির লাগে শর্মিলার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। এত দেরী করা অসিতের উচিত হচ্ছে না। নিজের ওপরও তার রাগ হচ্ছে। অসিতকে একা যেতে দেওয়াই তার উচিত হয়নি। সঙ্গে থাকলে অন্তত এই মানসিক যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হতো না। শর্মিলা ঠিক অসিতকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতো।

একদিকে সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গভঙ্গ, অপরদিকে উৎসব মুখরিত শহর কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খ ও তালবাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে অসংখ্য মানুষের জয়ধ্বনি। সম্মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি।

শর্মিলা সত্যি এখন বিপন্নবোধ করছে। এদিকে রাত্রি বেশ হয়েছে। এত

সময় নিশ্চয় অসিতের বাইরে থাকা উচিত হচ্ছে না। তা ছাড়া সে যখন জানে শর্মিলা একা আছে। কিন্তু এখন উপায় কি? ক্রমেই শর্মিলা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর এই ঘর, এই সমুদ্র তার ভাল লাগছে না। কিন্তু কোথায় সে অসিতের খোঁজ করবে? আর ভাবতে পারছে না। শর্মিলা এক রকম ছুটেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে। হলিডে হোমের গেটের সামনে গিয়ে সে অপেক্ষা করে। এখন এই অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ শর্মিলা লক্ষ্য করে একটা ছোট খাট ভিড় তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা সাইকেল রিকসায় বসে অসিত যেন কাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। শর্মিলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না।

গেটের সামনে এসে অসিত বলল: আপনারা এঁকে একটু ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে আসুন।

সকলে মিলে একজন মাঝবয়সী মহিলাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওপরে। যে ঘরটিতে অসিত ও শর্মিলা এসে উঠেছে সেই ঘরটিতে নিয়ে এলো। অসিত জনতাকে লক্ষ্য করেই বলল: আপনারা এই বিছানায় ওঁকে শুইয়ে দিন।

জনতা অসিতের কথামত মহিলাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যেমন হৈ হৈ করে এসেছিল ঠিক তেমনি হৈ হৈ করে চলে গেল।

শর্মিলা এবার অসিতকে বলল: ব্যাপারটা কি বল তো?

অসিত বলল: তোমাকে সব বলছি।

শর্মিলাকে কিছু বলার আগেই কেয়ারটেকার ও অন্যান্য কর্মচারীরা সব ছুটে এসেছে—আসল ব্যাপারটা কি তা জানতে।

অসিতকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তবু সে বলল: ইনি আমার মাসিমা। এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। তাই এখানে নিয়ে এসেছি।

অসিত এবার কেয়ারটেকারের দিকে তাকিয়ে বলল: আপনার এখানে কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে?

কেয়ারটেকার বললেন: নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

কেয়ারটেকার চলে যাবার পর শর্মিলা জিজ্ঞাসা করল: তোমার এই মাসিমাটিকে কি করে খুঁজে পেলে?

অসিত বলল: শর্মিলা, ইনি নিরুপমা সেন। আমরা এঁকে নিরুমাসিমা বলেই ডেকে থাকি।

—তোমার কি নিজের মাসিমা অসিত?

—না, নিজের ঠিক নয়, তবে আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। আমরা ওঁকে নিজের মাসি বলেই মনে করি। বলে অসিত চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। সে বড় ক্লান্ত। শর্মিলা এবার খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। রাগে তার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সে বলল: তোমার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই। কোথাকার কে নিরুমাসি তাকে এখানে নিয়ে এলো? ওঁর নিশ্চয় আত্মীয় স্বজন কেউ না কেউ সঙ্গে এসেছে। তাঁরা এখন কোথায়?

এ কথায় অসিত কি উত্তর দেবে তা সে জানে না। অসিত শুধু অনুনয় করে বলল: শর্মিলা, মুমূর্ষু এক অসহায় মহিলাকে মানবতার জন্য অন্তত আশ্রয় দেওয়া উচিত। জানি না আমরা এঁকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবো। প্লীজ শর্মিলা, একটু ধৈর্য ধরো। ডাক্তার এসে কি বলেন তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

শর্মিলা বলল: তোমার নিরুমাসি কি তোমাকে ডেকে বললেন, অসিত বাবা, তুমি আমাকে বাঁচাও।

অসিত এখনও বেশ উত্তেজিত। সে বলল: কোন কথাই তিনি বলেননি। পথের ধারে এক পাশে পড়েছিলেন। ওঁকে ঘিরে তখন ছোটখাট একটা ভিড়। আমি উঁকি মেরে দেখতেই চিনতে পারলাম নিরুমাসি বলে। আমি কাছে গিয়ে নিরুমাসি বলে যেই ডেকেছি, অমনি নিরুমাসি একবার চোখ খুলে তাকালেন। তারপর আমার হাতটা সজোরে চেপে ধরলেন।

শর্মিলা এবার বলে উঠল: তোমার মতন আহাম্মুখ আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মধ্যযৌবনা এই মহিলা অত্যন্ত চতুর। দেখো কিছুই হয়নি। ভেট্‌কি মেরে পড়ে আছে। তোমার কি দরকার ছিল ওখানে যাবার? তুমি তো বলে গেলে একটু সময়ের জন্য যাচ্ছ—রথ দেখতে। যখনই দেরী হচ্ছে—তখনই আমি বুঝেছি তুমি একটা কোন উটকো ঝঞ্ঝাট নিয়ে আসছো। তোমার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই অসিত? এখন যদি তোমার এই নিরুমাসির কিছু একটা হয়—তার জন্য যে হয়রানি, হুজ্জুতি হবে—তা কে পোয়াবে? দূর···দূর···তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাকেও খেসারত দিতে হবে।

এই কথা বলে শর্মিলা ঘর ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। যতদূর দেখা যায়—শুধু জল আর জল। সমুদ্র অশান্ত। শর্মিলার মনটাও বিক্ষিপ্ত। তার চোখ ফেটে জল আসছে। ঠিক এই মুহূর্তে তার যে কি করা উচিত তা সে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

কেয়ারটেকার একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি যে

বাঙালী তা তাঁর প্রথম কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ডাক্তার অসিতকে সামনে দেখে প্রশ্ন করলেন : কি হয়েছিল ?

আমি কিছুই জানি না। বলে অসিত যা যা ঘটেছিল বা সে যা দেখেছে তা পুনরাবৃত্তি করল।

ডাক্তার নিরুপমাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। প্রেসার চেক করলেন ই. সি. জি. করলেন, তারপর সব দেখে শুনে শেষ কথাটি যা বললেন তা খুব মারাত্মক কথা। তিনি বললেন : হার্ট ভালই আছে, তবে কোন কারণে শক পেয়েছেন। কাজেই এখন আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। এই ইনজেকশন দেবার পর উনি ভালভাবেই ঘুমোবেন। দেখবেন কোন রকম যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তা ছাড়া আপনারা রাত্রিটা একটু লক্ষ্য রাখবেন। যদি দেখেন কোন রকম নতুন সিমটম দেখা দিয়েছে, তবে আমাকে খবর দেবেন। তা না হলে কাল সকালে এসে আমি আবার দেখে যাবো। তবে এসব কেসে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যায় না।

অসিত এই কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। ডাক্তারের মুখের দিকে শুধু সে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার যখন তাঁর ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন কেয়ার-টেকার অসিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন : ওঁর ফি-টা দিয়ে দিন।

অসিত জিজ্ঞাসা করল : কত দিতে হবে ?

কেয়ারটেকার বললেন : একশো টাকা দিয়ে দিন।

কেয়ারটেকার এমনভাবে বললেন যেন একশো টাকাটা তেমন কিছু নয়।

অসিত নিজের কাছ থেকেই টাকাটা দিল।

ডাক্তার চলে যাবার পর অসিত শর্মিলার কাছে গিয়ে বলল : আমার ওপর রাগ করো না। নিরুমাসি একটু সুস্থ হলেই আমি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

শর্মিলা প্রথমে কোন উত্তর দেয়নি। অসিত যখন খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন সে বলল : তোমার যা খুশি তাই করগে। আমি তোমার কোন ব্যাপারেই নেই।

অসিত শর্মিলাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল : তুমি শুধু আজকের রাত্রিটা দেখ, কাল আমি নিরুমাসির জন্য অন্য ব্যবস্থা করবো। প্লীজ শর্মিলা, আমার এই অনুরোধটা শুধু রাখ।

শর্মিলা উত্তেজিত হয়ে বলল : নো কম্প্রোমাইজ। প্লীজ লিভ মী এলোন। অসিতের হাত ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করল শর্মিলা। তারপর ঘরে আসতে

গিয়ে নিরুপমাকে দেখে যেন আরো জলে উঠল শর্মিলা। কোথায় যাবে শর্মিলা? এখন তার সব কিছুই অসহ্য মনে হচ্ছে।

পিছু পিছু অসিতও ঘরে আসছিল। শর্মিলা নিরুপমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল: তুমি ঐখানে গিয়ে বসো। আমি ক্লান্ত। আই নীড রেষ্ট।

অসিত কোন কথা না বলে নিরুপমার বিছানার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

শর্মিলা একা বিছানায় শুয়ে পড়ে খানিকটা কেঁদে হালকা হবার চেষ্টা করল, কিন্তু না তার কিছুতেই শান্তি নেই। রাগে সে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। অসিত শর্মিলাকে শান্ত করার জন্য তার বিছানায় এসে বসল। তারপর খুব অনুনয়ের সুরে বলল: শুধু একটা রাত্রি তুমি সহ্য করো। আমার সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমি অনুতপ্ত শর্মিলা।

শর্মিলা অসিতের মুখে এসব কথা আর সহ্য করতে পারে না। সে একরকম গর্জে উঠে বলল: যাও যাও তুমি তোমার নিরুমাসির কাছে গিয়ে বসো। তোমার ন্যাকামি আমার একদম ভাল লাগছে না। কোথাকার কে মাসি—তার ঠিক নেই, উনি তাঁকে সোহাগ করে নিয়ে এলেন এখানে।

শর্মিলা একরকম চিৎকার করেই বলে বসল: সী ইজ নাথিং বাট এ্যা হোর। ডোণ্ট য়ু এগরি উইথ মী অসিট? আমি অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু দেখেছি। তুমি আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করো না। নেশা করে বুঁদ হয়ে আছে। তুমি ছেলেমানুষ, তাই তোমার ঘাড় মটকাবার জন্য এই ফন্দি এঁটেছে। তোমাকে যদি না পেত, তবে দেখতে তোমার মতন অন্য কারুর ঘাড়ে চেপে বসতো। তা যদি না হবে—তবে তুমি যেই বলেছ, নিরুমাসি, অমনি খপ করে তোমার হাত চেপে ধরলো? তারপর এতটা সময় গেল একবারো চোখ খুলে তোমার দিকে তাকাল না? সব ভিট্‌কেলমি। এ সব মেয়েমানুষদের আমার খুব জানা আছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে কি বলল? কিছু হয়নি। প্রেসার নর্মাল, ই সি জি রিপোর্টও ভাল। তাহলে?

অসিত বলল: তোমার বিশ্বাস হবে না আমি জানি, তবে নিরুমাসি খুব দুঃখী। ওঁর স্বামী বিয়ের পরই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর কত খোঁজাখুঁজি হয়েছে—কোন খবর পাওয়া যায়নি।

শর্মিলা বলল: তা হলে আমার কথাই ঠিক। মেয়েমানুষের পুরুষ ছাড়া চলে নাকি? তাই তোমার মতন ছেলেদের মাথা খাওয়াই হচ্ছে কাজ। আরে চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। উপোসী ছারপোকার চেহারাই অন্যরকম হয়। এতো

দুধ ক্ষীর খাওয়া চেহারা। এখনও কত মজবুত শরীর, এতটুকু টোল পড়েনি।
এরপর অসিত আর একটিও কথার উত্তর দেয়নি। চেয়ারের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিতে তার চোখে ঘুম এসে জমা হতে থাকে।

শর্মিলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার যা মনে এসেছে—তাই বলে গেছে। তার শরীর জ্বলছে। শুধু স্বপ্নভঙ্গ নয়, সেই সঙ্গে তার এতদিনের যা কিছু সঞ্চিত ছিল—সব এই মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আশাভঙ্গও বলা যায়। এ ব্যথা সহজে ভোলার নয়। অসিত যে এমন একটা আহাম্মুকী কাজ করবে—তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

শর্মিলা ভাবে : যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। অসিতের উপর কিছুতেই বাকি জীবন নির্ভর করা যেত না। দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন মানুষকে অবলম্বন করে বাকি জীবন চলা সুখের হতো না।

অসিত ও নিরুপমা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। শর্মিলার চোখে ঘুম নেই। শর্মিলা তাই স্থির করল খুব ভোরবেলা সে এখান থেকে চলে যাবে। অসিত যদি থাকতে চায় থাকতে পারে, কেননা শর্মিলা এখানে সাতদিন থাকার মতন টাকা অগ্রিম জমা রেখেছে। কাজেই অসিতের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। তবু শর্মিলা কেয়ারটেকারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে খুব ভোরবেলা তার জিনিষপত্তর, সুটকেশ নিয়ে এখান থেকে চলে গেল।

মুখের ওপর রোদ এসে পড়তে অসিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে সে যা দেখল তা তার বোধগম্য হল না। ঘরে শর্মিলা ও নিরুপমা কেউই নেই। দুটি বিছানাই খালি।

অসিত উঠে একবার স্নানের ঘরটা উঁকি মেরে দেখে নিল, তারপর নিচে গিয়ে কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারল কেয়ারটেকারও বাইরে গেছেন। যে বেয়ারাটি গতকাল ওদের ঘরে চা খাবার সার্ভ করেছিল তাকে সে জিজ্ঞাসা করল : মিস রয় অর্থাৎ শর্মিলা কোথায় গেছে জানো?

বেয়ারাটি বলল : জানি না, তবে তিনি তাঁর সুটকেশ নিয়ে খুব ভোরে চলে গেছেন। আর কাল যিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় এসেছিলেন?

বেয়ারাটি বলল : তিনি একটি সাইকেল রিক্সা চড়ে এই কিছুক্ষণ আগে মন্দিরের দিকে গেছেন দেখেছি।

অসিত সবিস্ময়ে বেয়ারাটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ রোদ ডুবে গিয়ে জোরে বৃষ্টি নামল।

। ৫ ।

পরমানন্দ আশ্রমের সব কিছুই করেন, কিন্তু পূর্বে যেমন সকল কাজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যেত, এখন সে রকম কোন কিছু দেখা যায় না। তাঁর মন চঞ্চল, একটা কিসের চিন্তায় তিনি যেন সব সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝার কোন উপায় নেই। আশ্রমিকরাও পূর্বের মত যার যা করণীয় তাই করে থাকেন। কাজেই পরমানন্দের চিত্ত-চাঞ্চল্য বা মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব—যাই হোক না কেন—তা কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অথচ পরমানন্দ বেশ উপলব্ধি করেন এখন বসন্ত ঋতু নয়, আশ্রমে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে থাকলেও—তার সৌরভ বা কলকাকলিতে মন পুলকিত হয়ে ওঠে না। মনতো তাঁর ব্রহ্মবিন্দুতে নিবদ্ধ ছিল, অথচ দেবলীনা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সব কিছু আত্মসাৎ করে নিলেন। কি করে এমনটি ঘটে গেল, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না পরমানন্দ। এতকাল তিনি যে ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছেন, যে ধর্মবিশ্বাস তাঁকে এই পথে এনেছিল, সেই বিশ্বাস, সেই নিষ্ঠা, সেই যে সাবধান বাণী তিনি শুনে এসেছিলেন—নারী মাতা, তাই প্রয়োজনীয়। প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বাতপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক। অথচ পুরুষের চোখে নারী মোহিনী। দেবতাদেরও কাম্য। নারী সঙ্গ পাপ, নারীকে দূরে রেখে ইন্দ্রিয় রোধ করতে পারলে হতে পারা যায় জীবন্মুক্ত মহাত্মা। হতে পারা যায় ব্রহ্মবেত্তা, হতে পারা যায় শুদ্ধসত্ত্ব, তপস্বীরা শুধু পারে শরীর মায়াজাল ছিন্ন করতে। এমনি অনেক কথাই মনে পড়ে পরমানন্দের। কিন্তু এই মুহূর্তে পরমানন্দ যা উপলব্ধি করেন: তা হচ্ছে আনন্দ। দেবলীনার স্পর্শে, ঘ্রাণে, অনুরাগে যে শিহরণ, অনুভূতি—তা অনির্বচনীয়।

পরমানন্দ দেবলীনার অদর্শনে কাতর, সন্তপ্ত।

তাঁর মনে হয়: অতৃপ্ত মন নিয়ে কোন কিছুর সাধনা হয় না। ভোগের পর ত্যাগ, তারপর আসে বৈরাগ্য। কেন জানি না আজ পরমানন্দের মনে হয় আত্মদমন আত্মদ্রোহের নামান্তর। প্রকারান্তরে আত্মপীড়ন বলা যায়।

হঠাৎ পরমানন্দ লক্ষ্য করেন স্বামী মাধবানন্দ তাঁর সামনে এসে উপস্থিত।

পরমানন্দ বললেন : হরে কৃষ্ণ।

প্রত্যুত্তরে 'হরে কৃষ্ণ' বললেন স্বামী মাধবানন্দ।

তারপর স্বামীজী শুরু করলেন : পরমানন্দ তুমি কি কোন কারণে বিচলিত বোধ করছো?

পরমানন্দ স্বামীজীর কাছ থেকে এ ধরনের কোন কথা আশা করেননি। তবে কি তাঁর আচরণ বা মুখমণ্ডলে এমন কোন কিছু প্রকাশ পেয়েছে, যা স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? পরমানন্দ নিজেকে বেশ সংযত করে শান্ত কণ্ঠে বললেন : স্বামীজী, যদি অপরাধ না নেন তবে আজ আপনাকে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি। মাধবানন্দ এতক্ষণ পরমানন্দের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, এবার তিনি পরমানন্দের কাঁধে তাঁর হাতটি রেখে পথ চলতে চলতে বললেন : পরমানন্দ, তুমি অকপটে তোমার মনের কথা আমাকে বলতে পারো। এর জন্য সঙ্কোচ বা দ্বিধা করার কিছু নেই। তবে একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই, তা হচ্ছে— এই আশ্রমের ভালমন্দ সব কিছুর দায়দায়িত্ব তোমার। আমার বিশ্বাস তুমি এমন কিছু করবে না বা বলবে না—যা আশ্রমের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বামী মাধবানন্দের এই কথায় পরমানন্দ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন।

স্বামীজী পরমানন্দকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বললেন : তোমার মনের কথা আমাকে যদি না বলো—তবে আমি তা জানবো কি করে? তা ছাড়া কয়েকদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি তুমি চিন্তিত, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি বিষাদগ্রস্ত। এটা অবশ্য মোটেই অভিপ্রেত নয়।

পরমানন্দ বললেন : আপনার অনুমান সত্য। আমি কিছুদিনের জন্য আশ্রমের বাহিরে থাকতে চাই।

মাধবানন্দ পরমানন্দকে শুধু লক্ষ্য করেন আর মনে মনে ভাবেন : পরমানন্দের কি তা হলে পতন হয়েছে? পরমানন্দ কি তা হলে ব্রহ্মচর্য পালনে অপারগ? তা যদি না হবে তবে পরমানন্দ আশ্রমের প্রতিপালক হয়ে অব্যাহতি চাইছেন কেন? স্বামী মাধবানন্দ খুব সংক্ষেপেই প্রশ্ন করলেন : আশ্রমে কি কোন অনাচার তোমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে?

—না না। আমি পরিব্রাজক হয়ে কিছুদিন আশ্রমের বাহিরে থাকতে ইচ্ছা করি। তীর্থভ্রমণ নয়, ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। অবশ্য আপনার অনুমতি যদি পাই তবেই। পরমানন্দের কণ্ঠে বিনীত প্রার্থনা।

মাধবানন্দ বললেন : তোমাকে বাধা দেবার সাধ্য আমার নেই। তাঁর ইচ্ছা—

তিনিই সব করবেন। তবে আমি অন্য বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য এসেছিলাম।

এতক্ষণে স্বামী মাধবানন্দ ও পরমানন্দ গোস্বামী মন্দির সংলগ্ন চত্বরের কাছে এসে গেছেন। মাধবানন্দ নিজে চত্বরের সিঁড়ির ধাপে বসলেন এবং পরমানন্দকে বসার জন্য বললেন। তারপর উভয়ের মধ্যে আশ্রমের নানাবিধ কাজকর্ম বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে লাগল।

কিন্তু পরমানন্দের মন বিক্ষিপ্ত। তিনি কদিন হলো দেবলীনাকে একটি বারের জন্য চোখে দেখেননি, কথাতো দূরের কথা।

স্বামীজী এবার অন্যকথায় চলে এলেন। তিনি বললেন: অতিথিশালায় তিনদিনের বেশী এক মহিলা কলকাতা থেকে এসে আছেন। তিনি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। ঐ মহিলা আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে চান। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য তিনি তৃতীয় কোন ব্যক্তির সামনে বলবেন না। তারপর তিনি দীক্ষান্তে এই আশ্রমে থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

পরমানন্দ এ বিষয়টি খুব ভাল করেই জানেন, তবে অতিথিশালার সব কিছু দেখা শোনার ভার রঞ্জাবতীর ওপর। তিনিই এ বিষয়টি স্বামী মাধবানন্দ ও পরমানন্দের গোচরীভূত করেন।

পরমানন্দ বললেন: মহিলা বিবাহিতা এবং সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলে মনে হয়। রঞ্জাবতীর কাছে তিনি তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজী বললেন: সে কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তিনি স্বপ্নে নাকি আমারই মতন একজনকে দেখেছেন—যিনি তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। রঞ্জাবতীর কাছে শুনেছি, ওই মহিলা বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কোথাও নাকি তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই গুরুর সন্ধান পাননি। অবশেষে তাঁর এই আশ্রমে আগমন এবং আমাকে দেখে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা আমিই নাকি তাঁর স্বপ্নাদিষ্ট গুরু।

এতক্ষণ পরমানন্দ সব কথাই শুনলেন। তারপর তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন: এখন আমার কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্বামী মাধবানন্দ বললেন।

পরমানন্দ বললেন: মহিলার স্বপ্নবৃত্তান্ত যদি সত্য হয়, তবে তাঁর সঙ্গে একবার আপনি যদি কথা বলেন, তাহলে আপনার কাছে ঐ মহিলার আগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া দীক্ষা দেওয়া আর না দেওয়া সবই তো আপনার ওপর নির্ভর করছে।

মাধবানন্দ বললেন : মহিলা বিবাহিতা শুনে আমি রঙ্গাবতীকে বলেছিলাম : দীক্ষা গ্রহণের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু মহিলা তার উত্তরে বলেছেন : সেটা গুরু-শিষ্যার ব্যাপার। তা ছাড়া স্বামী যদি নাস্তিক হয়, তা হলে স্ত্রী কি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হতে পারবে না? দীক্ষা বলতে কি বোঝায়? দীক্ষা মানে তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ। স্বামীজী কি আমাকে শুধু এইটুকু অনুগ্রহ করবেন না? পতিতকে উদ্ধার করাই তো গুরুর কাজ। সমাজে যারা অবনত, স্খলিত, ভ্রষ্ট, অধোগত—তাদের জন্যই তো প্রয়োজন পতিতপাবন।

এই সব বলার পর স্বামী মাধবানন্দকে মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হতে দেখা যায়।

পরমানন্দ বললেন : আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্বামীজী। আমি মহিলার সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনা করে যদি বুঝি আপনার দেখা করা একান্তই প্রয়োজন, তখনই আমি তার ব্যবস্থা করব। নতুবা তাঁকে অতিথিশালার নিয়মানুযায়ী আজই অন্যত্র কোথাও চলে যাবার কথা জানিয়ে দেব।

স্বামী মাধবানন্দ বললেন : অতটা কঠোর না হয়ে মহিলার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তা যদি জানতে পার তা হলে ভাল হয়। আমাদের ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী কোন কাজই আমাদের করা উচিত হবে না।

পরমানন্দ কেন জানি না বললেন : আশ্রমে নারীর প্রবেশাধিকার যদি না থাকতো তা হলে কিন্তু ভাল হতো।

স্বামীজী বললেন : পরমানন্দ, নারী হচ্ছে শক্তিস্বরূপা। নারী হচ্ছে প্রকৃতি। স্বাভাবিক নিয়মে নারী ও পুরুষ যদি একত্রে সাধন ভজন করে—তবে সাধনমার্গের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না। আসল হলো ভাবানুষঙ্গ। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে স্থান—তা হচ্ছে অন্তর্বেদি। যার আর এক অর্থ হলো ব্রহ্মাবর্তদেশ। এখানে অবস্থান করলেই হয় অন্তর্দর্শন। কাজেই নারী বিঘ্নের কারণ যারা বলে—তারা দুর্বল প্রকৃতির।

পরমানন্দ গোস্বামী বললেন : উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ বহু তপস্বীর তপোভঙ্গ করেছে। এ কথা তো সর্বজনবিদিত।

স্বামীজী বললেন : এ সবই দৈবাধীন।

তর্কে না গিয়ে পরমানন্দ শুধু বললেন : একদিন আপনিই বলেছিলেন, নারী ও পুরুষদের জন্য আশ্রমে পৃথক ব্যবস্থা করবেন। রঙ্গাবতী দেখাশোনা করবেন মহিলাদের সব কিছু।

—না পরমানন্দ। তুমি আর রঙ্গাবতী আমার সর্বাপেক্ষা আস্থাভাজন

একজন হচ্ছে আমার দক্ষিণ হস্ত, আর অপরজন বাম হস্ত। তোমরা এই আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। কখন বা পূরক, আবার কখন বা কুম্ভক ও রেচক। তা ছাড়া ঐ যে নর-নারীর সম্বন্ধ নিয়ে যত ভাবনা চিন্তা সবই সাধন ভজনের পরিপন্থী, এ শুধু দুর্বল মানুষের ধারণা। তুমি বোঝ না পরমানন্দ কানু বিনা রাই ভাবা যায় কি? আবার শ্রীরাধা বিনা শ্রীকৃষ্ণ তো জ্যোতির্বলয়-হীন অন্ধকারময়। বাংলার কৃষ্ণ মানুষ। তিনি মহাভারত বা ভাগবতের দেবতা কৃষ্ণ নন। জানো পরমানন্দ, মানবীয় প্রেম-দাস্য-সখ্যাদির উপরই দৈব ভক্তি ও দিব্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণব কাকে বলে? মহাপ্রভু বলেছেন, 'যাহার দর্শনে আসে কৃষ্ণনাম। / তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥'

স্বামী মাধবানন্দ আরো বললেন: ওই যে মহিলা গুরু সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওঁর ঘুরে বেড়ানই সার হবে। গুরুর সন্ধান উনি পাবেন না। জানো তো— 'যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।' গুরু তো উপলক্ষ মাত্র। আসলে ভগবানই হলেন গুরু। 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়লেই দেখা যাবে মহাপ্রভু বলেছেন: 'গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।'

না-না, অনেক কথা হয়ে গেল। বলে স্বামী মাধবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। পরমানন্দও উঠে দাঁড়ালেন।

যাবার আগে স্বামী মাধবানন্দ বললেন: নর-নারীর একত্রে থাকা নিয়ে নানা মানুষ নানা কথাই বলে থাকেন। আসল কথা হলো সংকীর্ণতার উর্ধ্বে যদি মনটা না থাকে তবে জাতপাত, উচ্চনীচ ভাবনায় মন পেয়ে বসবে। মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'আমি তো ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্যও নই, শুদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, বর্ণাশ্রমী বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই। যিনি নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগর-স্বরূপ আমি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই চরণকমলের দাসানুদাস মাত্র।' সার কথা হলো— শাস্ত্রবোধ অগ্রাহ্য, প্রেমই মান্য, মানুষই সারতত্ত্ব। স্বামী মাধবানন্দ আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

আসল কথা হল স্বামীজী আশ্রমে পুরুষ ও নারীর উভয়েরই ভূমিকা আছে বলে মনে করেন। যাঁরা সনাতন পন্থী বা রক্ষণশীল, তাঁরা নারীসঙ্গ পরিহার করে চলেন। তার কারণ সাধন ভজনে নারীর উপস্থিতিতে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রেম অনুভবের জন্য পুরুষ ও নারীর প্রয়োজনীয়তা আছে। পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই জানে নিজেকে। একে অন্যকে প্রেম করে। কিন্তু অন্যের প্রেমের অনুভূতি বা আনন্দর কথা সে পুরুষই

হোক বা নারীই হোক—তা কেমন করে জানবে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেমের কি আনন্দ, কি মহিমা—তা স্বয়ং সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণও জানতেন না। তাই তো তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আকুলতা। অনুরূপ শ্রীরাধা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তাঁর প্রেমসঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনসুখ জানার জন্য। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও প্রেমের সাধনায় অপূর্বত্ব লক্ষণীয়। বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব চারিদিকে বিস্তারিত হওয়ার মূলে প্রেমের রাজ্যে একটা নতুন যোগলীলা জগতের সন্ধান পাওয়া গেল। স্বামী মাধবানন্দ সেই জগতের মানুষ। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রমের' ভক্তরা বিশ্বাস করেন, প্রেমসাধনাতে ভগবৎ প্রেমও মানবীয় প্রেমের একটি পরমরূপ। প্রেমবস্তু ভগবৎকৃপা ছাড়া দুর্লভ।

পরমানন্দ অতিথিশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। রঞ্জাবতীকে দেখলেন ব্যস্ত হয়ে পাকশালার কাজকর্ম তদারকি করছেন। পরমানন্দকে দেখে রঞ্জাবতী এগিয়ে এসে বললেন : হরে কৃষ্ণ।

প্রত্যুত্তরে পরমানন্দ বললেন : হরে কৃষ্ণ।

রঞ্জাবতী এবার পরমানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ?

পরমানন্দ বললেন : আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি রঞ্জাবতী।

—আমি জানি আপনি কি কারণে এসেছেন। আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এ কথাটা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। আমরা যাবো আপনার কাছে পরামর্শ নিতে। আপনার উপদেশ আমাদের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। রঞ্জাবতীর এই কথায় পরমানন্দ একটু বিস্মিত বোধ করেন। বিস্মিত বোধ করেন রঞ্জাবতীর তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার কথা ভেবে। বিদেশিনী হয়েও রঞ্জাবতী আশ্রমের সকল কাজকর্মের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন যে তা সহজে ভাবাই যায় না। শুধু কথা বললে বোঝা যায় তিনি বিদেশিনী, নতুবা তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি ও দায়িত্ববোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আর কতদিন বা তিনি এই আশ্রমে এসেছেন ? এখনও তিন বছর হয়নি। অথচ দেখলে মনে হবে তিনি এই আশ্রমে দীর্ঘদিন আছেন। সত্যিকথা বলতে কি রঞ্জাবতী একটি নিবেদিত প্রাণ। তাঁর মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ণবীর সব লক্ষণ বর্তমান।

পরমানন্দ সহাস্যবদনে বললেন : তোমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে তুমিই বলো আমি কি কারণে এসেছি।

রঞ্জাবতী বললেন: আমার অনুমান আপনি ঐ মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

পরমানন্দ স্বীকার করলেন রঞ্জাবতীর অনুমান সত্য।

রঞ্জাবতী এবার বললেন: মহিলা স্বামীজীকে দেখেছেন এবং তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করছেন—যাতে আমি স্বামীজীর সঙ্গে ওঁর নিভৃতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিই। এ বিষয়ে আমি খুব বিব্রতবোধ করছি। কিন্তু ঐ নিভৃতে সাক্ষাতে বলার ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমাল বলে আমার মনে হয়।

পরমানন্দ বললেন: চলো আমরা দুজনে ওঁর কাছে যাই। তারপর কথা বলে দেখি মহিলার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না।

রঞ্জাবতী রাজি হয়ে গেলেন পরমানন্দের প্রস্তাবে। তারপর দুজনে মিলে গেলেন মহিলার কাছে।

অতিথিশালার দ্বিতলে একটি ঘরে মহিলা তখন একটি চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়ছিলেন। পরমানন্দ ও রঞ্জাবতীকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বললেন: আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য আমার।

পরমানন্দ আগে এবং রঞ্জাবতী তাঁর পিছু পিছু গিয়ে একটি কাঠের বেঞ্চিতে দুজনে গিয়ে বসলেন।

রঞ্জাবতীকে মহিলা জানেন, তার কারণ অতিথিশালায় আসার দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে রঞ্জাবতীর পরিচয় হয়েছে। কিন্তু পরমানন্দ? তাঁর সঙ্গে মহিলার ইতিপূর্বে কোন পরিচয় হয়নি। তাই রঞ্জাবতী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন: ইনি পরমানন্দ ব্রহ্মচারী। আমাদের আশ্রমের উপ-প্রধান বলতে পারেন। কেননা স্বামীজী শুধু মন্দিরের পূজা অর্চনা নিয়েই থাকেন। আর আমাদের মতন সেবক সেবিকারা আশ্রমের অন্যান্য কাজকর্ম দেখাশোনা করে থাকি।

মহিলা করজোড়ে নমস্কার জানালেন।

রঞ্জাবতী এবার বললেন: আপনার নামটা কিন্তু আমার জানা নেই। মহিলা বললেন: সে কি কথা! যেদিন প্রথম এলাম সেদিন আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে খাতায় লিখে নিলেন। আমি স্বাক্ষর করলাম। আশ্রমের অতিথিশালায় আপনারা নাম ঠিকানা নিয়েই তবে প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকেন।

রঞ্জাবতী এবার বললেন: ওতো রুটিন মাফিক কাজ। আমার মনেও নেই। আপনিই বলুন না।

মহিলা বললেন: মিসেস এন. রায় চৌধুরী।

রঙ্গাবতী বললেন : আপনি আপনার নাম প্রকাশে এত কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন ? অতিথিশালায় থাকার পক্ষে ওই নাম ঠিকানাই যথেষ্ট বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা আলাপ করতে এসেছি তখন আপনি নামটিকে গোপন রাখতে চেষ্টা করছেন।

এবার পরমানন্দ বললেন : আপনি নাম প্রকাশে যখন কুণ্ঠিতা, তখন ওই প্রসঙ্গ বাদ দিন। কিন্তু স্বামীজী আমাদের মারফৎ একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। এই কথা শুনে মহিলা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বললেন : কি বার্তা ?

পরমানন্দ বললেন : স্বামীজী আপনার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

মহিলাকে এবার বেশ উত্তেজিত হতে দেখা যায়। তিনি বললেন : আমি তাঁর শিষ্যা হতে চাই। ভক্তের আবেদন তিনি শুনবেন না ?

পরমানন্দ এবার খুব শান্ত স্বরে বললেন : আপনার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি, কিন্তু আপনি চান স্বামীজীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎকার, কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে না। এরূপ সাক্ষাৎকার স্বামীজী অনুমোদন করেননি।

এ কথায় মহিলা বেশ মুষড়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে থাকেন। রঙ্গাবতী বললেন : আপনার প্রকৃত পরিচয় যদি আপনি জানান—তবে আমরা স্বামীজীকে এ বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করার কথা বলতে পারি। পরমানন্দ মহিলাকে চিন্তিত দেখে বললেন : মা, আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি বিশেষ কোন কারণবশতঃ আপনার আত্মপরিচয় গোপন রাখতে ইচ্ছুক। আপনাকে আমরা কথা দিতে পারি আপনার পরিচয় আমরা গোপন রাখবো। কিন্তু পরিচয় জানার জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করার একমাত্র কারণ স্বামীজী এই আশ্রমের অধ্যক্ষ। তার নিরাপত্তার জন্য আমাদের জানা বিশেষ প্রয়োজন। মা, আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার পরিচয় ও এই আশ্রমে আগমনের উদ্দেশ্য আমাদের বলতে পারেন। আমরা স্বামীজীর লীলা সহায়ক।

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান মহিলা। শুধু তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : নামহীন, গোত্রহীন, ব্যঙ্গ জগতের। মহাভারতের কর্ণের সব ছিল, তবু তাঁর পরিচয় সূতপুত্র বলে উচ্চারিত হয়েছে বারবার। কিন্তু কেন ? সবই ভাগ্যের বিড়ম্বনা। আমি বিবাহিতা, অথচ স্বামী পরিত্যক্তা। বিবাহিত মেয়েদের স্বামীর পরিচয়ই পরিচয়। এখন সেই পরিচয়টুকু সিঁথির সিঁদুর দিয়ে আগলে রেখেছি।

আমি বিবাহিতা জেনে মানুষ সসম্ভ্রমে আমার সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু যে মুহূর্তে জানবে আমি স্বামী পরিত্যক্তা সেই মুহূর্তে আমার মান সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের চোখে হয়ে যাব যেন এক দণ্ডিত আসামী। তখন কেউ বিচার করবে না আমার স্বামী স্বার্থপরের মত তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য, তা পালন করেননি। তখন কেউ বিচার করবে না আমার স্বামী আত্মসুখের জন্য আমার কুমারী মনের স্বপ্ন, বিবাহিত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আমার জীবনের তিলে তিলে গড়া স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে চলে গেছেন। এবার মহিলা পরমানন্দকে লক্ষ্য করেই বললেন: তুমি আমাকে মা বলে সম্বোধন করেছো, তাই তোমাকে বলি পুরুষ শাসিত সমাজে 'কলঙ্ক' শব্দটি নারীর নামের সঙ্গে যথেচ্ছাচার ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি শুনেছি বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে উদারতা আছে। গোঁড়ামি নেই অনুমান করে এই আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যদি তোমরা অভয় দাও তো বলি—আমার কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই। বাকি জীবনটা নামগান করে কাটিয়ে দেব।

এবার কিন্তু পরমানন্দ একটু অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মুখে তাঁর কোন কথা নেই, মহিলার জীবনে যে দুঃখ আছে—সে সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু রঞ্জাবতীর ধারণা মহিলা তাঁর আত্মপরিচয় গোপন করছেন তারও একটা বিশেষ কারণ আছে। সবই বলছেন, অথচ কি কারণে স্বামী-তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন তা কিন্তু কিছুই বললেন না। তাহলে কি বুঝতে হবে স্বামী অন্যকোন নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন? কিন্তু মহিলার কথায় সে রকম কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। হঠাৎ রঞ্জাবতী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার স্বামী এখন কোথায় আছেন?

মহিলা এ রকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বললেন: জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আর কিই বা করছেন।

রঞ্জাবতী বললেন: আপনার কি অনুমান আপনার স্বামী অন্য কোন নারীর প্রতি মোহমুগ্ধ হয়ে আপনাকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও সুখে দিন যাপন করছেন।

মহিলা বললেন: সে রকম কোন ধারণা আমার নেই। কেননা আজ পর্যন্ত কেউই আমাকে আমার স্বামীর বিষয় কিছুই বলেন নি। কাজেই শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন মতামত জ্ঞাপন করা উচিত হবে না।

পরমানন্দ বললেন: মা আপনি যা গোপন রাখতে চেষ্টা করছিলেন তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আপনি সাক্ষাৎ দেবী। এই আশ্রমে আপনার যতদিন ইচ্ছা

থাকতে পারেন।

মহিলা বললেন : বড় আশ্বস্ত হলাম বাবা তোমার কথায়।

রঙ্গাবতী বললেন : পরমানন্দজী যখন বলছেন তখন আপনি থেকে যান। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হবে না।

—কিন্তু কেন? মহিলার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব।

রঙ্গাবতী বললেন : স্বামীজী নিভৃতে আপনার সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করবেন না। যা প্রকাশ্যে করা যায় না, তা গর্হিত কাজ বলে তিনি মনে করেন।

মহিলা বললেন : এ কি আপনার অভিমত না স্বামীজীর?

—স্বামীজীর। আমি তাঁর দাসী মাত্র।

মহিলা এবার পরমানন্দকে বললেন : তোমারও কি মনে হয় বাবা স্বামীজী এই অভিমত পোষণ করেন?

—হ্যাঁ মা। পরমানন্দ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন।

মহিলা এবার বললেন : তা হলে আমি কোনদিন স্বামীজীর পাদপদ্মে ঠাঁই পাব না?

—আপনি ভগবদারাধনা করুন তাহলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। স্বামীজীও ভগবৎ আরাধনায় সব সময় মগ্ন থাকেন।

এই কথা বলে রঙ্গাবতী উঠে দাঁড়ালেন।

পরমানন্দও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আজ আমরা আসি মা। আপনি সাক্ষাৎ দেবী। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমরা ধন্য।

মহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। পরমানন্দ ও রঙ্গাবতী যেমন ভাবে অতিথিশালায় এসেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে দ্রুত পায়ে অতিথিশালা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

ফেরার পথে রঙ্গাবতীই প্রথম কথাটি তুলল।

—মহিলার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা গেল না, কিন্তু কোথায় যেন একটা রহস্য আছে।

পরমানন্দ বললেন : মহিলা খুব সতর্কতার সঙ্গে আত্মপরিচয় গোপন করে গেলেন। রহস্য বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ জানি না, তবে তিনি যে স্বামীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা কিন্তু তাঁর কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল।

—কি করে আপনি তা বুঝলেন?

উত্তরের আশায় রঙ্গাবতী থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

পরমানন্দ বললেন : মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন, কিন্তু একটি বারও বললেন না তাঁর স্বামী চরিত্রহীন, লম্পট। এমন কি অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত সে কথাও মুখ ফুটে বললেন না।

রঙ্গাবতী বললেন : আপনার অনুমান সত্য। স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও মহিলার স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে।

আবার চলা শুরু হলো। রঙ্গাবতী ও পরমানন্দ আশ্রমের পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছেন।

রঙ্গাবতী বললেন : আপনি তো মহিলাকে অতিথিশালায় থাকার কথা বলে এলেন। আমার মনে হয় উনি সহজে আশ্রম ছেড়ে যাবেন না।

পরমানন্দ বললেন : তিনদিনের জায়গায় তিন সপ্তাহ থাকলে কিছু এসে যায় না। শুধু ভাবনা মহিলার দ্বারা আশ্রমের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

রঙ্গাবতী বললেন : আমারও সেই ভাবনা। আচ্ছা স্বামীজীর সঙ্গে মহিলা যদি দেখাই করেন, তাতে কি এসে যায়। আমরা তো সব কিছুর ওপর লক্ষ্য রাখবো।

পরমানন্দ বললেন : তুমি স্বামীজীকে সব কথাই বলো। মহিলা সম্পর্কে তোমার যা ধারণা হয়েছে—সে কথাও বলবে। তারপর স্বামীজী যদি মহিলার প্রস্তাবে সম্মত হন, তা হলে বলার কিছু নেই। আর তিনি যদি দেখা করতে না চান তবে আমরা সেই মতো ব্যবস্থা করবো।

রঙ্গাবতী কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন : আমার কিন্তু কেন জানি না মহিলার সব কথা শুনে মনে হচ্ছে—একটা কিছু অশুভ ঘটতে চলেছে। আমাদের সকলের সাবধান থাকা উচিত।

পরমানন্দ বললেন : সবই শ্রীহরির ইচ্ছা। তিনি যা করবেন তাই হবে।

এই কথার পরও রঙ্গাবতী বললেন : আমার মনে হচ্ছে মহিলা ছলে বলে কৌশলে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত হবেন এবং তাঁর যা অভিপ্রায় সেই মতো কাজ করবেন।

পরমানন্দ বললেন : তোমার আশঙ্কা অমূলক নয়, কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁদের কোন অকল্যাণ কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

রঙ্গাবতী ছুটে চলে গেলেন তাঁর আবাসস্থলে। যাবার সময় তিনি বেশ জলে ভিজে গেলেন।

পরমানন্দ একটি গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু প্রবল বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করা বোধ হয় খুব সহজ নয়। তা ছাড়া অবিরাম বর্ষণ শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ পরমানন্দ অপেক্ষা করলেন, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। কতক্ষণ আর এইভাবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। অগত্যা পরমানন্দ তাঁর গৃহ অভিমুখে রওনা হলেন। যখন তিনি তাঁর গৃহে পৌঁছলেন তখন তিনি বৃষ্টির জলে সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন। দেখলে মনে হবে পরমানন্দ যেন কোন নদী বা সরোবরে সদ্যস্নাত অবস্থায় ফিরেছেন। তাঁর সারা দেহ শুচি স্নিগ্ধ।

হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে প্রকাশিত হলো: দেবলীনা। এতে কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন। পুনরায় তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো: দেবলীনা, দেবলীনা। এতক্ষণ বুঝি তিনি একটু ঘোরের মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ সংবিৎ হতে তিনি বলে উঠলেন: জয় শ্রীরাধে, জয় শ্রীরাধে।

তারপর যথারীতি কয়েকবার তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো: হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

। ৬ ।

বর্ষণমুখর রাত্রি। পরমানন্দ আজ বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। সারাদিন নানা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মনে হয় তিনি বড় একা। দেবলীনার অদর্শনে তিনি বড় অস্থির বোধ করেন। সারা শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করেন পরমানন্দ। তবে কি এই সেই বিরহ জ্বালা? না আর ভাবতে পারেন না পরমানন্দ। প্রতি মুহূর্তে এখন তাঁর দেবলীনার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই তপস্বিনী দেবলীনাকে—যিনি নিশীথে অতি সন্তর্পণে এসে পরমানন্দর এতদিনের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। প্রতিরোধ করার কোন শক্তি জানা ছিল না পরমানন্দের। তিনি বুঝতে পারেননি কোন মোহিনী শক্তির বলে দেবলীনা এমন অসাধ্য সাধন করলেন। সেই মুহূর্তে পরম ও চরম আনন্দ উপভোগ করেছিলেন পরমানন্দ। সে কি অনুভূতি—তার রেশ আজও মনে পড়লে কেমন যেন বিভোর হয়ে যান পরমানন্দ। দেবলীনা অভিসারিকা, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য রক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়েছিলেন পরমানন্দ। পাপ পুণ্যের কথা এখানে আসে না। আনন্দই হচ্ছে জীবনের একমাত্র কাম্য। যা স্বাভাবিক,

তাকে অস্বীকার করবে কি করে? কিন্তু দেবলীনার সান্নিধ্যে যে আনন্দ তা পরমানন্দ কিছুই ভুলতে পারেন না।

মনে পড়ে পরমানন্দর 'শ্রীরাধার রসোদ্‌গার' প্রসঙ্গ।

'সখি' কি বলবো, বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। যা দেখলাম তা স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, অতি নিকটে কি দূরে, বলতে পারি না। শ্রীরাধারূপিণী তড়িৎলতার তলে শ্রীকৃষ্ণরূপ তিমির অর্থাৎ অন্ধকার প্রবেশ করল। উভয়ের মধ্যে মুক্তাহাররূপ সুরধনী ধারা। শ্রীরাধার উন্মুক্ত কেশরাশি যেন তরল তিমির এবং শ্রীকৃষ্ণের ললাটের চন্দনবিন্দু যেন শশী। শ্রীরাধার ললাটের সিন্দুর বিন্দু সূর্যের ন্যায় গ্রাস করল। পুষ্পমালা থেকে চ্যুতপুষ্প যেন চতুর্দিক থেকে তারাসমূহ খসে পড়তে লাগল। অম্বর খসে পড়ল অর্থাৎ বস্ত্র খসে পড়ল। কুচ যুগরূপ ধরাধর পর্বত উল্টাইয়া গেল। ধরণী ডগমগ দুলতে লাগল অর্থাৎ নিতম্বস্বরূপ। ঘননিঃশ্বাসরূপ সমীরণ খরতর বেগে সঞ্চারিত হল। ভ্রমরীগণ রোদন করতে লাগল, অর্থাৎ শীৎকার ধ্বনি হতে লাগল। প্রলয়পয়োধিজল যেন আবরিত করল। অর্থাৎ স্বেদে সর্ব-শরীর আপ্লুত হল।

লক্ষ্য করার বিষয়—অন্ধকার চন্দ্রসূর্যকে গ্রাস করল, তারারা সব খসে পড়ল, আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, পর্বত উলটে গেল, পৃথিবী দুলতে লাগল, প্রলয়পয়োধি জলে পৃথিবী ডুবল—এ সবই প্রলয়কালীন ব্যাপার হলেও যুগবসান ব্যাপার নয়। কবি বিদ্যাপতি বলেছেন, বিপরীত কথা, বা গূঢ়ার্থে বিপরীত বিহারের কথা কে প্রত্যয় করবে?'

পরমানন্দের মনে পড়ে দেবলীনার আচরণ। পরমানন্দ অনভিজ্ঞ, দেবলীনা এ বিষয়ে পারদর্শিনী। বিপরীত বিহারে পরমানন্দকে পরাস্ত করা যে সহজ তা দেবলীনা জানতেন। আর জানতেন বলেই তিনি এই কাজ অনায়াসে করতে পেরেছেন।

কিন্তু পরমানন্দ যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন—তাতে তাঁর ক্ষুধা যেন দ্বিগুণ আকার হয়ে উঠেছে, তৃষ্ণা হয়ে উঠেছে দুর্নিবার। তাঁর মনে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। তিনি শুধু অনুভব করেন জ্বালা—যা অনঙ্গের শরবিদ্ধ জ্বালা।

মনে পড়ে ত্রেতাযুগের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান। বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এক তরুণী বারাঙ্গনার আলিঙ্গনে অনুভব করেছিলেন অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, তাঁর সত্তায় সঞ্চারিত হয়েছিল অমৃতস্পর্শ। সেই তরুণী বারাঙ্গনা ছলনায় ঋষ্যশৃঙ্গকে আত্মসাৎ করেছিলেন। যা ছিল তাঁর অজ্ঞাত, সেই ছলনাময়ী ছলে বলে কৌশলে তা

দেহের সব উপাচার দিয়ে বশীভূত করে ফেলে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে।

পরমানন্দর কেন জানি না আজ বার বার ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথাই মনে পড়ছে। পিতা বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমকে জনসম্পর্করহিত রেখেছিলেন, আশ্রমকে এমনভাবে রেখেছিলেন যেখানে কোন নারীর সংস্রব থাকবে না। এ সবেরই লক্ষ্য পাছে তাঁদের তপস্যার পরাভব ঘটে। কিন্তু বিধির বিধানকে বিভাণ্ডক মনে করলেন পাপকুণ্ডের দ্বারা সম্পৃক্ত হল আশ্রম।

অথচ ঋষ্যশৃঙ্গের তরুণী বারাঙ্গনার সংস্পর্শে এসে যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল—তাতে দেখা যায় ঋষ্যশৃঙ্গের জপমন্ত্র হয়ে উঠলো: নারী মোহিনী, মায়াবিনী। নতুন এক জগতের তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে নারীর সংস্পর্শে আনন্দলাভ করা যায়।

বিভাণ্ডক তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বলেছিলেন, পুত্র তুমি প্রতারিত হয়েছো। তোমার মন থেকে ঐ পাপমূর্তিকে মুছে ফেলো। স্বপ্নেও কখনো ঐ নারীকে স্থান দিও না। যোগাসনে বসে ইন্দ্রিয়রোধ কর, তাহলে তুমি ঐ পাপিটার হাত থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু পিতার এই উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুতেই ঐ তরুণীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। মন তাঁর হাহাকার করে। তিনি ঐ রমণীর রমণীয় স্পর্শ, গন্ধ, দেহের উষ্ণতাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা চিন্তা করেন। বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। পরমানন্দের অবস্থাও অনেকটা ঋষ্যশৃঙ্গের অনুরূপ।

আকাশে ঘন অন্ধকার। অবিরাম বর্ষণে পৃথিবী সিক্ত। পরমানন্দ তাঁর শয্যায় দেহকে এলিয়ে দেন, কিন্তু চোখে তাঁর ঘুম নেই। অসহ্য এক যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন।

আজ তাঁর এমন অবস্থা কেন হল? তিনি কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারেন না। তবে কি দেবলীনার জন্যই তাঁর এই অবস্থা? পরমানন্দ সত্যি এবার বিচলিত বোধ করেন। সামান্য এক নারী তাঁর জীবনকে এইভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? না না—তা হবে না।

পরমানন্দ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চেষ্টা করেন। তিনি বলে ওঠেন: হে শ্রীহরি, তুমি আমার সহায় হও।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর পরমানন্দের মনে হল: হৃদয় যখন বিরহের অন্তর্দাহে হাহাকার করছে তখন তাঁর বিদ্যাপতিকে স্মরণ করলে হয়ত বা স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যাপতি দুজন ছিলেন। একজন মৈথিলী, অপরজন

বাঙালী। দুজনেই প্রাক চৈতন্যযুগের কবি। পরমানন্দ মৈথিলী বিদ্যাপতির অনুরাগী। তাঁর চুরাশিটি গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কথা ও সুরের অপূর্ব মধুরতা। পরমানন্দর সবকটি গীতিকবিতা কণ্ঠস্থ। তিনি যখন আপন মনে গান করেন তখন তাঁর মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। কখন মনে মনে আবার কখন বা উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গান করেন। পরমানন্দ সাধনসিদ্ধ গায়ক।

'সখী প্রবোধ দিয়ে শয্যাতলে আনল। হরষিত হৃদয়ে তাকে নিজ হাতে ধরল। ছুঁতেই বালিকা মলিন হয়ে গেল। ঠিক যেন বিধু কোলে অর্থাৎ চাঁদের কোলে কুমুদিনী মলিন হল। না না বলে, আর নয়নে জল ঝরে। রাই শয্যাপ্রান্তে শুয়ে রহিল। করে কুচস্পর্শ, সেও অল্প হল। রাই আঁচল দিয়ে তার মুখ ঢাকা দিল। স্থির হতে পারল না, থর থর করে কাঁপতে লাগল। বিদ্যাপতি বলছেন—ধৈর্যই সার, দিনে দিনে মদনের অধিকার হয়।'

'হে হরি, যদি বলপূর্বক আমাকে স্পর্শ কর, তাহলে তুমি স্ত্রীহত্যার পাতক হবে। তুমি রসে অগ্রণী অর্থাৎ রসিকশ্রেষ্ঠ, নির্ভয়, নির্লজ্জ ও শঠ নাগর। আমি বুঝি না রস তিক্ত কি মিষ্ট। রস প্রসঙ্গে আমার কম্পন জাগে, যেন বাণে হরিণী ঝম্পপ্রদান করছে। অসময়ে আকাঙ্ক্ষায় কামনা পূর্ণ হয় না। ভাল লোক পরিণাম বিরস কাজ করে না। অর্থাৎ এমন কোন কাজ করে না যে কাজের পরিণাম রসহীন, নিরানন্দ। বিদ্যাপতি বলছেন—সাচ্চা বুঝলাম, কাঁচা ফল মিষ্ট হয় না।'

'হরি, নীবিবন্ধন কি জন্য দূর করছ? এইরূপে অর্থাৎ নীবিবন্ধন না খুলেই তোমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেখে কি সুখ তা বিচার করে বুঝি না। বনমালী, বুঝলাম তুমি বড় ধৃষ্ট। মুরারি, আমার শপথ তুমি যেন দেখ না, যদি দেখ তবে আমি আস্তে আস্তে গালি পাড়ব। গোপনে বিহার কর, দেখার কাজ কি? তাহা আমার প্রাণ সহ্য করবে না। এ প্রকার কোথাও শুনিনি যে, প্রদীপ জেলে কেউ বিহার করে। পরিজন যেন শুনতে পায় না এইরূপ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। আস্তে আস্তে রমণ কর, কারণ পরিজনেরা পাশেই আছে। বিদ্যাপতি বলছেন—লছিমিদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।'

এতক্ষণ পরমানন্দ আপন মনে এই ভাবনা নিয়ে গুনগুন করে গান করছিলেন। এবার কেন জানিনা শয্যাত্যাগ করে তিনি উঠে বসলেন এবং তারপর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতে লাগলেন ঃ

"উঠ উঠ মাধব কি সুতসি মন্দ।
গহন লাগ দেখু পূর্ণিমক চন্দ ॥

হার রোমাবলি যমুনা গঙ্গ।
ত্রিবলী-ত্রিবেণী-বিপ্র অনঙ্গ ॥
সিন্দুর তিলক তরণি সম ভাস।
ধূসর মুখ ঘসি নহি পরগাস ॥
এ হেন সময় পূজহ পাঁচ বান।
হোঅ উগরাস দেহ রতিদান ॥
পিক মধুকর পুর কহইত বোল।
অলপও অবসর দান অতোল ॥
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভনে।
রাত্র শিব সিংঘ সব রসক নিধান ॥"

অর্থাৎ মাধব, ওঠ ওঠ শুয়ে রয়েছো কেন? এখন শুয়ে থাকা সমীচীন নয়। দেখ রাধার মুখ যেন পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে। (অর্থাৎ প্রথম মিলনের জন্য রাধার মুখ মলিন হয়েছে)। তার হার রোমাবলি গঙ্গা ও যমুনা। (এখানে মুক্তাহার শ্বেতবর্ণ গঙ্গাধারার ন্যায় এবং রোমাবলি কৃষ্ণবর্ণ যমুনা প্রবাহের ন্যায়), তার ত্রিবলি ত্রিবেণী এবং অনঙ্গ পুরোহিত-ব্রাহ্মণ)। তার সিঁদুর তিলক সূর্যের মত দীপ্ত রয়েছে। তার ধূসর মুখশশীর প্রকাশ নেই। প্রকৃত অর্থে—মুখ এমন মলিন হয়েছে যেন গ্রহণ লাগায় চন্দ্রের দীপ্তি লোপ পেয়েছে। এ হেন সময়ে তুমি মদনকে পূজা কর, রাধাকে রতিদান কর, মুখচন্দ্রের গ্রাসমুক্তি হোক। (অর্থাৎ এই হচ্ছে যথার্থ সময়। তুমি রাধাকে রতিদান করলে সম্ভোগের আনন্দে তার মুখের মালিন্য দূরীভূত হবে)। পিক ও মধুকর পূর্ণস্বরে ধ্বনি করছে। অবসর অল্প, দাম অতুল্য। এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে—এই সুযোগ স্বল্পকাল স্থায়ী, কারণ গ্রহণ দীর্ঘকাল থাকে না। রাধাকে গোপনে আনা হয়েছে। বেশি সময় রাখা হবে না; এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ দান অতুলনীয়। গ্রহণোপলক্ষে দান বা রতিদান সম্পন্ন করতে হবে।
বিদ্যাপতি কবি এই জানেন। রাজা শিবসিংহ সকল রসের আধার।
পরমানন্দ আবার শুরু করলেন:

"কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চান্দ অকাসে।
হরিণি নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে ॥

সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাসি ন যাসি।
তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল ॥
তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি ॥
কুচভয়ে কমল কোরক জলে মুদি বহু
ঘট পরবেশে হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
সম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু
করভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন
কহব মদন পরতাপে ॥'

অর্থাৎ—

"তোমার কবরীর ভয়ে শিখী গিরি-কন্দরে গেছে। মুখের ভয়ে চাঁদ আকাশে লুকিয়েছে, নয়নের ভয়ে হরিণী, স্বরের ভয়ে কোকিল ও গতির ভয়ে হস্তী বনে আশ্রয় নিয়েছে। সুন্দরি, কেন তুমি আমাকে সম্ভাষণ না করে চলে যাচ্ছ? তোমার ভয়ে ওরা তো সব দূরে পালাল, তুমি পুনরায় তাহলে কাকে ভয় করছ? তোমার কুচের ভয়ে কমল-কোরক জলে নিমীলিত রহে, ঘট আগুনে প্রবেশ করে (কুম্ভকার কাঁচা ঘটকে আগুনে পোড়ায়), দ্রাড়িম ও শ্রীফল গগনে পালায় এবং শম্ভু গরল পান করেন। প্রকৃত অর্থে—তোমার কুচযুগল পদ্মকলি ঘট, দাড়িম, বেল ও শিব লিঙ্গের সহিত তুলনীয়, উহাদের অপেক্ষা সুগঠিত ও সুশ্রী। তোমার ভুজের ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে থাকে এবং তোমার করের ভয়ে কিশলয় কম্পিত হয়। বিদ্যাপতি বলছেন—এইরূপ মদনের প্রতাপের কথা কত বার বলব।"

পরমানন্দ স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পান। বেতারের এক এক তরঙ্গে যেমন এক এক স্বর-ধ্বনি ভেসে ওঠে, আজ এই মুহূর্তে পরমানন্দের মনে এমনি এক তরঙ্গ এসে ধ্বনিত হয় এবং তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পান দেবলীনাকে। বিদ্যাপতি 'দানখণ্ডে' যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই অপরূপা যেন দেবলীনা। দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পরমানন্দর।

অথচ এ উচ্চকোটিতে অবস্থান নয়। এ হচ্ছে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় মাত্র।

পরমানন্দ মনশ্চক্ষে দেখতে পান দেবলীনাকে।

দেবলীনা যেন বলছেন :

'স্তনে নখ লাগছে, সখীজন দেখবে। তুমি তো বোঝ পর্বত কিরূপে চন্দ্ররেখা গোপন করবে? অধিক আরতি ও লোভ করো না। সকলেরই প্রথম প্রথম চক্ষুলজ্জা থাকে। হরি, হৃদয়ের হার কেড়ে নিও না। প্রথম পসারেই দুই কূলে অপযশ হবে। উচিত মত খেয়ার কড়িতে নিজের দান নাও। হে রসিক, গোপীজনের মান রাখ। তুমি যদুকুল জাত, আমিও কুলীন গোপী। বনমালী, বিপথে চলিও না। বড় পুণ্যেই মুরারীর আদর পাওয়া সম্ভব।'

সংবিত যেন ফিরে পান পরমানন্দ। আবার শুরু করেন :

"কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।
কইসে নুকাএত গিরি সসিরেখ ॥
আরতি অধিক ন করিঅ লোভ।
সব রাখএ পহিলহি মুখ সোভ ॥" ইত্যাদি

'নৌকাবিলাসে'র গান। কাকুতি মিনতি করে দেবলীনা বলছে। পার করে দাও তোমার পারের কড়ি বুঝিয়ে দেব। দুজনের দেহই রসময়, গুণের সীমা নেই। দুজনের জোড় লাগলে ভাঙ্গে না। কে না কতরকমে কি না করল। তাতে কি কানু ও রাই বিচ্ছেদ হল? কত কি তো দেখলাম। ক্ষীর আর নীরের মত প্রেম আর দেখা যায় না। যখন দুধকে আগুনের তাপে রেখে ঘন করার চেষ্টা করা হয় —তখন জলের শোকে মনস্তাপে দুধও উথলিয়ে ওঠে। জলের বিরহবিয়োগে আগুনে ঝাঁপ দেয়। একটু জল ঢেলে দিলেই ক্ষীরের বিরহ ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

বিদ্যাপতি বলেছেন—ইহাই উত্তম প্রেম। রাধা মাধবের প্রেম এমনি।

বাহিরে এখন শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। বৃষ্টি থেমে গেছে। দক্ষিণের হিমেল হাওয়া এসে পরমানন্দের মন প্রাণ যেন শীতল করে দিল।

পরমানন্দ ধ্যানমগ্ন বলে মনে হবে। তিনি এবার মন প্রাণ ঢেলে গাহিলেন :

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গনাইতে দোস গুনলেস না পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥

কিএ মানুস পশু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।।
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ।।"

অর্থাৎ—হে মাধব, তোমাকে বহু মিনতি করছি। তোমার পায়ে তিল তুলসী দিয়ে দেহ সমর্পণ করলাম। আমার প্রতি নির্দয় হয়ো না। যখন তুমি বিচার করবে—তখন দোষই বেশী দেখতে পাবে, গুণের লেশমাত্র পাবে না। তুমি জগতের নাথ। আমি অতি ক্ষুদ্র হলেও জগতের বাহিরে নয়। কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী অথবা কীটপতঙ্গ রূপেই জন্মগ্রহণ করি, তবু যেন তোমাতেই মতি থাকে। বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর হয়ে বলেছেন—এই ভবসিন্ধু উত্তরণে তোমার পদপল্লব অবলম্বন করব, দীনবন্ধু, এক তিলের জন্যও সেই অবলম্বন দাও।

রাত্রি শেষপ্রহর। নিদ্রালস চক্ষে পরমানন্দ তাঁর শয্যা গ্রহণ করলেন। এখন তাঁর শরীর মন দক্ষিণের হিমেল হাওয়ায় আর অসহিষ্ণু নয়। সহজেই তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

অতি সন্তর্পণে দেবলীনা এসে উপস্থিত হলেন পরমানন্দর শয্যাপাশে। অনেকক্ষণ সময় শুধু পরমানন্দকে নিরীক্ষণ করলেন তিনি। বিমোহিত হয়ে গেলেন তাঁকে দেখে। গৌর তনু, অপূর্ব সে লাবণ্য। নিখুঁত মুখমণ্ডল, যেন বিধাতা-পুরুস নির্জনে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন পরমানন্দকে। অথচ তাঁর মধ্যে পৌরষত্ব বিদ্যমান, যা যে কোন মেয়ের কাম্য। অধিকারে আবার ঈর্ষা জাগায়।

দেবলীনা নিদ্রাতুর পরমানন্দকে কখন দেখেননি। আজ যখন তা দেখলেন তখন তাঁর মনে হল এ যেন পৌরাণিক উপাখ্যানের কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। নররূপে এই পৃথিবীতে এসেছেন। নির্ধারিত কাল উত্তীর্ণ হলেই আবার ফিরে যাবেন স্বর্গলোকে। তাই তাঁর মধ্যে দেখা যায় স্বর্গীয় সুষমা উদ্ভাসিত।

অন্ধকারের মধ্যে উদ্যান সংলগ্ন ক্ষীণ আলোর রশ্মি গৃহকোণে এসে পড়েছে। তারই অস্পষ্ট আলোয় দেবলীনা পরমানন্দকে নিবিষ্ট হয়ে দেখেন। মনে হয় কোন এক কলাকুশলী শিল্পী নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন। যা আপন মাধুরীতে সব কিছু

মধুময় করে তুলেছে।

বাহিরের হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝে এসে মন প্রাণ শীতল করে দিচ্ছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। গাছ লতাপাতা সবই বৃষ্টির জলে সিক্ত। দেবলীনা একটু উষ্ণতা চান। হৃদয়ে তাঁর দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। মনে মনে তিনি চেয়েছিলেন পরমানন্দ তাঁকে বুঝি একবার ডেকে পাঠাবেন। কিছু অন্তত বলবেন। কিন্তু না। পরমানন্দ দেবলীনার সাক্ষাৎ পাননি। আর দেখা হলে নিশ্চয় তিনি কোন না কোন কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেবলীনার খোঁজ করাটা শোভন হবে না বলে মনে হয়েছিল। অথচ দেবলীনা এদিকে ভাবছেন—দিনের আলোয় তিনি কি ভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর সামনাসামনি হবেন। কেমন যেন একটা বাধা, একটা অহেতুক লজ্জাবোধ তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

প্রকৃতপক্ষে দেবলীনা চেয়েছিলেন পরমানন্দের কাছে আরো সহজ, আরো স্বাভাবিক হবেন, কিন্তু কেন জানি না তিনি তা হতে পারেন নি। এদেশের সংস্কার বোধ হয় দেবলীনাকে বেশী করে পেয়ে বসেছিল।

দেবলীনা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। পরমানন্দের পাশটিতে অতি সন্তর্পণে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে অনেকটা সেই ভাবে দেবলীনা পরমানন্দকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে শুয়ে রহিলেন। তার দেহের উষ্ণতা অনুভব করলেন দেবলীনা। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন বহে গেল।

দেবলীনা পরমানন্দকে আদর করতে লাগলেন। হৃদয়ের যা কিছু সঞ্চিত আছে—তা যেন সব উজাড় করে দিতে চান তিনি। নিঃশেষ হওয়ার মধ্যে আছে পরম তৃপ্তি। পরমানন্দ দেবলীনার আদরে সাড়া দিলেন। এতক্ষণ তিনি মনে করেছিলেন স্বপ্ন, এখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

দেবলীনার চুম্বনে নিদ্রিত পরমানন্দের সারা শরীরে এখন জোয়ার এসেছে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন আছড়ে পড়ে তীরে—অনেকটা সেইরকম পরমানন্দের প্রবল ইচ্ছা দেবলীনার শরীরের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। প্রবল সে জলোচ্ছ্বাস। মনে হবে প্রলয় অনিবার্য, যুগবসান যেন নিশ্চিত। অশান্ত দুটি হৃদয়ে চলে মন্থন। অমৃত সন্ধানের জন্য চলে সমুদ্র মন্থন।

জাগে জন্তু, জাগে হৃদয়। তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত সমুদ্র। শোনা যায় শীৎকার ধ্বনি। যা ছিল অপূর্ণ তা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। যা ছিল হৃদয়ের অনুচ্চারিত বেদনা—তা আজ প্রশমিত হতে চলেছে।

দেবলীনা ও পরমানন্দ যেন একটি বিন্দুকে স্পর্শ করার জন্য প্রবল সংগ্রাম করে চলেছেন। যে বিন্দু স্পর্শে অনুভব করা যায় স্বর্গীয় আনন্দ। পরমানন্দ আজ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর দেহের সকল শক্তি দিয়ে নিষ্পেষিত করেন দেবলীনাকে। ওষ্ঠে ওষ্ঠ দিয়ে তিনি পরম আনন্দকে শুষে নেবার জন্য অভিনব এক ভঙ্গি করেন। দেবলীনা তাঁর ঐশ্বর্যকে নিঃসঙ্কোচে লুন্ঠিত হতে দিতে চান। তাই কোন প্রতিরোধ নেই। পরমানন্দের চোখে কামনার দীপ্ত শিখা। মধুতে সৌরভে ভরা একটি ফুলকে মধুকর যেন মধু আহরণ করছে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ক্রমে দেখা যায়—পরমানন্দ স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর অবসন্ন দেহটা তখনও দেবলীনাকে আশ্রয় করে আছে। তারপর ক্লান্ত, নিস্তেজ দুটি দেহ এখন একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে আছে। দূরে অশান্ত সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত বলে মনে হয়। আর নেই সেই তরঙ্গের উচ্ছলতা, নেই কোন উদ্দাম ভাব।

পরমানন্দ তাঁর কান দিয়ে অনুভব করেন দেবলীনার বুকের স্পন্দন।

দেবলীনা তাঁর হাত দিয়ে নিবিড় করে কাছে টেনে নিলেন পরমানন্দকে। তারপর অসংখ্য চুম্বনে বুঝিয়ে দিলেন: আমি খুব সুখী। তুমিও তৃপ্ত তো পরমানন্দ?

এখানে কোন ভাষা নেই।

চোখে চোখে মনের কথা হয়। হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকলে একের ভাষা অপরের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। দেবলীনা পরমানন্দকে দেখছেন। বিমোহিত হয়ে দেখছেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁর যা কিছু সঞ্চয় সব আজ উজাড় করে দিয়েছেন তাঁরই এক প্রেমিকাকে। পাপ পুণ্যের প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়—দেবলীনার জীবন সার্থক। অগাধ তৃপ্তি তো প্রতিটি নারীর কাম্য। কাজেই দেবলীনার সৌভাগ্য যে তিনি পরমানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, নিঃশেষ করার অধিকার লাভ করেছেন। আজ আর কোন ভীরুতা নেই তাঁর মধ্যে। 'জয় করে তোর ভয় কেন তোর যায় না।' কথাটা দেবলীনার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। জয়ের আনন্দে চোখে মুখে তাঁর দীপ্তি। এখানে ভীরু প্রেম নয়। পরমানন্দ দেবলীনার মুখ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন: কি দেখছো তুমি?

—আপনাকে।

পরমানন্দ দেবলীনার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন: আপনি নয়, তুমি বল। ঐ যে তোমাকে একদিন বলেছিলাম: তুমি আমি হয়ে গেছ, আমি তুমি হয়ে গেছি। তারপর আর যেন কেউ না বলে—তুমি আর আমি ভিন্ন। দেবলীনা

এবার বললেন : তোমাকে। তোমাকে দেখছি। তোমার সব কিছু ভারি ভাল লাগছে! এই 'তোমাকে' সম্বোধনটি যেন পরমানন্দ শুনতে চাইছিলেন। এরপর আর কোন ভেদাভেদ রহিল না।

পরমানন্দ দেবলীনার অধরে অধর দিয়ে তাঁর মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন।

—আমায় কি ভাল লাগছে?

—মনে হচ্ছে তুমি যেন দেবদূত।

দেবলীনার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের আভাস।

—আর কি দেখছো?

—দেখছি, তুমি তপোধন। তোমার লক্ষ্য ধ্রুব। তোমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। পরমানন্দ এই কথায় যেন নিজের বিষয় একটু সচেতন হলেন। কিছুক্ষণ কি যেন সব চিন্তা করলেন। এতক্ষণ যা ঘটে গেল—তার প্রয়োজন ছিল। তা না হলে মনে শান্তি ছিল না, স্বস্তি ছিল না। দেবলীনাকে নিয়ে পরমানন্দ যা করলেন —তা হচ্ছে অনুষ্ঠান। আর স্বস্ত্যয়ন যদি বলা যায় তবে তা হবে যথার্থ।

দেবলীনা এবার জিজ্ঞাসা করলেন : কি ভাবছ?

পরমানন্দ বললেন : তোমাকে।

—আমাকে? আমার মধ্যে কি দেখলে?

পরমানন্দ বললেন : তোমাকে এখন প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। তুমি নিশ্চল হয়ে বসে আছ বিছানার ওপর যেন মৃণ্ময়ী মূর্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে—এই মাত্র কুঞ্জবন থেকে এসে যেন বসে আছে সাক্ষাৎ রাধারাণী।

তোমার কবরী দেখলে মনে হয় ভ্রমর পুঞ্জ। সদ্যফোটা ফুলের স্নিগ্ধ সুবাস; তাতে তোমার চোখ দুটি সরোবরের প্রস্ফুটিত কমলের মত স্নিগ্ধ। তাতে বনহরিণীর স্নিগ্ধ চাহনি। ঠোঁট দুটি পলাশের পাপড়ির মতন রঙীন ও মসৃণ।

জিহ্বা তোমার শোণিত সিক্ত কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র। বাহু তোমার মৃণাল দণ্ডের মত মধুকরকে প্রলুব্ধ করার জন্য রয়েছে তাতে পুষ্প কোরক, তোমার ঐ চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো। জঙ্ঘা তোমার পুরুষ্ট। হৃদয়ের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রক্ত কমলের মত চরণ যুগল। উরু দুটি—গজদন্তের মত শুভ্র। স্তন দুটি পূর্ণিমার রাত্রের চাঁদের মতন নিটোল, নারীত্বের মহিমায় তা উজ্জ্বল; মধুকরের সঞ্চিত মধুতে পরিপূর্ণ। তোমার নাভি—সদ্যজাত শিশুর দেহের মত কমনীয়। সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যে এক পলক তোমার দিকে তাকালে মনে হয় তুমি যেন কামনার অগ্নিময়ী শিখা। অথচ তোমার মধ্যে আছে নারীর কমনীয়তা।

পুরুষের কামনার শিখায় তোমার ঐ রূপ, ঐ ঐশ্বর্য কতবার যে পুড়েছে, তবু তুমি অম্লান, অক্ষত, অটুট আছো। তুমি নারী—তুমি চিন্ময়ী।

দেবলীনা পরমানন্দের মুখে তার হাত দিয়ে চেপে ধরেন।

তারপর চোখে চোখ রেখে বললেন : দোহাই তোমাকে, আর কোন প্রশস্তি নয়। পরমানন্দ দেবলীনার হাত দুটি নিজের হাতে ধরে বললেন : জানো দেবলীনা, হাতে হাত দিলে অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়। একই সঙ্গে শরীর ও মনকে স্পর্শ করা যায়।

দেবলীনা যত পরমানন্দের সঙ্গে আলাপ করেন ততই অভিভূত হয়ে পড়েন ; ইচ্ছে করে না যেতে, কিন্তু উপায় নেই।

দেবলীনা উঠে দাঁড়ান। ফিরে যাবার জন্য তার মধ্যে একটা ত্রস্ততার ভাব।

পরমানন্দ বললেন : তুমি চলে যাবে দেবলীনা ?

—রাত শেষ হয়ে এলো। এখুনি যেতে হবে।

—আর একটু থাকতে পারো না ?

—উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে এসেছি, দিনের আলোয় ফেরার মত সাহস নেই।

পরমানন্দ বললেন : দুর্নাম, কলঙ্কের ভয় আছে।

দেবলীনা বললেন : আমার নেই, তবে আমার জন্য পাছে তোমার ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি করতে চাই না। তা ছাড়া পাছে তোমাকে হারাতে হয়—তাই এত সাবধানতা।

—তুমি আবার এসো। দিনের আলোয় দেখা কোর, তা হলে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে পারবো। তোমাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাছে পাব। দেবলীনা মুখে কিছু না বলে মৃদু হেসে পরমানন্দের কথায় সম্মতি জানালেন। তারপর চুপিসারে যেমন এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই চলে গেলেন।

। ৭ ।

শর্মিলার ব্যবহারে অসিত খুব মর্মাহত হয়েছে। সে ভাবতেই পারেনা শর্মিলা তাকে কোন কিছু না বলে এমন ভাবে চলে যেতে পারে। শর্মিলাই তো অসিতকে এখানে নিয়ে এসেছিল, অথচ অসিতকে একলা ফেলে সে চলে গেল।

যতই অসিত এই কথাটি ভাবে ততই তার লজ্জা, ক্ষোভ ও অভিমানে মনটা গুমরে ওঠে। হয়তো শর্মিলার খুব রাগ হয়েছিল। হয়তো সে ভেবেছিল অসিত ইচ্ছা করেই এমন একটা কাজ করল—যাতে তাদের এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। অসিত তো ইচ্ছে করে নিরুমাসিকে নিয়ে আসেনি। পথের ধারে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন নিরুমাসি। তাঁকে ঘিরে শুধু মানুষের জটলা হচ্ছে। অসিত অতি সাধারণ কৌতূহলবশতঃ দেখতে গিয়ে দেখে, নিরুপমা অজ্ঞান হয়ে পথের ধারে পড়ে আছেন। অসিত এক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই নিজেকে এ বিষয়ে জড়িয়ে ফেলে। কেননা নিরুপমাকে চিনতে পেরে অসিত কাছে গিয়ে যেই নিরুমাসি বলে ডেকেছে, অমনি নিরুপমা একবার চোখ খুলে অসিতের হাতটি চেপে ধরেন। বড় কষ্ট হয়েছিল অসিতের। হাজার হোক আত্মীয়কে এ অবস্থায় ফেলে চলে আসা তার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হয় নি। আর যারা ভিড় করেছিল তারা মুমূর্ষু মহিলার আত্মীয়কে পেয়ে মোটামুটি যে নিশ্চিন্ত, এমনি একটা ভাব দেখাতে লাগল। অগত্যা অসিত নিরুপমাকে নিয়ে হলিডে হোমে আসা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

আর তা ছাড়া মানবতার দিক থেকে দেখলে যে কোন মানুষই এমন কাজ করত—যা অসিত করেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে অসিত যা করেছে—তা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু শর্মিলা আশাহত হয়েছিল। সে ভাবতেই পারেনি অসিত কদিনের জন্য বেড়াতে এসে এমন একটা উদ্ভট কাণ্ড করে বসবে। মনে মনে সে কত স্বপ্নই না দেখেছে। কটা দিন আনন্দে কাটাবে, যেখানে কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না। থাকবে না কোন সামাজিক শাসন। যদিও এই তথাকথিত সামাজিক বিধি নিষেধ যা শাসনের নামে ব্যবহৃত হয়, তাকে শর্মিলা কোনদিনই তেমন আমল দেয় না।

কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে এসে অপরিচিতের মধ্যে যতটা আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব—কলকাতায় থেকে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা শর্মিলার মা মেয়েকে সব সময় বলে থাকেন : 'সাহস থাকা মেয়েদের ভাল, কিন্তু দুঃসাহস মোটেই ভাল নয়। কাজেই অসিতকে নিয়ে পুরী আসা এবং সেখানে দুজনে মিলে রাত্রি বাস—ওই দুঃসাহসের পর্যায় পড়ে। আর রাত্রিবাস বলতে যে 'আনন্দ'-র কথাটা মনে পড়ে—তা দুঃসাহসের নামান্তর বলে মনে হয় শর্মিলার মায়েদের কাছে।

তবে একটা কথা সত্যি শর্মিলা অসিতকে ভালবাসে। অবশ্য এই ভালবাসাটা একটা শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত। আর এই বিন্দুটি হচ্ছে অসিতকে প্রয়োজনের সময় পাওয়া এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছন যায়। সোজা ভাষায় যাকে বলা যায়—আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে যে নামেই ডাকা যাক না কেন—আসলে মুহূর্তের জন্য যে মোহাবিষ্ট হওয়া যায় সেইটেই আনন্দ।

পরিণত মন হলে একে প্রেম বা ভালবাসা বলে না। ইচ্ছা পূরণের জন্য যতটুকু না বললে নয়, ঠিক ততটুকু বলা হয়। এখানে আবেগের কোন ভূমিকা নেই। পুরো ব্যাপারটাই বস্তুনিষ্ঠ মনের বহিঃপ্রকাশ।

অসিত কিন্তু শর্মিলার সব কিছুকেই আন্তরিকভাবে নিয়ে থাকে। সে যখন যা মুখ ফুটে প্রকাশ করে, অসিত তা বিশ্বাস করে। তাই শর্মিলা যখন নিজের প্রয়োজনে অসিতকে ব্যবহার করার জন্য বলে, আমি তোমাকে ভালবাসি। অসিত তা বিশ্বাস করে। শর্মিলার ভালবাসাকে যাচাই করে দেখারও সে কোন প্রয়োজনবোধ করে না।

শর্মিলা কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের মতন নয়। পুরুষ সম্পর্কে তার ধারণা অদ্ভুত। তার বাবাকে দেখেছে তার মাকে অবহেলা করতে। স্বার্থপরের মতন তার বাবা নিজে যা বুঝেছে—তাই করেছে। কোনদিন শর্মিলার মার সঙ্গে পরামর্শ করাতো দূরের কথা একদিনের জন্যও বলেনি কি ভাবে তাদের বিরাট পৈতৃক সম্পত্তি ব্যবসা করতে গিয়ে লাটে উঠে গেল।

শর্মিলার মনে পড়ে, তার মা ঠাকুমারা চিরকাল বাবাকে তোয়াজ করে এসেছে। পুরুষ মানুষ যা ভাল বোঝে তাই করে। মেয়ে মানুষের আর কি বুদ্ধি। শর্মিলা দেখেছে : তার বাবার জন্য সমগ্র পরিবার আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কাটাতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েদের এই পরনির্ভরতা তার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। বন্ধুমহলেও এ নজির বিরল নয়।

শর্মিলা দেখেছে, অনেক মেয়ে স্বামীর পয়সায় গহনা কাপড় পেয়ে খুশিতে

ডগমগ করছে। অথচ তার কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। স্বামীর কথায় ওঠা বসা ছাড়াও স্বামীর লাঞ্ছনাও সহ্য করছে, শুধু পতিব্রতা নামটাকে বজায় রাখবার জন্য। যা প্রকারান্তরে বলা যায় 'পতিব্রতা' নামটা কেনার জন্য।

শর্মিলার সঙ্গে ঐ সব মেয়েদের কোন মিল নেই। শর্মিলা মনে করে পুরুষ ছাড়াই মেয়েরা সব কিছু করতে পারে। পুরুষরা শুধু মেয়েদের কাছে শয্যাসঙ্গী হিসাবে অপরিহার্য। বাকি—মেয়েরা পুরুষ ছাড়াই সবকিছু করতে পারে। অর্থাৎ পুরুষের মুখাপেক্ষী না হলেও চলে। শর্মিলা এই মতবাদে বিশ্বাসী।

অসিত শর্মিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও তার স্বরূপটা তার ভাল জানা নেই।

শর্মিলা চলে যেতে অসিত তাই খুব মুষড়ে পড়ে।

যেদিন সকালে উঠে অসিত দেখল শর্মিলা ও নিরুমাসি দুজনেই চলে গেছে—সেদিন অসিত শুধু অপেক্ষা করে গেছে। সে মনে মনে আশা করছে—শর্মিলা নিশ্চয় রাত্রে অন্তত ফিরে আসবে। দেখতে দেখতে অসিতের চোখের সামনে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। ঐ যে প্রবাদ আছে: 'সময় ও তরঙ্গ কারুর জন্য অপেক্ষা করে না'। কথাটা খুব সত্যি, কিন্তু অপেক্ষমান রাত্রির বড় ধীর গতি। সহজে কাটতে চায় না।

অসিতের মনে হয়: যে মহিলাকে সে নিরুমাসি মনে করে ওই রাত্রে নিয়ে এসেছিল, আসলে সে হয়তো নিরুমাসি নাও হতে পারে। অনেকটা মনে হয়েছে নিরুমাসির মতন। তা না হলে তিনিই বা অত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অসিতকে কোন কথা না বলে চলে গেলেন কেন?

বা অসিতের উচিত হয়নি এমন ভাবে শর্মিলার সঙ্গে পরামর্শ না করে, হুট্ করে ওই অসুস্থ মহিলাকে এখানে নিয়ে আসা। শর্মিলা তো বড় আশা করে এসেছিল। কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাবে বলে, অথচ অসিত সেই আনন্দর অন্যতম অংশীদার হয়েও শর্মিলার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। একে মূর্খামি ছাড়া আর কি বলা যায়? না মূর্খামি নয়, একে আহাম্মুখী বলা যায়। আরো স্পষ্ট হয় যদি বলা যায় বেওকুফ।

যাই হোক, যা ঘটে গেছে তার তো কোন চারা নেই। কাজেই অসিতকে মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। কিছুতেই স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। সমুদ্রে যেমন অবিরাম তরঙ্গ ভেঙ্গে ভেঙ্গে তীরে আছড়ে পড়ছে। তার যে ধ্বনি—তা যেন চাপা আর্তনাদ বলে মনে হয় অসিতের। এই তরঙ্গ ধ্বনির সঙ্গে তার হৃদয়ের ধ্বনির মিল খুঁজে পায় অসিত। যা আর্তনাদেরই

নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অসিত এলোমেলো অনেক কিছুই চিন্তা করে। একটা কলম নিয়ে কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটে। আবার বার বার লেখে—'শর্মিলা ফিরে এসো'।

এই যে ব্যাকুলতা, একে কি বলা যাবে? অসিত অবুঝ শিশুর মত শুধু শর্মিলার জন্য আকুলি বিকুলি করে। দরজার পর্দা কোনরকম বাতাসে জোরে নড়ে উঠলে, অসিতের মনে হয়: ঐ বুঝি শর্মিলা ফিরে এসেছে।

তারপর সব ভুল ভেঙ্গে যায়। অসিত যে শর্মিলাকে এত বেশী ভালবাসে—তা সে নিজেও কোনদিন বুঝতে পারেনি। শর্মিলার অন্তর্ধানের পর এই ব্যাপারটা সে বেশি করে উপলব্ধি করতে পেরেছে। অদর্শনে মনে যে অস্থিরতা দেখা দেয়—তারই নাম প্রেম। এটা অনুভূতির ব্যাপার, সংজ্ঞা দিয়ে তা বোঝান যায় না।

শেষে অসিতের ধারণা হল শর্মিলা বোধ হয় কোনারক, চিল্কা হ্রদ বেড়াতে গেছে। দুদিন পরে নিশ্চই ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায় শর্মিলা? অসিত একে একে কোনারক, চিল্কা হ্রদ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি আশেপাশের সব জায়গায় শর্মিলার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও সে তার দেখা পেল না।

হলিডে হোম ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারে স্বর্গদ্বারের কাছে একটা হোটেলে এসে উঠেছে অসিত। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তার কাজ হল চক্রতীর্থ থেকে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বেড়ান। শুধু আশা, যদি শর্মিলার সন্ধান পাওয়া যায়।

এমনি একদিন খুব জোরে অসিত স্বর্গদ্বার থেকে চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছে হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাকল: বাচ্চু...বাচ্চু।

বাচ্চু অসিতের ডাক নাম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অসিত। দেখল স্মিত-হাস্য এক সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে বললেন: তুমি বাচ্চু না?

হ্যাঁ। উত্তর দিল অসিত।

সন্ন্যাসী বললেন: তা তুমি কতদিন হল এখানে এসেছ?

তা প্রায় দশদিন হবে।

কোথায় উঠেছ?

অসিত এবার বলল: হোটেলে। কিন্তু আপনাকে তো আমি মোটেই চিনতে পারছি না।

তা চিনবে আর কি করে? আমি কিন্তু তোমাকে দেখে ঠিক চিনেছি।

অসিত সন্ন্যাসীকে দেখে বুঝতে পারে ইনি বৈষ্ণব। পরণে হালকা গৈরিক

বসন, গলায় তুলসী মালা, মুখে চিত্রিত রসকলি। কাজেই এই সন্ন্যাসী যে বিষ্ণু-উপাসক ধর্মসম্প্রদায়ের, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বড় বিস্ময় লাগে অসিতের। বিশেষ পরিচিত না হলে অসিতের ডাক নাম ধরে ডাকবেন কি করে!

অসিত জিজ্ঞাসা করে: আমাকে চিনলেন কি করে?

তুমি আর আমি একই কলেজের ছাত্র ছিলাম। তারপর য়ুনিভার্সিটিতে আবার দেখা। আমি ছিলাম দর্শনের ছাত্র, আর তুমি বাংলা নিয়ে পড়তে। যাক্ ও সব কথা। তোমার মা কেমন আছেন?

মা প্রায় তিন বছর হলো মারা গেছেন।

তুমি কি গড়পাড়ের বাড়িতে আছ, না অন্য কোথাও?

আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এখন বালিগঞ্জের দিকে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকি। একলা থাকি। মাঝে মধ্যে দিদি এসে থাকে। দাদারা মানে জ্যাঠতুত, খুড়তুত ভাই—এরা কেউ কেউ ওখানে আছে, আবার ওদের মধ্যে কেউ কেউ সল্টলেকে, ভি, আই, পি রোডের কাছাকাছি বাড়ি করে চলে গেছে।

সন্ন্যাসী বললেন: তোমার বীরেনদা আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।

এবার অসিত আর নিজের ঔৎসুক্যকে চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল: কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার বিশেষ পরিচিত। কিন্তু কি আশ্চর্য আমি আপনাকে কিছুতেই চিনতে পারছি না। দয়া করে যদি আপনার নামটা বলেন তা হলে ভাল হয়।

পরমানন্দ গোস্বামী। অনেকে আমাকে ব্রহ্মচারী বলে ডাকেন। আসলে আমি বিষ্ণু উপাসক। প্রকৃতপক্ষে সত্যি কথা বলতে কি আমি একজন দীন সেবক মাত্র।

না না ওই নাম নয়। আপনার আসল নাম।

বাচ্চু, তুমি হয়ত জানো না আমাদের গৃহী নাম বলা বারণ। তুমি যদি মনে করতে পার তাহলে আমি স্বীকার করে নেব। নতুবা আমার পক্ষে বলা কোন ক্রমেই উচিত হবে না।

না না বলুন। তা না হলে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

কিন্তু অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই। তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই আমার পরিচিত। তোমাদের বাড়িতে আমি যে কতদিন গেছি, খেয়েছি, থেকেছি তার কোন ইয়ত্তা নেই।

অসিত যেন মহাসমস্যায় পড়েছে। রহস্যভেদ করতে না পারলে যেন তার

ব্যক্তি নেই। কিন্তু তার কি প্রয়োজন? যদি কেউ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবে তাকে সন্ন্যাসী বলে মনে করলেই হল। এ নিয়ে এত চিন্তা করার কোন কারণ নেই। নির্লোভ যতি। এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

পরমানন্দ এবার জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি একা বেড়াতে এসেছো, না সঙ্গে অন্য কেউ আছে?

অসিত বলল: আমি একাই এসেছি।

তা হলে তুমি আমাদের আশ্রমে চলে এসো। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। হোটেল ছেড়ে দাও। আমাদের অতিথিশালায় তোমার কোন অসুবিধা হবে না। শুধু নিরামিষ খেতে হবে এই যা।

আমার নিরামিষ খাদ্যে কোন অসুবিধা হয় না। আমি পছন্দই করি।

তাহলে আর না করো না। চলো, তোমার হোটেল থেকে তোমার জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলো।

পরমানন্দ একরকম জোর করেই অসিতকে হোটেল থেকে আশ্রমে নিয়ে এলেন।

অসিতও আশ্রমে এসে এবং একজন পরিচিত ব্যক্তিকে পেয়ে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল। কেননা শর্মিলা চলে যাবার পর সে বড় একা হয়ে পড়েছিল। এখানে যাই হোক পরমানন্দ আছেন আর আশ্রমের পূজা অর্চনা ও ভক্তদের দেখেও বেশ ভাল লাগছিল অসিতের। কিছু না হোক পরমানন্দের সঙ্গে তো আলাপ আলোচনা করা যাবে। তা না হলে এ কদিন বড় কষ্টের মধ্যে কেটেছে। নিঃসঙ্গ জীবন যে কত ভারবাহী তা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম'। এই আশ্রমের অতিথিশালায় একটি ভাল ঘরে অসিতের থাকার ব্যবস্থা করেছেন পরমানন্দ। বৃন্দাবতীকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরমানন্দ বলে দিয়েছেন যে অসিতের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে।

বৃন্দাবতীকে দেখে অসিতের ভাল লাগে। বিদেশিনী এই মহিলার চেহারার মধ্যে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। উপরন্তু গৈরিক বসনে তাঁকে দেখলে মনে হয় ভক্তিমতি এই মহিলা আশ্রমের কাজে নিবেদিত প্রাণ। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন এবং ইংরেজি ও ফরাসিতে তাঁর যথেষ্ট দখল আছে।

এই আশ্রমে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই কৃষ্ণভক্ত। অসিত লক্ষ্য করে, যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও সুবিধা পেলে মালা জপে থাকেন।

পরমানন্দকে অসিত জিজ্ঞাসা করেছিল : ইস্কনের সঙ্গে তাদের আশ্রমের কোন সম্পর্ক আছে কি না ?

পরমানন্দ তার উত্তরে বলেছিলেন : সংগঠনের সঙ্গে তেমন কোন সংযোগ নেই, তবে আদর্শের দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে। ওঁরাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সব কিছু মেনে চলেন, আর আমরাও মেনে চলি। কাজেই লক্ষ্য ও আদর্শ এক। বৈষ্ণবের যা আচরণ বিধি তা আমরাও যেমন মেনে চলি, ওঁরাও তাই মেনে চলেন। ইস্কনে বিদেশী ভক্তর সংখ্যা বেশী, আর আমাদের আশ্রমেও কিছু ভক্ত আছেন—যাঁরা বিদেশী, ভগবৎ চিন্তায় দিন যাপন করেন।

আশ্রমের সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখতে বেশ ভালই লাগে অসিতের। এ যেন আর এক জগতে সে এসে পড়েছে। এ জগৎ সম্পর্কে তার তেমন কোন ধারণা ছিল না। পরমানন্দই তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

কথা প্রসঙ্গে পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি এখন কি করো ?

চাকরি করি। বহুজাতিক একটি সংস্থায় মাঝারি ধরনের একটা চাকরি।

বিয়ে থা করেছো ? সংসার ?

না। ওটা বোধ হয় এ জীবনে আর হয়ে উঠবে না।

কেন ?

সংসার বড় জটিল বলে আমার ধারণা। আগে মা বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। এখন মা নেই, কাজেই ওই ভাবনা আর নেই। তবে বাঁচার জন্য টাকা চাই, আর টাকার জন্য চাকরি। তা না হলে এই চাকরি বাকরি ছেড়ে কোথাও চলে যেতাম। অসিতের মুখে এই কথা শুনে বড় বিস্ময় বোধ করেন পরমানন্দ। আজকালকার ছেলেরা গাড়ি, বাড়ি, বৌ, স্ট্যাটাস এই সবই তো চায়। অসিত কি তাহলে ভিন্ন জাতের ছেলে ! পরমানন্দের মনে সায় দেয় না এ কথা। এর সমর্থনে তিনি কোন যুক্তি খুঁজে পান না।

অসিতের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। অনেক দিন পরে জানা শোনা কোন মানুষ দেখলে তার সঙ্গে পুরনো দিনের কথাবার্তা বলতে খুব ভাল লাগে। সে কারণে পরমানন্দ অসিতকে নানা কথাই জিজ্ঞাসা করেন।

হঠাৎ কি ভেবে পরমানন্দ বললেন : হারুদার খবর কিছু জানো ?

হ্যাঁ। হারুদা তার ভাইদের ফাঁকি দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি সব আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

হারুদার বোন নীলিমাকে মনে আছে ?

হ্যাঁ, নীলিমাতো মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেছিল না?

হ্যাঁ, তারই কথা বলছি। ঐ সম্পত্তিতে নীলিমাদিরও ভাগ ছিল। হারুদা নীলিমাদিকে পাগল সাব্যস্ত করে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সে কি কথা বলছো?

সেই তো কথা। ষড়যন্ত্র করে পাগল বলে তাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যস্, সম্পত্তির আর কোন দাবীদার রইল না।

সম্পত্তির জন্য মানুষ কত নীচ হতে পারে। বলে পরমানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর আরো বললেন: জানো বাচ্চু, হারুদার বাবা রায়বাহাদুর ছিলেন। ইংরেজ আমলে যাঁরাই রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন ইংরেজের বশংবদ। শুনেছি এই হারুদার বাবা ইংরেজ আমলে বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। প্রকাশ্য রাজপথে বিপ্লবীদের বাড়ির মেয়েদের উলঙ্গ করে নাকি বেত মেরেছিলেন। কাজেই হারুদাদের পরিবারটা হচ্ছে—অভিশপ্ত পরিবার। এত সম্পত্তি থাকতেও সব কেমন যেন চন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। শেষে দেখ হারুদার অবস্থাও কেমন শোচনীয় হয়।

অসিত বলল: আমার কিন্তু ওই সম্পত্তি-টম্পত্তি মোটেই ভাল লাগে না। যা আছে বা যা উপার্জন করতে পারি তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।

পরমানন্দ বললেন: এই জন্যই তো আমি সব ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছি। বেশ আছি। পরম শান্তিতে আছি।

অসিত বলল: ভগবৎ চিন্তায় আত্মনিবেশ করার মধ্যে মোক্ষলাভ সহজতর হতে পারে, কিন্তু মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিছু কর্তব্য আছে তো—সেগুলি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

পরমানন্দ বললেন: তোমার সঙ্গে এ নিয়ে এক সময়ে আমি বিশদ আলোচনা করব, তবে আজ নয়। তুমি থাকো, আমাদের আশ্রমের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হও, তারপর তোমার মনে যদি ওই প্রশ্ন আবার হয় তখন আলোচনা করব। ধর্ম কি? যা ধারণ করা হয় তাই তো ধর্ম। ধর্ম ও দর্শনে কোন বিরোধ নেই। দর্শন তো প্রত্যক্ষ করা। সত্যের জ্ঞানই তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শন।

বাহিরে থাকলে যা সত্য, জীবনে গৃহীত হলে তারই নাম ধর্ম। আসলে সত্যকে জানবার ইচ্ছাটাই জীবনের ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ।

হঠাৎ পরমানন্দকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অসিত বলল: আপনি ও আমি

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনি দার্শনিকতাকে সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্তির পথে। সমস্ত ধর্ম ও দীক্ষা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমি শুধু সাধারণ মানুষের মতন আহার নিদ্রা ও মৈথুন নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আমার মধ্যে অজ্ঞতা ও প্রেমহীনতা। কাজেই আমার বা আমার সমগোত্রীয় মানুষের দুঃখ অপরিসীম।

পরমানন্দ এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। যাবার সময় শুধু বললেন : বাচ্চু, তুমি বিশ্রাম কর।

আশ্রমের পরিবেশটা বেশ ভাল লাগছে অসিতের। রঞ্জাবতী ছাড়াও কিছু বিদেশী শিষ্য শিষ্যা এই আশ্রমে আছেন। তাঁদের চলাফেরা ও পোষাক পরিচ্ছদে কৃত্রিমতা নেই। দেখলেই মনে হয় সকলেই যেন স্বভাবসিদ্ধ। পাশ্চাত্যের বিত্ত বৈভব সব কিছু ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাতে মন প্রাণ ঢেলে দেওয়ার মধ্যে ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখা যায়। মুখমণ্ডলে রসকলি চিত্রিত, আর মুখে কৃষ্ণনাম।

আবার কোথাও বা কৃষ্ণপ্রেমে অশ্রুবিগলিত, মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীরা। চারিদিকে শুচিতা গাম্ভীর্য ও বৈরাগ্যের দ্যুতি বিদ্যমান। আবার দেখা যায় কীর্তনীয়া পরিবৃত উর্ধ্ব দুবাহু তুলে নৃত্যরত ভক্তবৃন্দ।

আশ্রমে নানা ধরনের ফল ফুলের গাছ। পাখিও আছে নানা জাতের।

পাখির ডাক শুনে জাত বোঝা যায়। অসিত আবার সব পাখি চেনে না।

বুলবুলি, ময়না টিঁয়া, চন্দনা, এসব শহরে দেখা যায়। কিন্তু এখানে এমন অনেক ধরনের পাখি আছে, যারা গাছের পাতার আড়ালে থেকে ডাকাডাকি করে। অসিতের এই ডাক ভাল লাগে, কিন্তু দেখতে ইচ্ছা হলেও সে পাখি দেখতে পাওয়া যায় না। অচিন পাখি। মনে পড়ে যায় 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমন থাকে ভাই।' লালন ফকিরের গান। দেহতত্ত্বের গান। আশ্রমের একপ্রান্তে জাল দিয়ে ঘেরা জায়গায় কয়েকটি ময়ূর ময়ূরী আছে। সব কিছু মিলিয়ে আশ্রমে বেশ একটা শান্তির পরিবেশ। এখানে থাকলে যে মহাভাব হবার সম্ভাবনা তা অসিতের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে দেখা যায়। আসলে ভাবইতো সব—তারপর রস। ভাব থেকেই রসের উদ্রেক।

বিকেলের দিকে অসিত আশ্রমের চারিদিক শুধু ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল।

সন্ধ্যারতি দেখার কথা বলেছিলেন রঞ্জাবতী। স্বামী মাধবানন্দ স্বয়ং এই আরতি করেন, তারপর শুরু হয় কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে বিশদভাবে বিচার বা আলোচনা।

পরমানন্দ মাঝে একবার এসে অসিতের খোঁজ খবর নিয়ে গেছেন। খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা হয়েছে কি না? অন্য কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না? যাবার সময় পরমানন্দ শুধু অসিতকে বলে গেছেন, সে যেন সন্ধ্যারতির সময় মন্দিরে অতি অবশ্যই যায়।

অসিতও কথা দিয়েছে সে নিশ্চয় যাবে।

কাজেই বিকেল থেকেই অসিত একরকম মন্দিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। হঠাৎ অসিতের সঙ্গে তার নিরুমাসির দেখা হয়ে গেল। অতিথিশালার প্রধান ফটকের কাছে নিরুপমা কার জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন। অসিতকে দেখে নিরুপমা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অসিত একেবারে মুখোমুখি হয়ে বলল: একি, নিরুমাসি তুমি এখানে কবে এলে?

নিরুপমা এর উত্তরে বললেন: এই কদিন হল এসেছি।

তা তুমি আমার ওখান থেকে কিছু না বলে চলে এলে কেন?

নিরুপমা এর কি উত্তর দেবেন তা ভেবে পান না। চুপ করে থাকেন।

অসিত এবার বলল: তোমাকে পথের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি তোমাকে আমার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ওই রাত্রে ডাক্তার ডেকে তোমার চিকিৎসা করাই। ডাক্তারের পরামর্শ মত সারারাত তোমার জন্য ঠায় জেগে বসে কাটিয়েছি। ভোরবেলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন আমার ভাঙ্গল, তখন দেখি তুমি আমার ওখান থেকে চলে গেছ। তোমার বিছানা খালি।

নিরুপমা বললেন, এ জন্য আমি খুব লজ্জিত বাচ্চু। আমার মনে হয়েছিল, আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের খুব বিব্রত করে ফেলেছি। তোমরা এখানে এসেছ বেড়াতে, একটু আনন্দ করতে। তোমাদের মধ্যে আমার উপস্থিতিটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছে আমার। তাই আমি তোমাদের কোন কথা না বলেই চলে এসেছিলাম। তবে তুমি বলতে পার—বলে আসাটা আমার উচিত ছিল। কিন্তু কেন জানি না বাচ্চু আমার কোন কিছু বলতে বেশ সঙ্কোচ হয়েছিল, তাই বলিনি।

অসিত এবার বলল: তুমি কিছু না বলে চলে এলে, কিন্তু ডাক্তার যথারীতি তার পরের দিন তোমার চিকিৎসা করতে এসেছিলেন। এইবার তুমি একটু ভেবে দেখ তখন আমার কি অবস্থা।

নিরুপমা বললেন: রাত্রে আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠি। তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি

ছিল তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে তোমার ও আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এইটে বুঝতে পেরেই আমি খুব ভোরে ওখান থেকে চলে আসার বিষয় মনস্থ করে ফেলি।

না না। ও কোনরকম বিরক্ত বোধ করেনি।

নিরুপমা এবার একটু মৃদু হেসে বললেন: বাচ্চু, আমি মেয়েমানুষ, কাজেই মেয়েদের মন আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারি।

অসিত ও নিরুপমা যখন কথা বলছিলেন, তখন রত্নাবতী দূর থেকে তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি আসছিলেন এই মহিলার সঙ্গেই কথা বলতে, কিন্তু তিনি এদিকে না এসে ফিরে গেলেন।

এই আশ্রমের সঙ্গে কি তোমার আগে থেকেই জানা ছিল?

নিরুপমা বললেন: বলতে পারো জানা ছিল, আবার জানাও ছিল না বলতে পার।

অসিত বলল: নিরুমাসি, তোমার কথার হেঁয়ালি ধরার মত আমার বুদ্ধি নেই। যদি স্পষ্ট করে বলতে পার তো বলো, তা না হলে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলাই ভাল। আমার কথা তোমার হেঁয়ালি বলে মনে হল। হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে যদি তোমাকে বলি তখন হয়তো তুমি বুঝবে আমি কেন এভাবে কথা বলেছি।

নিরুপমা এবার বললেন: এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলাটা বোধ হয় শোভন নয়। তার চেয়ে বরং চল আমরা মন্দিরের পথে যেতে যেতে কথা বলি।

অসিত বলল: বেশ তাই চলো।

অসিত নিরুপমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

নিরুপমা বললেন: জানো বাচ্চু, আমি স্বপ্নে এই আশ্রম বহুবার দেখেছি। এমনকি এই আশ্রমের যিনি অধ্যক্ষ বা প্রধান তাঁকেও আমি স্বপ্নে দেখেছি। এই স্বামী মাধবানন্দের সন্দর্শনের জন্য আমি বহু তীর্থস্থানে ঘুরেছি। কোথাও আমার স্বপ্নের স্বামীজীকে দেখতে পাইনি। অবশেষে ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবরের কাছে এক সাধুজী আমাকে বললেন, তুমি যাঁর সন্ধানে দীর্ঘকাল ধরে পথে পথে ঘুরছো, তিনি পুরীতে একটি আশ্রমে আছেন। তুমি সেখানে যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বিশ্বাস করো বাচ্চু, আমি এখানে এসে প্রথম যেদিন স্বামী মাধবানন্দকে দেখি সেদিন আমি বিস্মিত হয়ে শুধু ওঁকে দেখি। ইনিই আমার সেই স্বপ্নের স্বামীজী— যাঁর অন্বেষণে আমি বহু ক্লেশ, বহু ত্যাগ স্বীকার করেছি। কাজেই তোমাকে যখন

বলেছি—এই আশ্রম আমার জানা ছিল, তখন যেমন আমার কথাটা সত্যি, তেমনি জানা ছিল না কথাটাও মিথ্যে নয়।

অসিত নিরুপমার কথায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে আর অন্য কোন কথা বার হয় না।

অসিতকে চুপ করে থাকতে দেখে নিরুপমা বললেন: কি হলো তোমার বাচ্চু? কিছু বলো। সব তো শুনলে। আমার মনের কথা তো সব তোমাকে উজাড় করে দিলুম। এবার তোমার মন্তব্য শুনতে ভারি ইচ্ছে করছে।

অসিত বলল: এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই।

কেন—তুমি তো আমাকে অপ্রকৃতস্থ বলতে পার! কিংবা অপ্রাকৃত।

উত্তরের আশায় নিরুপমা অসিতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গেছে।

অসিত খুব শান্ত গলায় বলল: নিরুমাসি, আমি জানি মেসোমশাই আপনাকে ছেড়ে আজ প্রায় ষোল সতেরো বছর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। কাজেই আপনার যে কি জ্বালা তা আমি বুঝি। অন্য লোকে তা কি বুঝবে?

নিরুপমা এই কথায় অসিতের হাত দুটি ধরে বললেন: দোহাই তোমাকে, এ কথাটি তুমি আশ্রমের আর কারুকে বলো না!

। ৮ ।

নিরুপমা আজ কদিন হল এই আশ্রমে এসেছেন, কিন্তু একটি বারের জন্যও তিনি স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাননি। তিনি স্বামীজীর দর্শন লাভ করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছেন এবং তা অকম্পিত ও দেবাশ্রিত বলে মনে হয়েছে নিরুপমার। তাঁকে দেখে অনুরাগে ভরে গিয়েছে মন। কিন্তু নিরুপমা তাঁর নিজের কথা তো অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারেন না। শুধু তাঁর দু'নয়নে অশ্রুধারা বহে যায়।

যাঁরা নিরুপমাকে এই অবস্থায় দেখেন—তাঁরা মনে করেন এ বুঝি ভক্তির লক্ষণ। মন্দির চত্বরে একা এমনি ভাবে বসে থাকেন নিরুপমা।

রঙ্গাবতী নিরুপমার এ অবস্থা লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি অতি সন্তর্পণে তাঁর পাশে এসে বসেন। নিরুপমার কিন্তু সে বিষয়ে কোন হুঁশ নেই। তিনি যেন কিসের চিন্তায় বিভোর।

সব কিছু দেখে শুনে রঙ্গাবতীর মনে হয় নিরুপমা অপ্রকৃতস্থ। তাই তাঁর কথা বার্তা ও আচরণে এত অসঙ্গতি। সব কিছু কেমন যেন অস্বাভাবিক। কিন্তু রঙ্গাবতী নিরুপমার মনের কথাই বা বুঝবেন কি করে? বহু চেষ্টা করেছেন জানবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই তা জানতে পারেননি।

রঙ্গাবতী নিরুপমার বিশ্বাসভাজন প্রমাণ করার জন্য খুব সহৃদয়তার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। তাঁর কাছে নিরুপমার সব কিছু রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে অতিথিশালায় বহু মানুষ এসেছেন, আবার চলেও গেছেন। কিন্তু নিরুপমার যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন এবং যতক্ষণ না সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, তিনি এই আশ্রমে থাকতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

রঙ্গাবতী তাই নিরুপমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার জন্য এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করতে চলেছেন।

রঙ্গাবতীই নিরুপমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনার অতিথিশালায় থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

না। এমন একটা আশ্রয় পাওয়াতো ভাগ্যের কথা।

রঙ্গাবতী বললেন: কিন্তু এখানকার খাদ্য তো আপনার উপযোগী নয়।

এ ধারণা ভুল। আমি সাধারণ ঘরের মেয়ে। কাজেই এই আহারই আমার কাছে উপাদেয়।

কিন্তু আপনি সাধারণ ঘরের গৃহিনী নন। আপনি এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের বধূ। ঐশ্বর্য ও দাস দাসী পরিবৃত হয়ে থাকতে অভ্যস্ত। কখন কোনদিন অভাব অনটনের মধ্যে কাটাননি। কাজেই আশ্রমের এই জীবন আপনার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক।

নিরুপমা এবার বললেন: এ আপনার অনুমান। আমাকে দেখলে কি মনে হয় আমি বুঝি খুব ধনী পরিবারে পালিত হয়ে থাকি।

রঙ্গাবতী খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন: আমি যা বলেছি—তা সত্য। আপনি যদি আমার কাছে গোপন করতে চান তা হলে সে অন্য কথা। যাই হোক আপনার কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ আছে।

কি অনুরোধ ?

আচ্ছা আপনার এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?

নিরুপমা বললেন : আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

রঙ্গাবতী এমন উত্তরের আশা করেননি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন : আপনি সব কিছু ত্যাগ করে এখানে চলে আসতে পারবেন ?

আমার কিছু নেই তো ত্যাগ করব। এখানে থাকার যদি আপনি ব্যবস্থা করে দেন—তা হলে বড় কৃতার্থ বোধ করব।

রঙ্গাবতী বললেন : আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি সেই ব্যবস্থা করছি। আমার মনে হয় তাতে আপনার অনেক সুবিধা হবে। আপনি কিছুদিন আশ্রমের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হোন, তারপর যদি দেখেন এখানকার ভাবধারা, আদর্শ ও পরিবেশ আপনার মনের মত বলে মনে হয়—তা হলে থেকে যাবেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার বদান্যতার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

রঙ্গাবতী বললেন : কিন্তু একটি শর্ত আছে।

কি শর্ত ?

আপনি স্বামীজীকে বিরক্ত করবেন না।

একি স্বামীজীর আদেশ, না আশ্রমের নিয়ম ?

রঙ্গাবতী বললেন : আশ্রমিকরা এই নিয়ম মেনেই চলেন।

নিরুপমা বললেন : আমি আপনার কৃপালাভ করেছি, এখন আপনি যা বলবেন—তা আমি যথাযথ পালন করব।

রঙ্গাবতী নিরুপমাকে এবার বললেন : আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

নিরুপমা রঙ্গাবতীর কথামত তাঁকে অনুসরণ করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন আশ্রম সংলগ্ন একটি বাড়িতে। এই বাড়িতেই আশ্রমের শিষ্যারা থাকেন। রঙ্গাবতী একটি ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন : আজ থেকে এই ঘরটিতে আপনি থাকবেন। আর আপনার ঠিক পাশের ঘরটিতে থাকি আমি। কাজেই আপনার কোন অসুবিধা হবে না, সব কিছু দেখে শুনে নিরুপমা কিছুটা বিস্মিত হয়ে যান।

নিরুপমা অতিথিশালা থেকে চলে এলেন। রঙ্গাবতীর কথামত এই ঘরটিতে থাকাই মনস্থ করে ফেললেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নিরুপমার কাছে কেমন যেন

রহস্যময় বলে মনে হল। যে রঞ্জাবতী তাঁকে অতিথিশালা ছেড়ে যাবার কথা বার বার বলেছেন, সেই রঞ্জাবতী আবার তাঁকে সাদরে নিয়ে এসে তাঁরই পাশের ঘরটিতে থাকার সুব্যবস্থা করে দিলেন।

তাই নিরুপমার মনে সন্দেহ হয়। তবে কি অসিত তার পরিচয় আশ্রমের কর্মকর্তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু অসিত তো নিরুপমার কাছে তেমন কোন কথা বলল না। শুধু অভিযোগ করল—কেন তাকে না জানিয়ে চলে এসেছে। এখানে এসেও স্বস্তি পাচ্ছেন না নিরুপমা। এখানেও অসিত এসে হাজির হয়েছে। পরমানন্দ তার পূর্বপরিচিত, কাজেই অসিতের এখানে অবাধ গতিবিধি। আর পরমানন্দ যদি নিরুপমার সঠিক পরিচয় পেয়ে থাকেন, তবে কি তা রঞ্জাবতীর অজানা থাকবে?

রঞ্জাবতীর আচরণে কিন্তু কিছুটা তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর কথার মধ্যে সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধার ভাব। প্রথমে যেমন যাত্রী ভেবে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। এখন কিন্তু সে রকমটি আর নেই। কেমন যেন আন্তরিক ভাব। অবশ্য ভুলও হতে পারে নিরুপমার। কিন্তু তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে, তাঁর এতদিনকার যা কিছু প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন অবশ্য কৌশল পাল্টাতে হবে। তা না হলে বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটবে, যা নিরুপমার মোটেই অভিপ্রেত নয়।

এমনি অনেক কথাই তাঁর মনে হয়। কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক—তা না জানা পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। জীবন ভোর শুধু যন্ত্রণা ভোগ করে গেলেন। আশা করেছিলেন এবার বুঝি যন্ত্রণার উপশম হবে, কিন্তু তারও আশা খুব ক্ষীণ মনে হচ্ছে।

হঠাৎ অসিত ও পরমানন্দ এসে উপস্থিত হলেন নিরুপমার ঘরে।

নিরুপমা এতে এতটুকু বিস্মিত হন নি।

অসিত প্রথমে শুরু করল: নিরুমাসি, পরমানন্দজী এই আশ্রমের সর্বেসর্বা। অর্থাৎ সকলের ও সবকিছুর একমাত্র কর্তা।

পরমানন্দ বললেন: বাচ্চা একটু বাড়িয়েই বলছে। তবে আমি এই আশ্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছি। আমি একজন দীন সেবক।

নিরুপমা বললেন: আপনি যথার্থ বৈষ্ণব। আপনার এই পরিচয়ই আমার কাছে স্পষ্ট।

অসিত পরমানন্দকে বলল: আপনি বসুন।

অসিত ও পরমানন্দ নিরুপমার ঘরে চেয়ারে বসলেন।

অসিত এবার বলল : পরমানন্দজী আমাকে দীর্ঘদিন জানেন। আমার ছাত্র জীবন থেকে ওঁর সব কিছু জানা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—উনি ওঁর গৃহীজীবনের কিছুই আমাকে বলছেন না, যার ফলে পরমানন্দজীর সাবেক পরিচয়টা আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না, আর আমি ওঁকে ঠিক বুঝতেও পারছি না।

বাচ্চু, আমি বুঝি না তোমার সাবেক জীবন সম্পর্কে জানার এত কৌতূহল কেন? আসল পরিচয় উনি একজন ভক্ত। ভগবৎ চিন্তায় উনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। অতীত ভুলে বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন। কী লাভ অতীতের কথা ভেবে? যা অতীত তা তো গত হয়েছে।

পরমানন্দ এতক্ষণ নিরুপমার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন।

এবার তিনি বললেন : মা, আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? আমি শুধু সেই কথাটি জানতে এসেছি। বাচ্চু আমাকে বলল, আপনি ওর মাসিমা হন। কাজেই আপনার সুবিধা অসুবিধার বিষয় আমাদের দেখা উচিত।

বাচ্চু আর কি বলেছে আপনাকে?

কি বিষয়ে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন?

নিরুপমা এবার একটু হাসি মুখে এনে বললেন : আমার বিষয়ে।

আপনি রথযাত্রার দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শরীরও আপনার ভাল নেই।

পরমানন্দ খুব সহজভাবেই এই কথা বললেন।

নিরুপমার কিন্তু মনে আশঙ্কা আছে, অসিত বোধ হয় তার বিষয় নিশ্চয় এমন কিছু বলেছে—যার জন্য পরমানন্দ স্বয়ং এসে সব খোঁজ খবর নিচ্ছেন। যদি অসিত নিরুপমার বিষয়ে সব কথা বলে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে বেশিদিন এই আশ্রমে থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

অসিত নিরুপমাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে বলল : নিরুমাসি তুমি যেন খুব ভাবনায় পড়ে গেছ। সত্যি করে বল তো তুমি কি ভাবছ?

পরমানন্দ বললেন : আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি।

নিরুপমা বললেন : আপনিই বলুন, যদি আপনার কথা ঠিক হয় তাহলে আমি তা স্বীকার করতে দ্বিধা করবো না।

পরমানন্দ বললেন : আপনি স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছিলেন এবং দীক্ষা নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। এখন ভাবছেন সে বিষয়ে আমি আপনাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি?

নিরুপমা মোটেই ওই সব কথা চিন্তা করছিলেন না। তিনি শুধু জানতে চান পরমানন্দ প্রকৃত তাঁর বিষয়ে কতটুকু জানেন। এই ভয় তাঁর মনে সব সময়। তাই নিরুপমা পরমানন্দের অনুমানকে সত্য বলেই স্বীকার করলেন। আসলে নিরুপমা যা গোপন রাখতে চান—তা যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

নিরুপমা বললেন : আপনার অনুমান সত্য। বাচ্চুর সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্য আমার মনে হয়েছে ওই বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

না মা, স্বামীজী আপনাকে দেখেছেন। আপনার কথা আমরা তাঁকে সব বলেছি, কিন্তু তিনি আপনার প্রস্তাব এক রকম অগ্রাহ্যই করেছেন।

তিনি সব শুনে কি বলেছেন ?

নিরুপমার কণ্ঠে সংশয়জনিত উৎকণ্ঠা।

পরমানন্দ অতি ধীর ও শান্তভাবে বললেন : তিনি বলেছেন, আপনার এখন সময় হয়নি। তবে আপনি এই আশ্রমে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। তিনিই রঞ্জাবতীকে আদেশ করেছেন আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়। স্বামীজী আরো বলেছেন, যদি দেখা যায় আপনার মধ্যে ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখা গেছে, তখনই তিনি আপনাকে আহ্বান করবেন।

পরমানন্দ এবার বললেন : আসলে কি জানেন মা—ভক্তিই হচ্ছে সব। যার ভক্তি আছে, তার গুরুর কোন প্রয়োজন হয় না। গুরু শুধু পথের সন্ধান দেন। ভক্তি থাকলে আপনিই পথের সন্ধান পাবেন।

এই কথা শোনার পর নিরুপমা বেশ মুষড়ে পড়েন।

পরমানন্দ উঠে পড়লেন। যাবার সময় শুধু বললেন : আপনি এখানে থেকে যান, আমরা যখন আছি তখন আপনার অন্য কোন অসুবিধা হবে না।

অসিতও পরমানন্দর সঙ্গে চলে যাবার জন্য উঠেছিল। নিরুপমা তাকে বাধা দিয়ে বললেন : বাচ্চু, তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।

অসিত অগত্যা আবার বসল। পরমানন্দ আর কোন কথা না বলেই চলে গেলেন।

নিরুপমা অসিতকে বললেন : তুমি কি পরমানন্দজীকে আমার বিষয় সব বলেছ ?

না। শুধু পুরীর ঘটনার কথাই বলেছি। তা ছাড়া তোমার অন্য কোন বিষয় আমি তেমন কিছু জানি না—যা বলতে পারি।

তুমি মাসি বলছ, ওরা তো মাসির সংসারে কে কে আছে বা কি করে চলে, এসব কথা তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এটাই তো স্বাভাবিক।

অসিত এবার হেসে ফেলল। তারপর সে বলল: পরমানন্দজী আমাকে চেনেন একথা খুবই সত্যি, কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনকে চিনবেন কি করে?

বলা যায় না। তবে আমার পরিচয় তুমি দিও না।

অসিত বলল: তোমার খুব ভয়। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

নিরুপমা বললেন: বাচ্চু, তুমি আমার মানসিক অবস্থা মোটেই জানো না। আজ প্রায় চোদ্দ বছর ধরে আমি শুধু খুঁজে বেড়িয়েছি। এতদিন পরে সন্ধান পেয়েছি। তোমরা জান কি না জানি না তবে আমি কলেজে অধ্যাপনা করে আমার জীবিকা নির্বাহ করে এসেছি। শ্বশুর বাড়িতে থেকেছি। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির কোন আয় আমি নিইনি। এখন শুধু একটা বোঝাপড়া হলেই আমার মনে শান্তি।

অসিত বলল: আমি তোমার বিষয় কোন কথাই বলিনি। পরমানন্দ ও রত্নাবতী দুজনেই আমাকে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি শুধু বলেছি, তুমি কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপিকা। অবস্থাপন্ন ঘরের বৌ। স্বামী দেশান্তরি।

এত সব বলতে গেলে কেন?

অসিত বলল: ওরা যতটুকু জানতে চেয়েছে—তার বেশী আমি কোন কথাই বলিনি। তবে তুমি আমার পরিচিত, আর যাই হোক তুমি যে খুব একটা ফেলনার লোক নয়, এই কথা বুঝতে পেরেই আশ্রম কর্তৃপক্ষ তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিয়েছেন। আর সত্যি কথা বলতে কি এর বেশী আমিই বা কতটুকু জানি।

নিরুপমা বললেন: স্বামী দেশান্তরি কথাটা বলা বোধ হয় ভাল হয়নি।

অসিত জিজ্ঞাসা করল: কেন?

নিরুপমা বললেন: ওঁদের ধারণা হবে আমি স্বামী পরিত্যক্তা। আমার স্বভাব চরিত্র বোধ হয় ভাল নয়।

তা কেন হবে? ওঁদের তোমার সম্পর্কে ধারণা যা ছিল তা বদলে গেল। তুমি অধ্যাপিকা এবং আত্মসম্মানবোধ আছে জেনে তোমার প্রতি ওঁদের শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়া উচিত। এটাই স্বাভাবিক।

এই কথার পর অসিত আরো বলল : দেখ নিরুমাসি শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। দাবী করে আদায় করা যায় না। তোমার মধ্যে শান্ত সৌম্য ভাব আছে। তাই তোমাকে যে দেখে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তোমার মতন অবস্থায় পড়লে অনেক মেয়েরই চেহারা যেত পালটে। তাদের জ্বালাটা হতো বহির্মুখী, যার ফলে দেখা যেত রাগী অথচ বেদনার প্রতিমূর্তি।

নিরুপমা কি ভেবে যেন নিজের মনে হাসলেন।

অসিত জিজ্ঞাসা করল : কি হলো, হাসছো কেন?

হাসছি নিজের কথা ভেবে। অনেককাল আগে কোন এক আধুনিক কবির কবিতায় পড়েছিলাম : 'দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব রাহুময় তোমার ঠিকুজি।'

আমারও রাহুময় ঠিকুজি। যখনই একটু আশার ক্ষীণ আলো দেখি তখনই ভাবি এবার বুঝি সবকিছুর একটা সমাধান হবে। কিন্তু না, স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়। জীবনভোর শুধু সংগ্রাম আর সংগ্রাম করে গেলাম। স্বস্তি পেলাম না।

অসিত নিরুপমার কোথায় যে ক্ষোভ তা বুঝতে পারে, কিন্তু সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আর সে কীইবা করতে পারে?

তবু সে বোধ হয় নিরুপমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল : তুমি এত হতাশ হলে চলবে কেন, দেখ তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে। তবে তুমি যদি বলো, তাহলে আমি পরমানন্দজীকে বলে কোন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমার বিশ্বাস পরমানন্দজী আমার কথা ফেলতে পারবেন না।

নিরুপমা অসিতের কথায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

তিনি বললেন : কারুর অনুগ্রহ আমি চাই না। নিজের চেষ্টায় যদি হয় হবে, তা না হলে আমি অন্য ব্যবস্থা করব। তুমি এখানে আসায় আমার যা সুযোগ সুবিধা হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এর বেশী কিছু করতে গেলে আমার পক্ষে এক দণ্ডও এখানে থাকা সম্ভব হবে না।

অসিত বলল : নিরুমাসি তোমার মধ্যে যে প্রচণ্ড অভিমান বাসা বেঁধে আছে তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু অভিমান ও আবেগ মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। যাই হোক, তোমার কোন কাজে যদি আমি সামান্য কিছু করতে পারি, তা আমি করব। তবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এখন কিছু করব না, যা তোমার মঙ্গল না হয়ে অমঙ্গল হবে। এ বিশ্বাস তুমি আমার ওপর রাখতে পার। নিরুপমা এ বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা হোক—তা তিনি আর চান না। তাই চুপ করে থাকেন।

অসিত নিরুপমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল : কি হলো ? আর কিছু বলছ না কেন ?

নিরুপমা বললেন : বলার কিছু নেই।

অসিত বলল : ঠিক তা নয়। তুমি ভাবছ এতদূর এসেও তোমার সব কিছু বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আমার উপস্থিতি তোমার মোটেই কাম্য ছিল না। কিন্তু কি করব নিরুমাসি ঘটনাচক্রে তুমি আর আমি একই নৌকার যাত্রী হয়ে পড়েছি। যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হতো—তা হলে সব দিক দিয়েই ভাল হতো।

তোমার আজ খুব আফশোস হচ্ছে—তাই না বাচ্চু ?

নিরুপমা উত্তরের আশায় অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অসিত সপ্রতিভ উত্তর দিল : আমার নিজের বিষয় কিছু জানি না। ন্যায় অন্যায় বোধ থেকে যা করার তাই করি! কাজেই আফশোস করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ভাবনা এখন তোমাকে নিয়ে। তোমার যদি সমস্যার সমাধান হতো তাহলে আমি সুখী হতাম।

নিরুপমা বললেন : তুমি কতদিন এখানে থাকবে বলে ঠিক করেছ ?

আজকের দিনটা থাকব, কাল আমাকে ফিরতেই হবে।

কালই তুমি চলে যাবে! কেন ?

অসিত এবার বলল : তোমার খোঁজা শেষ, এখন আমার খোঁজা শুরু।

অসিতের এই কথায় নিরুপমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। চুপ হয়ে গেলেন। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা আর বলা হয়ে উঠল না। কথার পৃষ্ঠে কথা হয়, তাতে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ঐ যে গানটা 'ছড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥'

আজ কেন জানি না এই মুহূর্তে নিরুপমার গানটা মনে পড়ে। ওঁর মনের অবস্থাটা অনেকটা ওই রকম, কিন্তু অসিতের কাছে ওঁর দীনতা বোধ হয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মনে মনে খুব লজ্জা পান নিরুপমা।

অসিত থাকাকালেই দেবলীনা এলেন।

নিরুপমাকে দেখে বললেন : আজ সন্ধ্যায় আপনি মন্দিরে আসবেন।

সন্ধ্যারতির পর স্বামী মাধবানন্দ 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যা করবেন।

এবার দেবলীনা অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনিও আসবেন।

অসিত দেবলীনাকে মন দিয়ে দেখছিল। এত রূপ যে অসিত মুগ্ধ হয়ে যায়। দেবলীনার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি। এক কথায় দেবলীনাকে দেখে অসিত যেন বিভোর হয়ে যায়।

নিরুপমাই বললেন : আমরা যাব।

তবু দেবলীনা অসিতকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি যাচ্ছেন তো?

অসিত বলল : নিশ্চয়।

পরমানন্দজী আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের এই কথা বলার জন্য। নিরুপমা বললেন : যতদিন এখানে আছি প্রতিদিনই আমি মন্দিরে যাব। আর আজ স্বামীজী যখন 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যা করবেন তখন তাঁর ওই অমৃতবাণী শুনতে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

দেবলীনা যেমন হাসিমুখে এসেছিলেন, ঠিক তেমনি হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

অসিত বলল : বিদেশিনী রূপবতী। গৈরিক বসনে রূপমাধুরী যেন আরো বেড়ে গেছে।

নিরুপমা বললেন : ভক্তিমতি, আশ্রমের পরিবেশে ওঁর মধ্যে শ্রদ্ধাভাব হয়েছে, তাই দেখলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অসিত এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বাড়াল না। দেবলীনাকে দেখে তার ভাল লেগেছে। আর এতই ভাল লেগেছে যে তা নিয়ে নিরুপমার সঙ্গে কোন আলোচনা করা যায় না। অন্তত শোভন হবে না বলে তার মনে হয়।

অসিত বলল : সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে দেখা হবে। এখন আমি আসি।

অসিত চলে যাবার পর নিরুপমা দেবলীনার কথাই বিশেষ করে ভেবেছেন। তিনি ভেবেছেন : এই রম্ভাবতী, দেবলীনা কিসের জন্য সব কিছু ছেড়ে এখানে এসে আছেন! তবে কী বৈরাগ্য সাধনে সত্যি মুক্তি, না এও একরকম উন্মত্ত কল্পনা? চলতি ভাষায় যাকে বলে ক্ষ্যাপামি।

সাবেক জীবন থেকে সরে এসে, বিত্ত বৈভব সব কিছু ছেড়ে, এই যে খোল করতালের সঙ্গে নেচে নেচে কৃষ্ণ নাম করা—এ কি ভক্তিরসের উৎস সন্ধানে? না উন্মত্ত কল্পনার এ এক বিচিত্র ফসল!

নিরুপমা মনে মনে বললেন : আমাদের দেশের সাধুসন্তদের প্রভাবে কত যুব শক্তির না অপচয় হয়, তার কেউ হিসাব রাখে না। হয়তো ভাবে ধর্মগুরুরা

নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়ক হন। ধর্মের অনুশাসনে রাষ্ট্রিক মঙ্গল অবধারিত। এই বিশ্বাসই এসবের মূলে কাজ করছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। ধূপ ধুনা পুষ্প ও চন্দনের গন্ধে দেব-দেউল আজ মধুর গন্ধে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যারতি করছেন স্বামী মাধবানন্দ। কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি যেন সর্ব মঙ্গলের আধারস্বরূপ। সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণের করুণার উৎস প্রভাতসূর্যের মত আরক্ত নয়ন। দেহ যেন তরুণ তমাল তরু। নীলপদ্ম এবং নীলমণিবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা। চাঁচর চুলের চূড়ায় মনহরণকারী ময়ূরপুচ্ছের বিস্ময়জনক সৌন্দর্য। বক্ষে হিল্লোলিত আজানুলম্বিত বনমালা। পবনে হিল্লোলিত চঞ্চল অলকদামে আবৃত ললাটদেশ। ক্ষীণ কটিতটে পীত বসন দেহের শোভাবর্দ্ধন করছে। অধরসুধাকণার মিলিত ফুৎকারে শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে যেন মুরলী বাজাচ্ছেন। তিনি যেন এক অপরূপ রূপরাজ্যের অধীশ্বর। আর তাঁরই পাশে রয়েছেন গৌরবরণী শ্রীরাধা। তাঁর দেহকান্তি নীলবসনের অভ্যন্তর থেকে যেন উছলিয়ে পড়ছে। শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রের মত মুখ। নয়ন হচ্ছে চঞ্চল নীলপদ্মদলের মত। দেহকান্তি প্রভাতরবির মত সিন্দুর বর্ণ। কাজলে শোভিত সুচতুরা কটাক্ষ। সুন্দর ভুরু যুগলের মাঝে সিন্দুর বিন্দু। দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘ ও বিদ্যুতের অপূর্ব সহাবস্থান। স্থির হয়ে আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে। সন্ধ্যারতি হচ্ছে, সমবেত ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপর। আরতি মানে তো একান্ত অনুরাগ। আবার হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করা, যা হৃদয়যন্ত্রণার নামান্তর বলা যায়।

সন্ধ্যারতি শেষ হলে সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। এবার মন্দির চত্বরে রক্ষিত তুলসীমঞ্চকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শুরু হল নাম সংকীর্তন।

নিরুপমা লক্ষ্য করেন শিষ্য শিষ্যারা নামসংকীর্তনে যোগ দিয়েছেন। খোল ও করতালের সঙ্গে সকলের মুখে : 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে'।।

এই দলে রঞ্জাবতী, দেবলীনা, পরমানন্দ ছাড়াও বহু ভক্ত নামগান করছেন আর নৃত্য করতে করতে তুলসী-মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছেন। ভালই লাগে নিরুপমার। তবু তো এঁরা একটা কিছু নিয়ে আছেন। আশ্রম জীবনের সঙ্গে এই নামগানও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ বুঝি এক প্রকার উন্মাদনা, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন, নামগানের মাধ্যমে ভক্তিমার্গে পৌছান

সহজ হয়।

নামসংকীর্তন শেষ হল। এবার স্বামী মাধবানন্দ 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। তার সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ।

নিরুপমা লক্ষ্য করেন: স্বামী মাধবানন্দ যেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। দেবাশ্রিত এক মহাপুরুষ। বহুদিনের সাধনভজনে তাঁকে শুদ্ধচিত্ত যোগিপুরুষ বলে মনে হয়। ভক্তিরসে আপ্লুত নয়ন। উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

অসিতকে দেখা গেল দেবলীনার পাশে বসে আছে। রঞ্জাবতী একস

নিরুপমার কাছ ঘেঁষে এসে বসেছেন।

স্বামী মাধবানন্দ বললেন: অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ বাঁকা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বেঁকেছিলেন প্রেমে। ভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমে কৃষ্ণের মনের জড়ত্ব ঘুচলো, দেহের কাঠিন্য কোমল হলো, সেজন্য অনেকে বলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম। নবনীকোমল তনু। নয়নমোহন।

আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করেন: কালো কেন? দেখতে মানুষের মত এইটুকু কেন?

মাধবানন্দ বললেন: এ প্রশ্নের উত্তর ভারি সুন্দর দিয়েছেন পরমপুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন: অনেক দূরে, তাই। যতক্ষণ দূরে ততক্ষণ কালো। এইটুকু। সমুদ্রের জল দেখছ নীল। সত্যি নীলই কি? কাছে যাও, হাতে তুলে দেখ। নীল নয়। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। দূর থেকে সূর্য এতটুকু। কাছে যাও—বিরাট, অনন্ত। ভগবানও তেমনি। দেখলে জানা যায়—কালো নয় এতটুকুও নয়। জ্যোতির্ময় বিরাটপুরুষ। এ চোখে দেখা যায় না। সমাধিতে দেখা যায়। সাধন চাই। ভালবাসা চাই। প্রেমে বেঁকে যাওয়া চাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বোধাতীত ভাব। তদগত চোখ, তন্মনস্ক মন। তখনই দর্শন শ্রবণ, আনন্দ।

আসলে কি জানো জ্ঞানের অভাবে এই বহুরূপের মরীচিকা। আসলে ভে নেই। যতক্ষণ ভেদজ্ঞ ততক্ষণ 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান। ততক্ষণ নামরূপ পরিচয় এও মিথ্যা নয়। অনিত্য। এও তাঁরই খেলা। তাঁরই লীলা। ভগবা শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ। বিরাট পুরুষ। শ্রীরাধা তাঁরই শক্তি। তাঁরই আত্মপ্রকা প্রকৃতি। জলের তরল ভাব। প্রকাশানন্দের উচ্ছ্বাস। দুটো নয়, একই। অভেদ, অভিন্ন।

নিরুপমা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : ঈশ্বরকে পেতে হলে কি সংসার ত্যাগ করতে হবে ?

স্বামীজী বললেন : ত্যাগ করবে কেন ? সংসারেই থাক। আসক্তি ত্যাগ কর। কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করে থাক। সংসার তো তাঁরই গড়া। এও তাঁরই লীলা। তাঁকেই স্মরণ করে চল। সংসারে থেকে কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এ কথা পরমহংসদেবও বলে গেছেন।

সন্ন্যাসী ত্যাগী। তখন সে আর লোকালয়ে থাকে না। যারা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে বনে যায়, তারা তো ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করবেই। করবে বলেই তো গৃহত্যাগ করেছে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করেছে। যারা এদের ত্যাগ না করেও গৃহীর কর্তব্য পালন করে ত্যাগীর মতো অনাসক্ত মনে ঈশ্বর স্মরণ করতে পারে, তারাই তো বীর। তাদের প্রতিই ঈশ্বরের কৃপা সবচেয়ে বেশী। কামাসক্তির জন্য কাঞ্চনাসক্তি। টাকাকড়ির মোহে মানুষের মন ছোট হয়ে যায়। ভগবানকে ভুলে যায়। টাকাপয়সায় গাড়ি বাড়ি লোকমান্য লাভ হয়। ভগবানকে পাওয়া যায় না। ও দুটোই মায়া। মায়ার প্রভাবেই মোহ।. মোহে বুদ্ধিনাশ—তাতেই বিনাশ।

এবার স্বামী মাধবানন্দ বললেন :

যা কিছু হয়—সবই তাঁরই ইচ্ছায়। আজ যে আমি তোমাদের কাছে তাঁর কথা বলছি—এও তাঁর ইচ্ছা। আমার সাধ্য কি তাঁর কথা বলি। তিনি বলান তাই তো আমি বলি। তিনি করান তাই তো আমি করি। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। দান দয়া পরোপকার সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। যাঁর সৃষ্টি তিনিই রক্ষা করেন। আবার যখন ইচ্ছা বিশালও করেন। খাওয়া পরার জন্য সংসারীরও উপায় করা প্রয়োজন। অবর্তমানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য সঞ্চয়ও প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে তা করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন : সঞ্চয় করে না পক্ষী আর দরবেশ।

কথাটা কিন্তু খুব খাঁটি। সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। সংসারী তা নয়। সে উপায় করবে না বলছি না তো। সৎপথে সৎউদ্দেশ্যে উপায় করবে। কিছুতে আসক্ত হবে না। সব কিছুই কর্তব্যবোধে অনাসক্ত হয়ে করবে। ফলাফল ভালোমন্দ ভগবানের পায়ে সমর্পণ করবে। ভাববে, 'তিনিই যন্ত্রী আমি যন্ত্র' 'তিনি প্রভু আমি দাস,' 'তিনিই ঘর, আমি ঘরনী,'। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। যে নিষ্কাম হয়ে দান করে, দয়া করে, পরোপকার করে সে নিজেরই উপকার করে। শুধু মানুষেই নয়, জীব, জন্তু, কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে ঈশ্বর অধ্যস্ত রয়েছেন। সবার

মধ্যে তিনি রয়েছেন বলেই সেবা দয়া দান পরোপকার তাঁরই সেবা। তাঁরই কাজ। কর্তব্য পালন। অনাসক্ত হয়ে এভাবে কাজ করাকেই গীতায় বলে 'কর্মযোগ'। ভগবানকে জানার এও একটা পথ। কিন্তু শক্ত পথ। খুব শক্ত। মূলে তাঁরই ইচ্ছা, তাঁরই দয়া। তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য তাঁরই ব্যাকুলতা। তুমি কিছু করো না করো, কেউ না কেউ তা করবে। যে বাঁচবার তাকে কেউ না কেউ বাঁচাবেই। তাঁর কাজ আটকায় না। তিনিই করান, মানুষ করে। তিনিই বলান, মানুষ বলে।

দেবলীনা বললেন : স্বামীজী, দয়া করে বলুন কি উপায়ে প্রাণে ভক্তি আসে— আসে বিশ্বাস, ভালবাসা, অনুরাগ।

স্বামী মাধবানন্দ বললেন : আগেই বলেছি তো অবোধ শিশুর সারল্য চাই। প্রাণে সন্তানের দাবী চাই। শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে তেমনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ডুবে যেতে হবে। উপরে ভাসলে চলবে না। গভীরে ডুবে যেতে হবে। ডুব দিলে দেখবে জলের গভীরে রয়েছে রাশি রাশি রত্ন মণি মাণিক্য। চাও তো ডুবে যাও।

অসিত ও দেবলীনা খুব কাছাকাছি বসে স্বামীজীর কথা মন দিয়ে শোনে।

স্বামীজী বললেন : এবার 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করে শোনাব।

শুরু হলো পাঠ ও ব্যাখ্যা। অগণিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিরুপমাও ভক্তিভরে শোনেন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

নিরুপমা শুধু বুঝলেন : তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধন চাই। বিচার করে শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কাছে যেতে হবে। সবই মায়ায় আচ্ছন্ন এই মায়াকে সরিয়ে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। তখন বিচারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সব খড়া কুটো বলে মনে হবে।

সবকিছু প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন নিরুপমা।

। ৯।

স্বামী মাধবানন্দ ঈশ্বরমহিমায় আত্মস্থ। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তিনি যে-পথের পথিক সে-পথ সাধনার পথ। তাহলে ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? দেখা যায় মনশ্চক্ষের মাধ্যমে। তপস্যা করতে হয়, কায়মনোবাক্যে যদি ডাকা যায়—তবে পাওয়া যায়। এ সবই অনুভবে পাওয়া সম্ভব।

স্বামী মাধবানন্দের মধ্যে দেখা যায় পরম ভক্তি ও নিবিড় প্রেম। যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরের অনুভূতির রসাস্বাদন করেন। মহাপুরুষের বাণী ও জীবন বহু মানুষকে দিয়েছে পথনির্দেশ। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির সন্ধান। আমাদের মধ্যেই আছে কত ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। যাঁরা পরম ধার্মিক, পরম ভক্ত, তাঁরা ঈশ্বরের লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করে নিজেদের মনে করেন পুণ্যবান। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ হচ্ছেন একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রমের' তিনি অধ্যক্ষ। তিনি বিশ্বাস করেন নামগানে। জপ করে যাও, একদিন এর ফল পাবে। এ কথা স্বামীজী তাঁর ভক্তদের কাছে বার বার বলেছেন। আর অন্য কোন মন্ত্র নেই।

পরমানন্দ এক নিঃশ্বাসে সব বলে গেলেন।

অসিত চুপ করে শুধু শুনে গেল। কোন মন্তব্য করল না।

পরমানন্দ বললেন, আচ্ছা বাচ্চু, তুমি কি এসব বিশ্বাস কর না?

অবিশ্বাস করি না। বলে অসিত একটু হাসল।

পরমানন্দ এবার বললেন, আমার মনে হয় তুমি নিরীশ্বরবাদী।

অসিতের ঘরে বসে এসব কথা হচ্ছিল। পরমানন্দ এসেছেন একটু আলাপ করার জন্য। কেননা অসিত আজই কলকাতা ফিরে যাবে। পরমানন্দের ইচ্ছে—অসিত আরো কিছু দিন এখানে থাকলে বেশ ভাল হয়। তিনি এ বিষয়ে অসিতকে অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু অফিসের ছুটি নেই বলে অসিত তার অসুবিধার কথা জানায়। অনেকদিন পর পরিচিত মানুষকে কাছে পেলে তার সঙ্গে বসে স্মৃতি রোমন্থন করতে পারলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। ঠিক এই জন্যই পরমানন্দ অনুরোধ জানান, কিন্তু যখন সে থাকতে পারবে না, তখন তার সঙ্গে যতটা সময় কাটান যায়, ততটাই বেশ সুখকর বলেই মনে হয়। তাই এক কথা থেকে অপর

কথায় চলে আলাপ আলোচনা। কি উত্তর দিচ্ছনা কেন? পরমানন্দের কণ্ঠে অভিযোগের স্বর শোনা গেল।

অসিত বলল, আপনি তো আমাকে বললেন নিরীশ্বরবাদী। সহজ কথায় যাকে বলে নাস্তিক। আমি নাস্তিক বলতে পারেন, কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁদের প্রতি আমার কোন বীতরাগ নেই, আর বিদ্বেষের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যদি তুমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, তাহলেও?

পরমানন্দ খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন।

অসিত বলল, থাক এ প্রসঙ্গ। আজকে যাবার দিনে আমাদের যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—তার স্মৃতি নিয়ে আমি ফিরতে চাই।

আলাপ আলোচনায় কি তিক্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

না, ঠিক তা নয়। তবে কোন বিষয় যদি মনঃপুত না হয়, তবে তা মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। সেটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। বলে অসিত একটু জোরেই হেসে উঠল।

এখানে হাসির কোন কথা হয়নি; তবু অসিত হাসল, সমস্ত ব্যাপারটাকে বোধ হয় লঘু করার জন্য।

পরমানন্দ অসিতকে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছো কেন?

অসিত বলল, আমরা অতি সাধারণ কথাকে কত গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সেই কথা ভেবে আমার হাসি পেল।

পরমানন্দ বললেন, আশ্রমের পরিবেশে থেকে থেকে বাইরের জগতের অনেক কিছুই আজকাল আর তেমন বুঝতে পারি না।

অসিত বলল, এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য। আমি অতি সাধারণ, আর আপনি অসাধারণ। আমার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য— সবই আছে, আর আপনার মধ্যে আছে ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা। আপনার সঙ্গলাভ আমার গৌরবের বিষয়, অথচ আমার সঙ্গ আপনার অধঃপতনের কারণ হতে পারে।

বাচ্চু, এবার সত্যি তুমি থাম। আর নয়। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে?

কি কথা?

তুমি কি আজকাল রাজনীতি করো? কোন্ দলে আছ?

অসিত এবার অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্য বলল, দোহাই স্বামীজী, আপনি আর

আমাকে রাজনীতির আবর্তে ফেলে দেবেন না। একটা কথা ভাল করে জেনে রাখুন আমার মত অপদার্থকে কোন দলই নেবে না। আমি নাস্তিক হতে পারি, কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি রাজনীতিজ্ঞ। রাজনীতি বলতে বোঝায়—সাম দান দণ্ড ভেদ, যার এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই—তাকে রাজনীতিজ্ঞ বলাটা খুবই ভুল। ইংরিজি পলিটিকস শব্দটি বহু ব্যবহৃত, তাই যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

আমার যতদুর মনে পড়ে তুমি কলেজে ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলে। কলেজ ও য়ুনিভার্সিটিতে তোমাকে তাত্ত্বিক বলে সবাই সম্মান করতো। পরমানন্দ আরও বললেন, আমার ভুলও হতে পারে। সে তো অনেক দিনের কথা। তবে তুমি পুরীতে এসেছ রথযাত্রা উপলক্ষে, তাই ভাবলাম তোমার মধ্যে ধর্মের ভাবটা বুঝি আছে।

অসিত বলল, স্বামীজী আমাকে নাস্তিক জানলে কি আপনি এই আশ্রমে ঠাঁই দিতেন না?

পরমানন্দ বললেন, তুমি আমার পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, কলেজ ও বিশ্ববিত্থালয়ের সহপাঠীও বলা যায়। কাজেই তোমাকে চিনতে পেরে আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল। তাই তোমাকে আমিই এখানে এনেছি, তুমি নিজে আসনি। কাজেই এখানে নাস্তিক বা আস্তিকের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

অসিত বলল, আপনাকে এবার আমার বেশ মনে পড়েছে। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনার নাম পরমেশ্বর গাঙ্গুলি। ডাক নাম মাণিক। আপনার বড়দার নাম বীরেশ্বর আর মেজদার নাম জগদীশ্বর। আপনার এক ছোট বোন ছিল তার নাম গীতা। আমরা তাকে মহাভারত বলে খ্যাপাতাম। আর সেও ওই নামে ডাকলে বেশ খেপে উঠতো।

পরমানন্দ এবার স্বীকার করলেন, তুমি এবার ঠিকই ধরে ফেলেছ। তবে তোমার চিনতে বড় দেরী হলো।

কি করবো বলুন? পরমেশ্বর গাঙ্গুলি হয়ে গেছেন পরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

অসিত আরও বলল, মাণিকদা তোমার চেহারাও বেশ পাল্টে গেছে।

কি রকম?

অসিত বলল, চেহারার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব। তা ছাড়াও মোটা হয়েছো। চেহারার জৌলুষ হয়েছে, স্বাস্থ্য ফিরেছে।

পরমানন্দ অসিতের বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন।

ঠিক তা নয়, দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই সে জন্যই চিনতে অসুবিধা হয়েছে।

পরমানন্দ বললেন।

অসিত বলল, এইটেই আসল কথা। যাই হোক, আজই আমি চলে যাচ্ছি। যদি কখনও কলকাতায় যাও তো আমার সঙ্গে দেখা করো।

এই বলে অসিত তার পার্স থেকে একটা কার্ড বার করে দিল। এই কার্ডে তার নাম ঠিকানা। অফিসের নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে।

পরমানন্দ কার্ডটি মন দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, চাকরি তো ভালই করো বলে মনে হচ্ছে। খুবই আনন্দের বিষয়। তবে তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। তোমার তবু একটা ঠিকানা আছে, আমার কিন্তু কোন ঠিকানা নেই। এ তোমার বিনয়, মাণিকদা। এই আশ্রমই তো তোমার ঠিকানা। তুমি একটা প্রতিষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করে আছ, আমিও আর একটা প্রতিষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। তফাৎ শুধু তুমি পরকালের কথা ভাব, সেই আশায় দিন কাটাও, আর আমি পরকাল জানি না, ইহকাল নিয়েই ব্যস্ত।

পরমানন্দ বললেন, আজ যাবার দিনে কোন তর্ক নয়, তত্ত্বকথাও নয়।

অসিত বলল, নিরুমাসি আরো কিছু দিন হয়তো বা থাকবেন, যদি পারো তো ওঁকে একটু দেখাশোনা করো।

এরপর অসিত নিরুপমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে দাঁড়াল।

পরমানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় যাবে ?

একবার নিরুমাসির সঙ্গে দেখা করে যাবো বলে ভাবছি।

কিন্তু ওখানে তো তোমাকে এখন দেখা করতে দেবে না। ও জায়গাটা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। বলে পরমানন্দ উঠে দাঁড়ালেন।

অসিত বলল, তা হলে থাকগে। আশ্রমের যা নিয়ম তা মেনে চলা উচিত। মাণিকদা, তোমার সঙ্গে যদি নিরুমাসির দেখা হয় তাহলে তুমিই বলে দিও আমি চলে গেছি।

পরমানন্দ বললেন, আমি সে কথা জানিয়ে দেব। তবে যদি একান্তই দেখা করতে ইচ্ছা করো, তাহলে সে ব্যবস্থা কিন্তু করতে পারি।

অসিত বলল, না মাণিকদা তুমি আমার জন্য অনেক করেছ, নিয়ম ভেঙে কোন কিছু করার দরকার নেই। তবে নিরুমাসি রইল, যদি পারো তো তাকে সাহায্য করো।

পরমানন্দ অসিতকে আশ্বস্ত করে বললেন, তুমি এ নিয়ে কিছু ভেবো না। আমি যতক্ষণ আছি তোমার নিরুমাসির কোন অসুবিধা হবে না।

পরমানন্দ এরপর তাঁর বাসস্থান অভিমুখে রওনা হলেন।

নিরুপমার মনে স্বস্তি নেই। তিনি একবার মনে করেছিলেন অসিতের সঙ্গে কলকাতা ফিরে যাবেন। আবার তাঁর মনে হয়েছে এতদূর এসে একটা হেস্তনেস্ত যা হোক করে যাবেন। আসলে তিনি কোন কিছু মনস্থ করতে পারেন না। আশ্রমের পরিবেশ কখন তাঁর খুব ভালই লাগে, আবার কখন সব কিছু দেখে, তাঁর মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

স্বামী মাধবানন্দের সব চেয়ে কাছের মানুষ রঞ্জাবতী ও পরমানন্দ।

এটা নিরুপমা বেশ ভালই বুঝতে পেরেছেন। কাজেই যা কিছু করার তা শুধু এদের মারফৎ করতে পারলে অনেক সহজ হতে পারে

কিন্তু কি হবে স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে দেখা করে? তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। সংসারে কত জ্বালা যন্ত্রণা। কত সমস্যা। সংসারে শুধু মায়া আর বন্ধন। আর আশ্রমে সবই মুক্ত। সংসারে কামিনী কাঞ্চন অধঃপতনের কারণ হয়, আর আশ্রমে সে সবের কোন বালাই থাকে না। মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়। এইসব ভেবে নিরুপমা নিজের মনেই নিজে হেসে ওঠেন।

স্বামী মাধবানন্দ সংসার ত্যাগ করে আশ্রমে এসে বাস করছেন। এও তো আর এক রকমের সংসার বলা যায়। শুধু জীবন যাত্রার প্রণালীটা যা একটু ভিন্ন। মানুষ আত্মসুখের জন্য তার নিজস্ব জীবনধারা বেছে নেয়। কাজেই স্বামী মাধবানন্দ আশ্রমে এসেও যোগীবর হয়ে উঠতে পারেন নি। কেননা তিনিও এমনি একটা জীবন বেছে নিয়েছেন, যে জীবন আপাতদৃষ্টে এক তাপসের জীবন, সাধকের জীবন, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বেশ বোঝা যায় মাধবানন্দ আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন, যে আনন্দের স্বাদ ভিন্ন, অথচ কোন কোন মানুষের তা কাম্য।

নিরুপমা ভাবেন, মাধবানন্দ সব কিছু ত্যাগ করে এসেছেন মোক্ষলাভের জন্য। কিন্তু যে জীবন তিনি যাপন করছেন, তা ত্যাগীর জীবন না ভোগীর জীবন তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু ভক্তরা মনে করেন, তাঁর ঈশ্বর ভাবনায় সমর্পিত প্রাণ। ভক্তদের নিয়ে সেই চরম লক্ষ্যে পৌছনর জন্যই এবং বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন। স্বামীজী যা কিছু করেন—তা ভোগবিলাস বলা অন্যায় হবে। আশ্রমের প্রধান তিনি। তাঁর দায়-দায়িত্ব অনেক। ভক্তদের সঠিক পথে চালিত করা, তাদের সিদ্ধি ও সাধনা—এই দুয়ের বিষয় তাঁর চিন্তা ভাবনার কোন শেষ নেই। এ সবের কিছু দায়িত্ব অবশ্য রঞ্জাবতী ও পরমানন্দ ভাগ করে নিয়েছেন, কিন্তু তবু স্বামী

মাধবানন্দের যেন স্বস্তি নেই, শাস্তি নেই।

নিরুপমা আপন মনে এমনি অনেক কিছু ভাবেন, আর যত ভাবেন ততই বিস্মিত হন। এই ভেবে যে মাধবানন্দের সংসার জীবন তো এর চেয়ে অনেক সহজ ও সরল ছিল, তবু কেন তিনি এই পথ বেছে নিলেন? তাহলে কি এই পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ বেশী?

এমনি অনেক কথাই নিরুপমা ভাবেন। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দের ভাবনার সঙ্গে নিরুপমার ভাবনার প্রভেদ অনেক। এই বিভিন্নতা সম্পর্কে নিরুপমাও যথেষ্ট সচেতন। তবু বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে নিরুপমার মনে হয়: এ একপ্রকার পলায়নী প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমন সময় রঙ্গাবতী এসে উপস্থিত হলেন নিরুপমার ঘরে। তখন দিনের শেষ প্রহর বলা যায়।

রঙ্গাবতী নিরুপমাকে দেখে সহাস্য বদনে বললেন: হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।

নিরুপমাও প্রত্যুত্তরে বললেন: হরে কৃষ্ণ।

তারপর নিরুপমাই আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন নতুন খবর আঁছে নাকি?

রঙ্গাবতী বললেন: অসিত বাবু চলে গেছেন। যাবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি, তাই সেই খবরটা আপনাকে জানাতে এসেছি।

নিরুপমা একটু আক্ষেপ করেই বললেন: বাচ্চু দেখা করে যাবার সময় পেল না? বোধ হয় ও ভেবেছে আমি বুঝি ওর সঙ্গ নেব। জানেন, এখন আমি অনেকের কাছেই বোঝা স্বরূপ।

আপনি এমন কথা বলছেন কেন? আর কে কী ভাবে তা জানি না, তবে এই আশ্রমের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি—আপনি আমাদের মাননীয়া অতিথি। স্বামীজীর নির্দেশ: আপনি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারেন। আপনার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, তার প্রতি আমাদের সদা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে তিনিই বলে দিয়েছেন।

কিন্তু আমার প্রতি স্বামীজীর দয়া দাক্ষিণ্যের কারণ কি জানতে পারি?

তা তো আমি জানি না। তবে তিনি যা আদেশ করেন, আমরা তা পালন করে থাকি।

নিরুপমা এবার বললেন: আপনাদের স্বামীজী নিঃসন্দেহে একজন মহাপুরুষ। কিন্তু কি কারণে জানি না, আমি তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিতা। একটা অনুরোধ করবো

আপনাকে—যদি তা রাখেন তবে খুশি হবো, আর যদি না রাখেন তাতে কোন দুঃখ পাব না।

রঙ্গাবতী বললেন : আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে।

আমার কি অনুরোধ তা না জেনেই আপনি আপনার অক্ষমতার কথা জানালেন। বড় বিস্ময় লাগে ভাবতে।

রঙ্গাবতী এবার খুব ধীর ও শান্তভাবে বললেন : আমি আমার অক্ষমতার কথা শুধু জানালাম। তার কারণ কি জানেন? তার কারণ আমি 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রমের' দাসী মাত্র।

বুঝেছি।

বলে নিরুপমা একটু মুচকি হাসলেন। সে হাসি যে উপহাসের হাসি তা রঙ্গাবতীরও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তবু রঙ্গাবতী বললেন : আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি সেবিকা। বাহিরের লোকে আমাকে সাধিকা বলেই মনে করে। তবে আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি হলে বলবেন, আমি সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

নিরুপমা এবার বললেন : আপনি বসুন।

রঙ্গাবতী এতক্ষণ দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। নিরুপমার কথামত সামনের চেয়ারে বসলেন।

নিরুপমা রঙ্গাবতীকে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললেন : আপনি বুদ্ধিমতী, আমি আশা করেছিলাম। আপনি আমার কাছে আরো সহজ ও সরল হবেন, কিন্তু তা না হয়ে আপনি নিজেই আমার অনুমানকে আরো সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। তার মানে আমার অনুমান যে যথার্থ তা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

আপনার এসব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনি যা অনুমান করেছেন—তা একদিন মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। আপনি আমাদের সম্মানিতা অতিথি। এমন কিছু বলা বা করা আমাদের উচিত হবে না—যা আপনাকে আঘাত করতে পারে।

যদি বলি আপনাদের আচরণে আমি মর্মাহত হয়েছি।

রঙ্গাবতী বললেন : অজ্ঞাতে যদি কিছু আমরা করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা করবেন।

নিরুপমা এবার নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন : আপনি কিছু মনে করবেন না, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আসলে শোক তাপে মাঝে মাঝে

আমার মাথা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। আপনি বরং আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

রঞ্জাবতী নিরুপমার এই কথা বিশ্বাস করেন। তিনি বললেন: মা, আপনাকে একটা কথা বলবো?

বলুন—।

দেখুন, আমার মনে হয় কোন কারণে আপনার মনে খুব অশান্তি আছে। তাই মাঝে মাঝে আপনার মন খুব উচাটন হয়ে ওঠে। নিজেকে তখন আর আপনি সংযত করতে পারেন না। একটা অস্থিরতা আপনার মনের মধ্যে দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়। মনকে নিয়ন্ত্রিত করার সব শক্তি আপনি হারিয়ে ফেলেন। মনে হয় আপনি যেন কিসের অন্বেষণে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যা চান তা পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় আপনি যদি ভগবৎ চিন্তায় মন দেন—তাহলে নিশ্চয় মনে শান্তি পাবেন। এই যে দেখছেন আমরা সবাই এই আশ্রমে এসে জড়ো হয়েছি—আমাদের সকলেরই কোন না কোন কারণ আছে। হয় কোন অতৃপ্ত বাসনা আছে, না হয় কোন অতীতের বেদনা আছে, এই সব থেকে নিবৃত্তির জন্যই তো সবাই এই পথে এসেছে। অনেকে বলেন, এই হচ্ছে মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পথ। আমি বলি, না। একটা কিছুতে মন নিবিষ্ট করলে তাতে মনে শান্তি আসে। অনেকে এই শান্তিকে বলেন, মানুষ জ্ঞানাতীত অবস্থায় পৌছে যায়, সাধন মার্গের ভাষায় যাকে বলা যায়—তুরীয় ভাবে পৌছনো।

রঞ্জাবতী একটানা এইসব কথা বলে গেলেন। নিরুপমা এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি রঞ্জাবতীর কথায় অভিভূত হয়ে গেছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন নিরুপমা।

রঞ্জাবতী নিরুপমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বললেন: কি ভাবছেন আপনি?

নিরুপমা বললেন: আপনার কথা।

আমার কথা! আমার কি কথা?

রঞ্জাবতীর কণ্ঠে বিস্ময়ের ভাব।

নিরুপমা বললেন: আপনার প্রজ্ঞা দেখে। এমন জ্ঞানের পরিপূর্ণতা দেখে শুধু ভাবছিলাম, উত্তরণের পথ আপনি ঠিক খুঁজে পেয়েছেন।

রঞ্জাবতী বললেন: সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে আমি প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছি। আমার কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

সাধারণ মানুষ যা থাকলে নিজেকে সুখী মনে করে—আমার সে সবই ছিল। অর্থ, গাড়ি, বাড়ি। কিন্তু সে সব থাকলেই তো সুখী হওয়া যায় না। ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে আমি সুখী হতে চেয়েছিলাম। একজনকে আমি খুবই ভালবেসে ফেলি। সেও আমাকে ভালবাসতো। (অন্তত সেই রকমই সে আমাকে বুঝিয়েছিল এবং আমার ধারণাও তাই ছিল।) কিন্তু হঠাৎ সে যুদ্ধে চলে যায়। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল সে সরকারী আদেশে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গেছে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে।

রঞ্জাবতী গল্প ফেঁদেছেন বলে মনে হয় নিরুপমার। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কোন যুদ্ধে গিয়েছিল?

ভিয়েতনামের যুদ্ধে। যে যুদ্ধের সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্বের কোন সম্পর্ক নেই। যে যুদ্ধ অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই যুদ্ধে সে চলে গেল। আমাকে কোন কিছু না জানিয়েই সে চলে গিয়েছিল। আমি যখন জানতে পারলাম তখন বুঝলাম সে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রথমে তার ওপর, তারপর নিজের ওপর আমার খুব ঘৃণা হলো। আমি আমার সব কিছু ছেড়ে চলে এলাম এখানে। এখন আমি খুব শান্তিতে আছি। কিন্তু হ্যাঁ, আমি পুরুষ জাতটাকে ঘৃণা করি।

নিরুপমা বললেন: স্বামী মাধবানন্দ তো পুরুষ।

রঞ্জাবতী বললেন: শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, বাকি সব প্রকৃতি।

তাহলেও শ্রীকৃষ্ণ তো পুরুষ।

না। তিনি পুরুষাকার।

রঞ্জাবতী বললেন: সাধারণ অর্থে পুরুষ বলতে যা বোঝায় আমি তাই বলতে চেষ্টা করছি। কেননা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মেয়েরাই পুরুষদের শিকার হয়েছে। তবে ভালবাসার আঘাত সহজে ভোলা যায় না। এটা বয়সের ধর্ম বলা যেতে পারে, আবার হৃদয়ঘটিত বলেই বোধ হয় মনের উপর গভীরভাবে দাগ কাটে। আঘাতটা স্থায়ী হয়ে ক্ষত হয়ে যায়। স্থায়ী ক্ষত তো ক্যানসার। বুকের মধ্যে সময় অসময়ে কুরে কুরে খায়। তার খুবই যন্ত্রণা। কিন্তু এখন আমি বেশ ভাল আছি।

নিরুপমা বললেন: আপনি কি ইসকনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

রঞ্জাবতী বললেন: সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমেরিকার পশ্চিম

ভার্জিনিয়ায় তখন প্রথম প্রভুপাদ গিয়ে 'নববৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠা করেন-তখন। ওই সময় আমার মনটা খুবই খারাপ ছিল। ১৯৬৮ সালে ইসকনের প্রবক্তা এ সি ভক্তি-বেদান্ত প্রভুপাদ এর গোড়া পত্তন করেছিলেন। 'নববৃন্দাবন'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি বলে কথিত বৃন্দাবন ধাম থেকে আট হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে উঠেছিল, এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘের কেন্দ্র 'নব বৃন্দাবন'। এই মন্দিরটি গড়ে উঠতে লেগেছিল দীর্ঘ সাত বছর, আর খরচ পড়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ এখানকার টাকায় তা হবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এ সি ভক্তিবেদান্তকে আমি দেখি ১৯৬৭ সালে সানফ্রানসিসকোতে রথযাত্রা উপলক্ষে।

আসলে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে এ সি ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে ম্যাসাচুসেটস, আটলানটা, ক্যালিফোর্নিয়া, স্যানফ্রানসিসকো থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণ ভাবনা। বেশ কিছু ধনকুবেরও মেতে উঠলেন এই কৃষ্ণ নামে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে কেনা হলো ৩৭৬৪ ওয়াটসেকা এভিন্যুর এই প্রাসাদ। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে কৃষ্ণ নামের বন্যা আর ইসকনের অপ্রতিহত জয়যাত্রা।

নিরুপমা রঙ্গাবতীকে বাধা দিয়ে বললেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাণী প্রচারে নারীর ভূমিকা কি? আমি যতদূর জানি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নারী-সঙ্গে কীর্তন, নারী কর্তৃক ভোগ প্রস্তুত ও নিবেদন, সন্ন্যাস নেবার পর নারী সম্ভাষণ—সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রঙ্গাবতী বললেন, প্রভুপাদ বলতেন,—'পুরুষ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই পূজা, আরাধনা—সবই বিধিহীন। ইসকনের সবকিছুই তাই মন্ত্রহীন, বিধিহীন, দক্ষিণাহীন।

তা ছাড়া, আর একটা ব্যাপার আছে। যে সময় আমার ইসকনের সব কিছু ভাল লেগেছিল, সে সময়টা আমি কেন আমার মতন বহু ছেলে মেয়ে শূন্যতাবোধ ও মূল্যবোধহীন সামাজিক পরিবেশের শিকার হয়ে গিয়েছিলাম। তাই খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, বাঁশি—আর সেই সঙ্গে ওই যে উদ্দাম নাম সংকীর্তন, বড় ভাল লেগে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল: সত্যি 'সামথিং নিউ, সামথিং একসাইটিং।' আমি নিজে তো ভারতীয় দর্শন থেকে তন্ত্র সাধনা, ধর্ম সংক্রান্ত নানা বই পড়েছি। কিন্তু এ সি'র এই সব দেখে সত্যি আমি যেন নতুনের সন্ধান পেলাম। আমেরিকার

পথে পথে তখন গৈরিক বসন পরা এ সি মুণ্ডিত মস্তক, রসকলি চিত্রিত হয়ে শুধু গান গেয়ে যাচ্ছেন : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ।।'

আমরাও তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাহিতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম। আমাদের তখন বিপুল বৈভব ও আমরা বিলাসের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। অবসাদ-গ্রস্ত মন।

এই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হিপি বা রকার, বাংক বা জোনার। সবাই বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে। হাসিস, গাঁজা, এল এস ডি খেয়ে অনেকে পথে ঘাটে, পার্কে শুয়ে বসে অলস জীবন যাপন করছে। আমি এদেরই মতন হয়তো হয়ে যেতাম, কিন্তু প্রভুপাদকে দেখে আমি যেন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখলাম। ওদের দলে মিশে গেলাম। কখনো সংকীর্তন, কখনো শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা পাঠ, কখনো বা কৃষ্ণ ভাবনার ক্লাস। আমরা আলোচনা চক্রে যোগ দিতাম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমতত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ ইত্যাদি সত্যি খুব ভাল লাগল।

একদিন আমিও আমার সব কিছু ছেড়ে ইসকনের বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের সঙ্গে চলে এলাম কলকাতায়। এ্যালবার্ট রোডে ইসকনের কেন্দ্রে এসে যোগ দিলাম। তখন মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির হয়নি।

তারপর পরমানন্দ গোস্বামী ও গৌরতনু ব্রহ্মচারীর সঙ্গে চলে আসি 'শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রমে'। ইসকনের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, তবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমরা সবাই নিবেদিত প্রাণ।

এতক্ষণ নিরুপমা রঞ্জাবতীর কথা শুনছিলেন, হঠাৎ মন্দিরে কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি শুনে নিরুপমা বললেন : বোধ হয় আরতি শুরু হয়েছে।

রঞ্জাবতী বললেন : হ্যাঁ। কথা বলতে বলতে বড় দেরী হয়ে গেল। চলুন মন্দিরে যাই।

আর কোন কথা না বলে, নিরুপমা ও রঞ্জাবতী—মন্দিরের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

। ১০ ।

বেশ কয়েকদিন হলো নিরুপমা আশ্রমে আছেন। আশ্রমের পরিবেশ তাঁর ভালই লাগে। এখানে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সকলের মধ্যে নিষ্ঠা ও ভক্তি দুই-ই সমানভাবেই আছে। তবু নিরুপমার দৃঢ় ধারণা তাঁর যে জন্য এখানে আসা, তা কিছুতেই সফল হবে না। এমনি একটা ধারণা ক্রমশই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে।

আসলে নিরুপমা কিছুতেই তাঁর মনস্থির করতে পারেন না। তাঁর মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সমানভাবে উপদ্রব করে চলেছে। মাঝে মাঝে বড় অসহায় বোধ করেন নিরুপমা। কি লাভ এইভাবে এখানে পড়ে থেকে? তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার কাজের মধ্যে থাকাই সবচেয়ে ভাল। তাতে অন্তত নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এমনি অনেক কথাই নিরুপমার মনে হয়।

আজ আর মন্দিরে যেতে মন চায় না নিরুপমার। স্বামী মাধবানন্দকে দূর থেকে দেখলে তাঁর মনটা আরো বেশি গুমরে ওঠে। স্বামীজীর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলার তাঁর প্রবল বাসনা। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যারা তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁর চলাফেরা গতিবিধির ওপর সদা-সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন ভক্তরা। কাজেই নিরুপমা খুব অসহায় বোধ করেন।

হঠাৎ কৃষ্ণদাসের শ্লোকটি নিরুপমার মনে পড়ে।

"তরু যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়,
শুখাইয়া মইলে তবু পানি না মাগয়।।'

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে উপদেশ দিয়েছেন:

'ঘাসের চেয়েও নীচু হতে হবে, গাছের চেয়েও সহিষ্ণু হতে হবে। মান পাবার কোন প্রত্যাশা না করে মান্যব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে হরির নাম কীর্তন করতে হবে।'

বৈষ্ণব হলেই হবে না, তার জন্য কঠিন সাধনা চাই। মহাপ্রভু আধ্যাত্মিকতার ভগবৎশরণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে বলে গেছেন।

আসলে বিনয় ও সহিষ্ণুতা না থাকলে প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব সমাজে বহুকাল যাবৎ একটি ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি হচ্ছে :

'বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শোলোকেতে পড়ে গেল বাধ ॥'

কাজেই বৈষ্ণব সাজা যত সহজ, প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া তত সহজ নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। তাঁর চরিত্রে দেখা যায় শ্রদ্ধা-সহকারে নাম গ্রহণ করলে ভক্তির সঞ্চার হয়। তাঁর আচরণে দেখি বিরহবেদনা মর্মান্তিক রূপ ধারণ করেছে। দিব্যোন্মাদ অবস্থা।

তিনি বলেছেন : গোবিন্দের বিরহে আমার কাছে মুহূর্ত হয় যুগের মতন সুদীর্ঘ। চোখে নেমে আসে বর্ষা। সমস্ত সংসার তখন মনে হয় অসার। বিরহই প্রেমকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে। বিরহে ভগবৎ প্রেম কমে যায় না। বরং আরো তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ বা অষ্টম শ্লোকে মহাপ্রভু বলেছেন :

'আমি তো পায়ে পড়েই আছি, আমাকে থেঁৎলে ফেলুন। আমাকে দেখা না দিয়ে নিদারুণ দুঃখ দিন। সে লম্পট যা ইচ্ছে তা করুক না কেন, তবু তিনি আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া আর কেউ নন।'

মহাপ্রভু বলতেন : 'জন্মে জন্মে যেন আমার ঈশ্বরে ভক্তি হয়। আর চিত্তে ভক্তির সঞ্চার হলে তখন ঈশ্বরের আনন্দচিন্ময় মূর্তি মনে উঁকি দেয়। কিন্তু নাম গ্রহণে চাই সংযত নিষ্ঠা।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন :

'ওগো নন্দনন্দন, তোমার দাস আমি বিষম সংসার সাগরে ডুবতে বসেছি। কৃপা করে আমাকে তোমার পায়ের ধুলো রূপে স্বীকার কর।'

চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন নিরুপমা। তাই বৈষ্ণবদের কথা উঠলে প্রথমে মনে পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম। তিনি তাঁর অধ্যাত্মভাবনা বা ধর্মাচরণের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন, তারই মধ্যে পাওয়া যায় বৈষ্ণব ধর্মের সার কথা।

এখানে দেশী বিদেশী শিষ্য শিষ্যারা ভিড় করে আছেন। এঁদের ভক্তি বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই নিরুপমার। কিন্তু রঘুনাথের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন :

'ভালো না খাইবে রঘু ভালো না পরিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥
হানি লাভসম, শোকাদির বশ না হইবে।

অন্যদের অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে ।।
'অমানী-মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে।'

তা হচ্ছে এই। কিন্তু আশ্রমের পরিবেশ দেখে নিরুপমার মনে হয় এখানে বিলাস ব্যসন না থাকলেও কৃচ্ছ্রতার কোন চিহ্ন নেই। বেশ স্বচ্ছন্দ বিহার সহজেই নজর কেড়ে নেয়।

এই সব চিন্তা থেকে নিরুপমার মনের হদিস কিছুটা মেলে। যা তিনি দেখছেন, শুনছেন—তা তাঁর মোটেই মনঃপুত নয়। সিল্কের গৈরিক বসন, মুণ্ডিত মস্তকে শিখা, মুখমণ্ডলে রসকলি চিত্রিত দেখে কৃত্রিমতার কথাই মনে হয়। এ সব কি বৈরাগ্যের চিহ্ন? শিষ্যারা কেউ বা গৈরিক, আবার কেউ বা গরদের শাড়ি পরিহিতা। নাসিকা বা ললাটে যথারীতি অঙ্কিত পুষ্পকলির ন্যায় চন্দনের তিলক।

এসবই কি আন্তরিক না বাহ্যিক?

নিরুপমার মনে সংশয় দেখা দেয়। গুরুবাদের প্রতি নিরুপমার মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই; কিন্তু সব দেখে শুনে তাঁর নিজের মনে কেমন যেন বিতৃষ্ণা জন্মায়।

গভীর রাত্রে রঞ্জাবতী প্রায়ই তাঁর ঘর ছেড়ে কোথায় যেন যান। আবার ভোর রাত্রে ফিরে আসেন। এ বিষয়ে নিরুপমার খুব সজাগ দৃষ্টি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সঠিক কিছু অনুমান করতে পারেন না। রঞ্জাবতী কোথায় যান? কি করেন? এ বিষয়ে নিরুপমার জানবার খুবই কৌতুহল, কিন্তু এই আশ্রমে নিরুপমার এমন কেউ নেই যাঁকে তিনি এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন। অথচ এ কথা খুবই সত্য যে রঞ্জাবতী যেভাবে রাত্রে তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যান—তা দেখলে মনে হবে তিনি অভিসারিণী।

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন রঞ্জাবতী। কাজেই নিরুপমার মনে যদি সন্দেহ হয় তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

সারাদিন তো আশ্রমের কাজ করেন রঞ্জাবতী। রাত্রেও কি একটু বিশ্রাম করার প্রয়োজন বোধ করেন না তিনি? অতিরিক্ত আকর্ষণ না থাকলে মানুষ কখনই দিনরাত্রি পরিশ্রম করে না। রঞ্জাবতী যেন আশ্রমের জন্য নিবেদিত প্রাণ। হাসি পায় নিরুপমার। তিনি সত্যি মনে মনে হাসেন। কিন্তু তাঁর এখানে বলার কোন অধিকার নেই। তিনি অতিথি, আশ্রমের অতিথি। আশ্রম কর্তৃপক্ষের দয়ায় তিনি এখানে আছেন।

কাল যদি আশ্রম কর্তৃপক্ষ নিরুপমাকে চলে যেতে বলেন, তবে নিরুপমাকে

আশ্রম ছেড়ে চলে যেতেই হবে। কাজেই আশ্রমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁর কোন কথা বলা বা কোন বিষয় মন্তব্য করা মোটেই সমীচীন নয়। তাই নিরুপমা এখানে শুধু দর্শক। নির্বাক দর্শক। কিন্তু শ্রোতা হিসেবেও নিরুপমা খুব ভাল। কেননা কিছুদিন আগে নিরুপমা মন্দির চত্বরে বসেছিলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সামনে। বহু শিষ্য-শিষ্যারা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় কোন এক পত্রিকার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক এসে হাজির হয়েছেন 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের দয়াল আশ্রম' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। সাংবাদিকটি নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন গৌরতনু দাসকে। গৌরতনু হচ্ছেন এই আশ্রমের জনসংযোগ অধিকর্তা। যদিও আশ্রমে ওই জাতীয় কোন পদ নেই, তবে তাঁর কাজকর্ম অনেকটা ওই ধরনের। আশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে তিনিই এক-মাত্র ব্যক্তি যিনি সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

সাংবাদিকটি প্রশ্ন করেছিলেন : এই আশ্রমের জন্য ভারতের বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসে নাকি ?

তার উত্তরে গৌরতনু বলেছিলেন : না। তবে আশ্রমের বিদেশী শিষ্য-শিষ্যারা তাঁদের নিজস্ব টাকা অনেক সময় দেশ থেকে নিয়ে এসে আশ্রমের কায়কল্পে সাহায্য করে থাকেন।

সাংবাদিক আর একটি গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : আপনাদের এই বিদেশী ভক্তরা সি, আই, এ'র অনুচর বলে বাইরের লোকের ধারণা ; তার মানে লোকমুখে এ রকম গুঞ্জন শোনা যায়। এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?

গৌরতনু প্রতিবাদ করে বলেছিলেন : এ সর্বৈব মিথ্যা। সি, আই, এ'র কোন অনুচর আমাদের আশ্রমে নেই।

সাংবাদিক তখন বললেন : হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সবাই আসছেন আমাদের দেশে শুধু বৈষ্ণব হতে। কৃষ্ণনামে সবাই মাতোয়ারা। ইসকন্ সম্পর্কে এমনি কানাঘুষো শোনা গেছে।

গৌরতনু বললেন : ইস্কনের সঙ্গে যদিও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, তবে লোকসভায় এই ধরনের অভিযোগ কিছুকাল আগে উঠেছিল। কিন্তু তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন : সরকারের কাছে এ ধরনের কোন খবর নেই। তবে একটা কথা কি জানেন—এক শ্রেণীর মানুষ কুৎসা রটিয়ে আনন্দ পায়। যারা বিদেশী ভক্তদের দেখলে সি, আই, এ'র চর বলে মনে করে, তারা ওই

শ্রেণীর মানুষ। সাংবাদিকটি এরপর বলেছিলেন: এই যে কৃষ্ণনামের জোয়ার বইছে—এর মূলে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য আছে। সারা পৃথিবীর মানুষ, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের মানুষ যখন কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে—তখনই নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সারা বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কৃষ্ণনামের জোয়ার বহিয়ে দিয়েছে। তার জন্য ওই সব ধনতান্ত্রিক দেশগুলি মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছে। অবশ্য এ ধরনের অভিযোগ সাধারণ মানুষের। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

গৌরতনু তার উত্তরে বলেছিলেন: কে কি বলেন বা বলছেন—তা আমি জানি না। তবে আমি বলতে পারি ভারতবর্ষ বহু ধর্ম ও ভাষাভাষীর দেশ। এখানে যেমন ধর্মগুরু আছেন, তেমনি আছেন রাজনীতিকরা। আমরা যে যার আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করি। কাজেই আমি কম্যুনিজমবিরোধী হলে কম্যুনিজমের প্রসার ও প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে, তা কখনই সম্ভব নয়। তেমনি আমি সনাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী। আপনি আমার বিরোধিতা করে আমাকে কিছুতেই ওই ধর্মবিশ্বাস থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন না। গৌরতনু আরো বলেছিলেন: অনেকে অবশ্য এ ধরনের কথা বলে থাকেন। কৃষ্ণচৈতন্য বা কৃষ্ণভাবনা আন্দোলন সাম্যবাদ বিরোধী এক ধরনের আন্দোলন। যুবশক্তিকে বিনষ্ট করার এ এক অভিনব পন্থা। আমি অবশ্য নিজে তা বিশ্বাস করি না। অন্তত আমাদের আশ্রমে ওই সবের কোন বালাই নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা যথার্থ বৈষ্ণব, ভগবৎ পাদপদ্মে নিবেদিত প্রাণ। সাংবাদিকটি যাবার সময় গৌরতনু দাসের একটি ফটো তুলে নিলেন। ক্যামেরায় ক্লিক্ করতেই এক ঝলক আলোয় গৌরতনুর মুখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিরুপমা এ সবই শুনেছিলেন। কাজেই তাঁর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়।

ঈশ্বরে ভক্তি থাকা ভাল, কিন্তু ঈশ্বর নিয়ে ব্যবসা করা মোটেই ভাল নয়।

গভীর রাত্রে নিরুপমা নিঃশব্দে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রঞ্জাবতী এখন তাঁর ঘরেই আছেন। বোধ হয় তিনি আজ আর বার হবেন না। শরীরটা তাঁর ভাল যাচ্ছে না এমন কথা নিরুপমা শুনেছিলেন। সে কারণে সকলের অগোচরে নিরুপমা এ রকম দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। তিনি সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন স্বামী মাধবানন্দের শয়নকক্ষে। কপাট ভেজানো ছিল। নিরুপমা হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল।

স্বামীজী জেগেই ছিলেন। অন্ধকারে নিরুপমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন: এত দেরী করলে কেন?

নিরুপমা স্থির অচঞ্চল এক ছায়ামূর্তির মত মাধবানন্দের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি ভাবে কথাটা শুরু করবেন তাই তিনি ভাবছিলেন।

মাধবানন্দ বিছানা থেকে উঠে পড়ে ঘরের আলো জেলে দিলেন। আলো জ্বালতেই তিনি দেখলেন তাঁর ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন নিরুপমা।

মনে মনে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন মাধবানন্দ, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন: হঠাৎ এত রাত্রে আমার কাছে আসাটা তোমার উচিত হয়নি। দিনের আলোয় এলে—সেটা খুব শোভন হতো।

অভীক, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু জানতে এসেছি কোন্ অপরাধে তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?

এতক্ষণে মাধবানন্দ নিজেকে একটু সামলে নিয়েছেন। তিনি নিরুপমাকে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন: তুমি ওইখানে বোস, তারপর আমি তোমার সব কথার উত্তর দেব।

নিরুপমা চেয়ারে বসলেন। স্বামী মাধবানন্দ আর একটি চেয়ারে বসে নিরুপমাকে খুব ভাল করেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর খুব শান্ত গলায় তিনি বললেন: নিরু তুমি এসে ভালই করেছ, তা না হলে আমাকেই হয়ত একবার তোমার কাছে যেতে হতো।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

মাধবানন্দ বললেন: সংসার ত্যাগ করার পর অন্তত চোদ্দ বছরের মধ্যে একবার সংসারে গিয়ে দেখা দিয়ে আসা সন্ন্যাসীদের ধর্ম। কিন্তু আমার তা হয়ে ওঠেনি। তুমি এসে দেখা দিলে আমার সে কাজ পূর্ণ হলো।

অভীক, আজ প্রায় সতের বছর পর তোমার দেখা পেলাম। তুমি আমাকে কোন কিছু না বলেই চলে এসেছিলে। তুমি কি একবারও ভেবেছিলে, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী তোমার অবর্তমানে কি ভাবে থাকবে?

কেন তোমার জন্য বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাঙ্কে মোটা টাকা রেখে এসেছিলাম।

মেয়েরা তাদের নিরাপত্তা চায়, তাদের ভবিষ্যৎ চায়। এ বিষয়ে কিন্তু তুমি আমাকে কোনক্রমে দোষারোপ করতে পারবে না।

অভীক, তুমি যে সব মেয়ে দেখেছ তারা হয়তো পুরুষদের কাছ থেকে সেইটুকু পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমি হচ্ছি ভিন্ন জাতের মেয়ে। আমি তোমাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। তোমার মা আমাকে বরণ করে ঘরে নিয়েছিলেন, যেমন আর পাঁচটা মেয়েকে তাদের শাশুড়ী বরণ করে সংসারে নিয়ে থাকেন।

তারপর আমি ও তুমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, সুখের স্বপ্ন।

আমি তোমার সন্তানের মা হবো। তুমি আমাকে সব দিক থেকে সুখী করবে, এমনি একটা আশ্বাসের কথা শোনাতে। তারপর তুমি আমাকে রেখেই আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কোথায় না তখন পাড়ি দিয়েছিলে। তখন তোমার মা বেঁচে ছিলেন কাজেই তাঁর দেখাশোনার ভার আমাকেই বর্তেছিল। আমি শুধু তোমার ভালবাসার জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম। তুমি কি জন্য ওই সব দেশে ঘুরতে গেছলে সে বিষয়ে আমার মোটেই কোন কৌতুহল ছিল না। তুমি আমায় বুঝিয়েছিলে বাণিজ্যেতে যাচ্ছ। আমি তাই বিশ্বাস করেছিলাম। কেন জান অভীক? তার কারণ—যে মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দেবে, সেই মুহূর্তে ভালবাসা অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাবে। তাহলেই বোঝ, শুধু তোমাকে নয়, তোমার ভালবাসাকে হারাতেও আমার ভয় ছিল।

মাধবানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, হঠাৎ কথার মাঝেই বলে উঠলেন: নিরু, তোমার প্রতিটি কথাই যথার্থ। কিন্তু তুমি একটি বারও জিজ্ঞাসা করলে না, কেন আমি এই পথে এলাম?

লাভ নেই সে কথা জেনে। আমি যা জানি, তাই আমি ধ্রুব সত্য বলে মনে করি।

তুমি কি জান?

অভীক তুমি স্বার্থপর। খুবই স্বার্থপর মানুষ। যা তুমি করেছ তা তোমার আত্মসুখের জন্যই করেছ। কাজেই তুমি আমাকে যদি বোঝাতে চেষ্টা করো, সংসার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় না, আমি কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস করবো না। কেন করবো না জানো? এই ভারতবর্ষে বহু গৃহী-সন্ন্যাসী ছিলেন, ও এখনও আছেন। এর জন্য সংসার ত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া তুমি তো আমাকে বলে আসতে পারতে। তুমি তো আমাকে ডিভোর্স করে আসতে পারতে। তাহলে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকতো না। আমি আবার নতুন করে জীবন গড়তে পারতাম। কিন্তু না, তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসম্মান করার জন্য নীরবে তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলে। আচ্ছা অভীক, সত্যি কি তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা এতটুকু বুঝতে না? তা যদি বুঝতে, তা হলে এই সতেরোটা বছর ধরে শুধু আমি তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। এর যে জ্বালা, যন্ত্রণা আর সেই সঙ্গে দিনের পর দিন হয়রানি তা

তুমি বুঝতে পারবে না। আর তোমার উচিত ছিল আমাকে একটা চিঠি দিয়ে শুধু জানিয়ে দেওয়া যে তুমি বেঁচে আছো। তোমার সে কর্তব্যবোধ টুকুরও পরিচয় আমি পাইনি। তুমি তো এখানে বেশ ভালই আছ।

কেন? কি করে তা বুঝলে?

মাধবানন্দ নিরুপমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তোমার এখানে সব আছে। কিন্তু আমার কি আছে বলতে পারো?

হ্যাঁ নিরু, আমার দায়িত্ব আছে, আমার এই আশ্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দ আছেন। আমি মানুষকে ধর্মানুশাসন বোঝাতে চেষ্টা করি। কাজেই সত্যি আমি ভাল আছি। আমার সবই আছে।

না অভীক, আমি যা তোমাকে বোঝাতে চাইছি তুমি তা বুঝতে চাইছ না। বলে নিরুপমা আরো বললেন, তোমার পরমানন্দ আছেন, রঙ্গাবতীও আছেন। আর আমার? আমার আজ আর কেউ নেই। আমি একা, সম্পূর্ণ একা। নিঃসঙ্গ জীবন যে কী রকম মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে—তা তুমি বুঝবে না। তা তোমার বুদ্ধির অগম্য।

মাধবানন্দ বললেন, তুমিও তো ইচ্ছে করলে আমারই মতন কিছু একটা করতে পারতে।

নিরুপমার চোখ দুটি এই মুহূর্তে যেন আরো জ্বল জ্বল করে উঠলো।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, এখন থেকে কিছু একটা করবো। আর আমি যা করবো তা হচ্ছে তোমাদের এই কাল্ট্-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই যে পূজা-পদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস—এ সবেরই বিরুদ্ধে হবে আমার কাজ। তুমি তো তোমার শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে নব-বৃন্দাবন করে বসে আছ। কাজেই মানুষকে যদি আমি উত্তরণের পথ দেখাতে পারি তবেই জানবো আমার বাকি জীবনটা সার্থক হয়েছে।

স্বামী মাধবানন্দ বললেন, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি যেন কৃতকার্য হও।

অভীক, তোমার আশীর্বাদের জন্য আমি এখানে আসিনি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জানতে এসেছি কোন্ অপরাধে তুমি আমাকে ত্যাগ করে এসেছ। আর জানতে চাই—প্রথম জীবনের সেই সব স্তোকবাক্য আমাকে দিয়ে তুমি আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে, আজ এখন নিশ্চিন্তে সাধু মহারাজ হয়ে বসে আছ। কেন? কেন এই প্রবঞ্চনা? যদি তোমার সাধু হবারই বাসনা থেকে থাকে তবে তুমি আমার সঙ্গে ছলনা না করে সোজা বলে দিলেই পারতে—

বিবাহিত জীবনে তোমার রুচি নেই, বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা তার চেয়ে ঢের ঢের শ্রেয়।

স্বামী মাধবানন্দ এবার বললেন : তোমার সব কথাই তো শুনলাম। এবার তুমি আমার কথা কিছু বলতে দাও।

নিরুপমা বললেন : তোমার কাছে আমি কোন কৈফিয়ৎ তলব করতে আসিনি। আমি শুধু আমার জ্বালার কথা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম।

নিরুপমা যখন এইসব বলছেন তখন তাঁর গলা ধরে এসেছে এবং চোখ দুটি জলে ভরে গেছে।

মাধবানন্দ বললেন, তুমি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। একটু শান্ত হও। দোহাই তোমাকে নিশুতি রাত্রে এইভাবে যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে শুধু দোষারোপ করি, তবে তোমার ও আমার কথার কোন শেষ হবে না। তাছাড়া আমাদের কথোপকথন যদি কেউ শোনে, তবে আমার সম্মানহানি হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

অভীক, তোমার যাতে অসম্মান হয় তেমন কাজ আমি কোনদিন করবো না। তবে কি জানো, অন্য মেয়ে হলে তুমি আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছ তার জন্য চরম প্রতিশোধ নিত। কিছুতেই ক্ষমা করতো না। কেননা—তুমি তোমার জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পার, কিন্তু একটা মেয়েকে বিয়ে করে তার জীবন নষ্ট করার কোন অধিকার নেই তোমার। জানো অভীক, এখানে এসে যখন জানলাম তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছ, তখনই বুঝেছি তোমার মধ্যে একটা অপরাধ বোধ আছে। রাগ কোর না অভীক, আমি একবার ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে কোন কথা না বলেই চলে যাব। পরে নিজের মত বদলালুম। ঠিক করলুম— দেখা করবো। আমার মনে যা এতদিন জমা হয়ে আছে তা উজাড় করে দেব তোমাকে। তুমি অন্তত বুঝবে নিরুপমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। তবে তুমি দেখা করবে না শুনে আমার খুব অপমান বোধ হয়েছিল। কিন্তু তবুও আমি নিজেকে কত সংযত করে রেখেছিলাম। আমার জ্বালার কথা কাউকে বুঝতে দিইনি। এমন ভাব দেখিয়েছিলাম আমি যেন সত্যি স্বামীজীর কৃপাপ্রার্থী।

মাধবানন্দ এবার বললেন, তোমার আচরণ সত্যি খুব প্রশংসনীয়। তবে আশ্রমের কয়েকজন ভক্ত কিন্তু তোমাকে সন্দেহ করেছিল।

কি সন্দেহ করেছিল? নিরুপমা মাধবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মাধবানন্দ একটু দ্বিধা করছিলেন কথাটা বলতে। তাই চুপ করে ছিলেন।

নিরুপমা জানতে চান ; কি সন্দেহ ? কেন সন্দেহ ?

তাই তিনি বললেন, বলই না, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

তুমি যে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এসেছ—এটা ওরা বুঝতে পেরেছিল। আর বুঝতে পেরেছিল বলেই ওরা সব সময় তোমাকে নজরে নজরে রাখত।

নিরুপমা বললেন, কিছু মনে কোর না অভীক, তোমার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র নয়। তার প্রমাণ তোমার ঘরে আমার উপস্থিতি।

মাধবানন্দ এই প্রথম নিরুপমার কথায় হাসলেন।

তিনি বললেন, তোমাকে তারা উগ্রপন্থী মনে করে না যে সব সময় অর্থাৎ দিন রাত্রি তোমাকে নজরে নজরে রাখবে.।

আসলে তুমি তোমার আস্থাভাজন লোকদের আমার কথা বলে রেখেছ। তা না হলে তোমার দেশী বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাদের আই কিউ বলে কিছু নেই।

মাধবানন্দ বললেন, আশ্রমের মানুষ সবাই খুব সাদা সিধে। মনে প্রাণে কৃষ্ণভক্ত।

কথাটা খুব জোরালো হলো না অভীক। যাই হোক ও সব ব্যাপারে আমার তেমন কোন উৎসাহ নেই।

মাধবানন্দ এবার বললেন, তুমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন কোথায় আছ ?

নিরুপমা বললেন, যাক তোমার তাহলে আমার বিষয়ে জানার আগ্রহ হয়েছে। তবে শোন, তুমি চলে আসার পর আমি কিছুদিন ওই বাড়িতে ছিলাম। শুধু আশায় আশায় দিন গুণতুম, ভাবতুম এই বুঝি তুমি আসবে। কিন্তু একটি বছর অপেক্ষা করার পর যখন তুমি আর ফিরে এলে না, তখন তোমার বাড়ি, গাড়ি, টাকা সব রেখে আমি চলে আসি সরকারি এক আবাসিক হোস্টেলে। আর কি করে আমার দিন চলে ? আমি একটি মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করি। মোটামুটি ইউ জি সি স্কেল্ নিয়ে যা মাহিনে পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যায়। কাজেই তোমার ওই অসীম করুণার দান আমি গ্রহণ করতে পারিনি। কি রকম যেন আত্মসম্মানে বাধল। তোমার ওই ব্যাঙ্কের টাকা এতদিনে নিশ্চয় ফুলে ফেঁপে অনেক হয়ে গেছে। আসলে এ সব তুমি বুঝবে না। যার অধিকারে আমার অধিকার—সেই যদি আমাকে তার ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তবে আমার কিসের ওপর জোর।

মাধবানন্দ বললেন, মেয়েরা বড় ইমোশনাল-মানে আবেগপ্রবণ হয়।

স্বাভাবিক। বললেন নিরুপমা।

তারা তো সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, তাই তাদের মধ্যে স্নেহ, মমতা, আবেগ সবই থাকে। আর পুরুষদের আবেগের কোন বালাই নেই। তারা কিছু দিন মেয়েদের নিয়ে খেলা করে, তারপর যখন আর ভাল না লাগে তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তখন সে মেয়ে হয়ে যায় পরিত্যক্তা।

মাধবানন্দ এই কথা শুনে বললেন, নিরু, তুমি কি আজকাল ওম্যান লিব-এর দলে নাম লিখিয়েছ?

না, সি আই এ'র হয়ে কাজ করছি। কম্যুনিজমবিরোধী আন্দোলনে মদত দিচ্ছি।

এই কথা শুনে স্বামী মাধবানন্দের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি খুব শান্তভাবে বললেন, নিরু, রাত অনেক হয়ে গেছে। তোমার তো সব কথাই শুনলাম। তোমার অভীক ক্ষমাপ্রার্থী।

নিরুপমা বললেন, ক্ষমার কোন প্রশ্ন আসে না। অনেকদিনের অনেক ক্ষোভ আমার জমা ছিল। তোমার কাছে সে সব কথা বলে আমি এই মুহূর্তে বেশ হালকা বোধ করছি।

তুমি কি আশ্রমে থাকতে চাও?

না অভীক। তোমার দয়ায় আমি তো এতদিন রইলুম। এবার আমার যাবার পালা। কালই আমি কলকাতা রওনা হবো।

মাধবানন্দ বললেন, যদি ইচ্ছা করো তো আরো কিছুদিন থেকে যেতে পার।

না। আমার এখানে থাকা উচিত হবে না। তাতে তোমার মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই হবে। আশ্রমের শুচিতা নষ্ট হবে।

এ তোমার অভিমানের কথা। দেখছি এই সতেরো বছরে তুমি কত বদলে গেছ। এক সময়ে দেখেছিলাম তুমি খুব জেদী মেয়ে ছিলে। এখন দেখছি তোমার সে জেদ মনোবলে রূপান্তরিত হয়েছে। তুমি তাই জীবন সংগ্রামে হয়ে উঠেছ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অথচ দেখ আমার মধ্যে তার বিন্দু বিসর্গ চিহ্ন নেই। আমি যেন তোমার বিপরীত মেরুর লোক। তাই প্রভেদটা এই মুহূর্তে খুব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্তত আমি তা বেশ উপলব্ধি করি।

নিরুপমা বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো অভীক, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

স্বামী মাধবানন্দ মুহূর্তের জন্য কেমন যেন চিন্তিত হয়ে ওঠেন। চুপ করে বসে থাকেন। নিরুপমা মাধবানন্দকে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো? কি ভাবছো তুমি অভীক?

মাধবানন্দ বললেন, ও কিছু নয়। মাঝে মাঝে আমার এমন অবস্থা হয়।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ কপাটে করাঘাত করার শব্দ শোনা গেল।

মাধবানন্দ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, কে? ভিতরে এসো।

ঘরের ভেতরে এসে উপস্থিত হলেন রঙ্গাবতী।

স্বামী মাধবানন্দ রঙ্গাবতীকে এমন সময় তাঁর শয়ন কক্ষে আসতে দেখে যেন বিস্মিত হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন, কি খবর রঙ্গাবতী? এত রাত্রে তুমি আমার এখানে এসেছো কেন?

রঙ্গাবতী বললেন, বড় দুঃসংবাদ আছে স্বামীজী।

কি দুঃসংবাদ?

জিজ্ঞাসা করলেন স্বামী মাধবানন্দ।

রঙ্গাবতী বললেন, গতকাল থেকে দেবলীনা ও রুক্মিণীর কোন দেখা নেই। যতদূর সম্ভব তাঁরা আশ্রম ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গেছেন।

এ সিদ্ধান্তে তুমি কি করে এলে রঙ্গাবতী? তাদের যে কোন বিপদ হয়নি তাই বা তুমি কি করে নিশ্চিত হলে?

রঙ্গাবতী বললেন, আমি ওঁদের ঘরে গিয়ে দেখেছি, ওঁরা প্রয়োজনীয় সব জিনিস-পত্তর নিয়েই চলে গেছেন। এটা ওঁদের পূর্বপরিকল্পিত বলে আমার মনে হয়।

মাধবানন্দ বললেন, যে যাবার তাকে যেতে দাও। এ সবই শ্রীরাধাগোবিন্দের ইচ্ছা। কিন্তু এ সংবাদ যদি কাল সকালে তুমি আমাকে জানাতে তাতে কি এমন কিছু ক্ষতি হতো? রঙ্গাবতী এই কথায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ভাবটা এমন যে দুজন শিষ্যার অকস্মাৎ অন্তর্ধানে স্বামী মাধবানন্দ মোটেই বিচলিত হননি। এবং এ সংবাদের তেমন কোন গুরুত্ব নেই তাঁর কাছে।

অথচ রঙ্গাবতী প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনা করেই গভীর রাতে ছুটে এসেছেন স্বামী মাধবানন্দের কাছে। যখন এই সব কথা হচ্ছে নিরুপমা স্বামীজীকে বললেন: এখন আমি আসি স্বামীজী। আপনার আশীর্বাদ লাভ করে আমি সত্যি কৃতার্থ বোধ করছি। নিরুপমা আর এক মুহূর্ত দেরী না করে দ্রুতপায়ে তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে ফিরে এসে বিছানায় তাঁর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনে খুব হাসলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

। ১১ ।

পরের দিন নিরুপমার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। এত বেলা হয়ে গেছে যে নিজের কাছেই তাঁর খুব খারাপ লাগতে লাগল। তাড়াতাড়ি তিনি উঠে পড়লেন। আজই ফিরে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন, কাজেই টিকিট কাটা ও অন্যান্য গোছগাছ করতে সারা দিনটাই হয়তো কেটে যাবে। তাই নিরুপমা বেশ তাড়াহুড়ো করেই স্নানের পর্ব শেষ করে ফেললেন।

একবার মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন। কেননা যতদিন তিনি এই আশ্রমে এসেছেন প্রতিদিন সকালে তিনি মন্দিরে গিয়েছেন। কাজেই আজ যাবার দিনে যদি তিনি না যান, তবে তা সকলের খুবই দৃষ্টিকটু লাগবে। সন্ধ্যারতির সময়ও নিরুপমা গেছেন, তবে তা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে। তা ছাড়া নিরুপমার তখন মন্দিরে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল—তা হচ্ছে আশ্রমের অন্যান্যরা যেন তাঁকে ভক্তিমতি মহিলা বলে মনে করে। কিন্তু আজ আর সে সবের কোন বালাই নেই। নিরুপমা যা চেয়েছিলেন, তা তাঁর পূর্ণ হয়েছে। তবু দৃশ্যত: খারাপ দেখায়, তাই নিরুপমা অগত্যা মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তিনি যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন প্রাতঃকালীন পূজা শেষ হয়ে গেছে। ভক্তরা তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছেন আর নামগান করছেন।

নিরুপমা করযোড়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করছেন। মুদিত নয়নে তিনি যখন এইভাবে মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন স্বামী মাধবানন্দের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। মাধবানন্দ মন দিয়ে দেখেন নিরুপমাকে, আর মনে মনে ভাবেন গত রাত্রের নিরুপমার সঙ্গে এ নিরুপমার কত প্রভেদ। যখন নিরুপমা চোখ খুললেন, তখন তিনি স্বামী মাধবানন্দকে ত্রস্তপদে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে দেখলেন।

নিরুপমা আশা করেছিলেন, এখানে অন্তত রঙ্গাবতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। কিন্তু শুধু রঙ্গাবতী নয় পরমানন্দকেও দেখতে পেলেন না নিরুপমা। অগত্যা তিনি ফিরে এলেন। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করছে না। আজই তিনি চলে যাবেন। যে জন্য আসা তা তো তাঁর হয়েই গেছে। এবার তাই ফেরার

পালা। স্বামী মাধবানন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি এখন অন্য জগতের মানুষ। তাঁর জগতের সঙ্গে নিরুপমার জগতের আকাশ পাতাল তফাৎ।

'রমণী তো ফুল, পুরুষ-ভ্রমর মধুপান করে তাকে পরিত্যাগ করবে। এইটেই তো সনাতন বিধি।'

কোথায় যেন একথা পড়েছিলেন নিরুপমা। আজ হঠাৎ তাঁর মনে পড়তে হাসি পেল। এই যে এতদিন ধরে অভীকের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করেছিলেন, তার জন্য তাঁর মন কেমন যেন আজ রিরি করতে লাগল। কি প্রয়োজন ছিল এই সব করার? যখনই জেনেছিলেন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক তখনই নিরুপমার উচিত ছিল আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাওয়া। এ যেন অনেকটা শবরীর প্রতীক্ষার মতন। কিন্তু আসলে কি তাই? বিবাহিত স্ত্রী তাঁর স্বামীর এই অস্বাভাবিক আচরণের জন্য নিশ্চয় কৈফিয়ৎ চাইতে পারে। কিন্তু অভীক এখন স্বামী মাধবানন্দ। কাজেই শিষ্য শিষ্যাদের কাছে তিনি প্রভুপাদ। প্রভুপাদ না হলেও ওই জাতীয় সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এখানে এসে নিরুপমা যা দেখলেন, তা গৌরনাগরী ভাবেরই প্রাধান্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করে বৈষ্ণব ধর্মের যে পুনরুজ্জীবন হয়েছিল তার কোন তুলনা হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু মূল বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত, শ্রীচৈতন্য প্রবর্দ্ধিত ও শ্রীচৈতন্য প্রচারিত তত্ত্বগুলি ছাড়াও কিছু নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। এর মধ্যে একটি গৌরনাগরীভাব।

কর্তাভজা ও কিশোরীভজা—এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর নাগরভাবের প্রভাব আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই দুই সম্প্রদায়ের আচার আচরণ কোন-ক্রমেই অনুমোদন করেন না। এঁদের হেয় চোখে দেখে থাকেন। তার প্রধান কারণ বৈষ্ণব সমাজের সাধনা পদ্ধতি ভক্তিমার্গী। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের লীলা রসাস্বাদন যথোচিতভাবেই করে থাকেন। কিন্তু কর্তাভজা ও কিশোরীভজা সম্প্রদায়—তারা তাদের নিজেদের মধ্যে কারুকে কৃষ্ণ বা কারুকে রাধা বলে অনুভব করে থাকেন। কর্তাভজারা বিশ্বাস করেন এক ঈশ্বর, বিভিন্ন নামে তাঁর প্রকাশ। আসলে একেশ্বরবাদী।

এই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন আউলচাঁদ। কর্তাভজাদের মতে আউলচাঁদই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনিই গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই আউলচাঁদের বিষয় নানা কিংবদন্তী শোনা যায়। তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব ও ধর্মপ্রচারের

বিষয় শোনা যায় :

'আনোয়পুর জেলায় ঘোরা ডুবলি নামক স্থানে তিনি সন্ন্যাসী বেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর বালকবেশে তিনি পানের মহাজন মহাদেব বারুইকে দেখা দেন। এখানে বার বছর থাকার পর তিনি এক গন্ধবণিকের কাছে কিছু কাল কাটান। তারপর এক জমিদারের কাছে থেকে তিনি চলে যান পূর্ববঙ্গে এবং সেখানে তিনি বেজরা গ্রামে বাইশজনকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর এই শিষ্যরা বেশীর ভাগই ছিলেন সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত। আরো শোনা যায় বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে আউলচাঁদকে জনৈক সৈন্যাধক্ষ গ্রেপ্তার করেন। তিনি তখন ত্রিবেণীর কাছে চন্দ্রহাটির ঘাটে নিজের কমণ্ডলুতে গঙ্গাকে পুরে খড়ম পায়ে জলহীন গঙ্গা পার হয়ে যান। এই আউলকর্তার কমণ্ডলুর গঙ্গাজল আজও ঘোষ পাড়ার পালেদের বাড়ি আছে।

এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দশটি বিধি আছে, যা আদর্শের দিক থেকে সত্যই খুব শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করে না। এটি বৈষ্ণবধর্মের যে প্রভাব তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন সারা জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে—তা মানুষ। একই ধর্ম আছে—সে ধর্মের নাম সত্যধর্ম। গুরুই ঈশ্বর। তিনি কর্তা বা গুরুতে বর্তমান। সে কারণে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম মহাশয় এবং শিষ্যর নাম বরাতি।

আদর্শের দিক থেকে কয়েকটি উদার মানবিক আবেদন আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে স্বার্থান্বেষী-ব্যক্তি অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছিল এবং তার অপব্যবহার করেছিল। ফলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষের কাছে আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। তৎকালে দাশরথি রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা এই কর্তাভজা সম্প্রদায় নিয়ে বহু ব্যঙ্গ গান ও কবিতা লিখেছিলেন, যা সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

আউলচাঁদের বাইশজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পালের বংশ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়। এই রামশরণ পালের আদি নিবাস চাকদহের কাছে জগদীশপুরে। জাতিতে তিনি সদগোপ ছিলেন।

ইনি প্রথম বিবাহ করেন জগপুর গ্রামের শিশু ঘোষের কন্যা গৌরীকে। বিবাহের পর মনোমোহিনী ও জগত্তারিণী নামে দুটি কন্যা সন্তানও হয়। কিন্তু এই স্ত্রী ও দুটি কন্যার মৃত্যুর পর রামশরণ ঘোষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন জগদীশ

পুরের কাছে গোবিন্দপুর নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতীকে। সরস্বতীই পরবর্তীকালে সতী-মা নামে বিখ্যাত হন।

রামশরণ পাল বেনাপুরের জমিদার পদ্মলোচন রায়বাহাদুরের বাড়িতে নায়েবী করতেন। শোনা যায়:

শূলযন্ত্রণায় কাছারি বাড়িতে রামশরণ অসুস্থ হয়ে পড়লে জনৈক আগন্তুক সাধু কমণ্ডলুর জলস্পর্শে তিনি যন্ত্রণামুক্ত হন। সাধু কাছারি বাড়ির একটি ঘরে ধ্যানে বসেন। দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যান করার পর গভীর রাত্রে ওই সাধু যখন ঘর থেকে বাইরে আসেন, তখন রামশরণ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়েন। শিষ্য হবার কামনা ব্যক্ত করেন। সাধু রামশরণকে বলেন, শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় এখন হয়নি। যথাসময়ে তিনি শিষ্যরূপে বরণ করবেন বলে, সাধু কাছারি বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হয়ে যান। এই সাধুই হচ্ছেন আউলচাঁদ এবং পরবর্তীকালে রামশরণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান হন। রামশরণের পর রামদুলাল কর্তাভজা সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামদুলাল প্রায় আটশ ভাবের গীতা রচনা করেন, যা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বলেই বিদিত। এই সব গান কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষের মুখে শোনা যায়। তা ছাড়া প্রতি শুক্রবার এই নিয়ে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করাই হচ্ছে এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

রামশরণের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সরস্বতী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গদি লাভ করেন এবং তিন পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সরস্বতীকে সতীমা বা কর্তামা বলা হতো। এই সতীমা ১২৪৮ সালের আশ্বিন মাসের দেবীপক্ষের প্রতিপদে দেহরক্ষা করেন। এখনও সতীমায়ের তীর্থস্থানে অর্থাৎ ঘোষপাড়ায় যে মেলা হয়—সেই মেলায় হাজার হাজার মানুষ মেলা উপলক্ষে উপস্থিত হন। মেলায় আউল বাউল সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। সবাই দেখতে যান সতীমার সমাজ, ডালিমতলা, শ্রীজুতের ঘর অর্থাৎ যেখানে রামদুলালের খড়ম রক্ষিত আছে।

মেলা হয় সাধারণত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলরাসপর্ব, বৈশাখী পূর্ণিমায় রথযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রার পরে চতুর্থীতে রামশরণ পালের তিনদিনব্যাপী মহোৎসব, সতীমার মহোৎসব ও কোজাগরী মহোৎসব।

হিন্দু, মুসলমান, পীর, ফকির, বাউল ও বীরাচারী সবাই এসে হাজির হন আউলচাঁদের সঙ্গীতযজ্ঞে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

চণ্ডীদাসের অমর এই পদটি হচ্ছে—শ্রীমৎ আউলচাঁদের মূল মন্ত্র।

কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের আচার আচরণের বিধি হচ্ছে সর্বদাই রমণী সঙ্গ-

শোভিত হয়ে থাকা। এইভাবেই পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া। পূজার কোন তন্ত্র মন্ত্র নেই, শুধু গানই তার প্রকাশ। কোন জাতিভেদ না মানা। নিচু জাতের তৈরী রান্না উঁচু জাতের মানুষ গ্রহণ করবে। নীচু জাতের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। দেবতার ভোগে চড়াবে মাছ ও মুসুর ডাল। গভীর রাতে পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর কৃষ্ণলীলার অনুকরণে চলে লীলাখেলা। সকলেই গোপ গোপীর ভূমিকায় নামে এবং বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি চলে সারারাত।

তবে এখন কিশোরীভজা সম্প্রদায় আছে কিনা জানি না, তবে এই সহজিয়া ভাবের প্রকাশ বহু সাধনার মধ্যে দেখা যায়।

শোনা যেত সেকালে এই ধরনের কিছু গানের প্রচলন ছিল। যেমন:

'কিশোরী চরণে গয়া গঙ্গা কাশী
বৃথা পিণ্ড দানি বৃথা একাদশী।
কর আত্মারই মিল অজপা উদ্দেশি
আমি তুমি ভেদ না কর কখন।'

আবার আছে:

'অধরে অধর করিবে মিলন
অধরামৃতরস কর আস্বাদন।
প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন
দেখ যেন শশী না হয় পতন।'
'গুরু গুরু করে ভ্রম অকারণ
সন্নিকটে গুরু দেখনা কখন
পুরুষ ঘোষিতে পরস্পর গুরু
উভয়ের উভয় বাঞ্ছা কল্পতরু।
জাতের বিচার নাহি সে আচার
যে হরিবে মন গুরু সেই জন।'

এ ব্যবস্থা কিন্তু মন্দ নয়। মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। আসল কথা যে যার মনের মতনটি বুঝে নাও। বৃথা অন্বেষণে কাজ নেই।

'গুরু আর কৃষ্ণ জানিবে অভেদ
গুরু রুষ্টে বৃথা কোটি অশ্বমেধ
গুরু কৃপা হলে পাবে অবহেলে
গোলক ধাম তব নিত্যনিকেতন।'

আবার—

'গুরু কৃষ্ণ আর গুরু সাধুজনা।
দেহদানে কর তাদের অর্চনা।
জীবন-যৌবন দিও তার দক্ষিণা
বাকি যা থাকিবে তাই অকারণ।'

এছাড়া—

'চরণ বলে কৃষ্ণ গুরু রাইকিশোরী
এক ভেবে পূজা করিলে না সেই গৌরী।
বৃথা দিন যায় কি হবে উপায়
ঐ শুন কৃতান্ত করিছে গর্জন।।'

এই কি ধর্মের বাতাবরণ, না গুরুবাদের আর এক মূর্তি? কোন ধর্মই আদর্শগতভাবে নিন্দনীয় হতে পারে না। ধর্মে যার প্রকাশ সমাজ সেখানে কর্মগত এমন কিছু আচার আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটায়, যার ফলে ধর্মের চেহারাটা যায় পাল্টে। ফলে ঈশ্বরের নামে ধর্মের নামে চলে ব্যভিচার। যা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই সাধনা খুব কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় চারিত্রিক বল, প্রয়োজন সংযম ও মনোবল। কাজেই কর্তাভজা বা কিশোরীভজা, ধর্মসম্প্রদায় আদর্শগতভাবে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই সাধন মার্গকে ভাল চোখে দেখেন না।

ধর্মের বন্ধন হলো একটি বিশ্বাসের আধারে কিছু মূল্যবোধ নিয়ে জীবন ধারণ করা। সেই মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ধর্মান্তকরণ করে থাকে। প্রতিটি মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধিকার আছে। আমাদের দেশে বহু মানুষ মার্কসবাদে বিশ্বাসী। আবার কেউ বা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব নিয়ে নিজেকে তার মধ্যে নিয়োজিত করে রেখেছে। আবার দেখা যায় অনেকে ওয়েবারের স্কুল অফ সেমিওলজিতে বিশ্বাস করে। যে মানুষ তার বিশ্বাস পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, তাকে সবাই সম্মান করে।

আজকে গৌরনাগরীভাবের কথা থেকে বহু কথাই মনে পড়ে নিরুপমার। স্বামী মাধবানন্দের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম' দেখে তাঁর মনে হচ্ছে: বৈষ্ণব ধর্ম সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং জাতিভেদ প্রথা লোপ ও স্ত্রীলোকের একাধিক বার স্বামী গ্রহণ করার অধিকার পাবার পর সমাজ জীবনে ব্যভিচার যে সঞ্চারিত হয়েছিল সে বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায়। পরকীয়া ও স্বকীয় সহজিয়া

সাধনার স্বরূপ সন্ধান যেমন সহজে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় এখানকার আচার আচরণে নাগরভাবের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

এমনি অনেক কথাই আজ মনে হচ্ছে নিরুপমার। রঞ্জাবতীকে একবার দেখতে পেলে ভাল হতো। কিন্তু কোথায় রঞ্জাবতী? পরমানন্দর কোন দেখা নেই। বোধ হয় ওঁরা আজ খুবই ব্যস্ত আছেন। ওই যে দেবলীনা ও রুক্মিণী আশ্রম কন্যাদ্বয় আশ্রম থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন, তাঁদের জন্যই বুঝি ওঁরা খুব ব্যস্ত। কিন্তু কেন ওঁরা এই আশ্রম থেকে চলে গেলেন? তবে কি আশ্রমের পরিবেশ ওঁদের মনোমত ছিল না? না—ধর্মের এই আবরণে ওঁরা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন?

নিরুপমা দীর্ঘ সময় একা ছিলেন, তাই তাঁর মনে নানা কথা ভেসে ওঠে। এই যে 'কর্তাভজা ও কিশোরী ভজা' সম্পর্কে যা কিছু ধারণা, তা তিনি বহু পূর্বে একটি সাময়িক পত্রিকায় শ্রীমতী উমা রায়ের প্রবন্ধ পাঠে অবগত হয়েছিলেন। এছাড়া 'বীরভূম পরিচয় পত্রিকায়' কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গানের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাঙলা দেশের মেলার ওপর তিনি যখন কাজ করেছিলেন, তখন এইসব সম্প্রদায়ের বহু গানের তিনি সন্ধান পান—যেগুলি দেহতত্ত্বের গান।

কিন্তু নিরুপমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন অভীকের পরিবর্তন। আজ অভীক তার অতীতকে ফেলে কেমন সুন্দরভাবে নিজেকে স্বামী মাধবানন্দে রূপান্তরিত করেছে। নিরুপমা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন—স্বামী মাধবানন্দের আচার আচরণ, কথাবার্তা সবই স্বামীজীর মতন। নিরুপমার চোখে পার্থক্যটা খুব সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। নিরুপমা তো বহু সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসেছেন, কাজেই মাধবানন্দকে দেখে শ্রদ্ধা ভাবই মনে হয়। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মিষ্টভাষী স্বভাব সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিরুপমার একটা নৈতিক পরাজয় হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি স্বামী মাধবানন্দের একটি সার্থক প্রয়াস।

এই সব যখন নিরুপমা ভাবছেন, তখন গৌরতনু এসে উপস্থিত হলেন নিরুপমার সামনে।

গৌরতনু বললেন, পরমানন্দজী আশ্রমের কাজে আজ খুব ব্যস্ত আছেন। তাই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। শুনলাম আজই আপনি কলকাতা রওনা হতে চান। যদি আদেশ করেন তবে আমি আপনার সেবার জন্য কিছু করতে পারি।

নিরুপমা বললেন, যদি আমার রেলের টিকিটটা আপনি ব্যবস্থা করে দেন,

তাহলে খুব ভাল হয়।

গৌরতনু বললেন, আজই ফিরতে চান ?

নিরুপমা বললেন, হ্যাঁ।

বেশ আপনার টিকিটের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু যদি আজকের টিকিট না পাওয়া যায় তবে কি আগামীকালের টিকিট কিনে আনবো ?

একান্ত যদি টিকিট না পান, তা হলে আগামীকালের যে কোন ট্রেনের টিকিট আনবেন।

গৌরতনু বললেন, আপনি ফেরার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, আমি চেষ্টা করছি। দেখি আজকের পেলে তো কোন কথা নেই, তবে একান্ত যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমি আগামীকালের রাত্রের ট্রেনের টিকিট নিয়ে আসবো। তাতে আপনি ভালভাবেই যাবেন। পথে কোন কষ্ট হবে না।

নিরুপমা বললেন, দেখুন আপনি, যা ভাল মনে করবেন, তাই করবেন। তবে আজকে যেতে পারলে ভাল হতো।

গৌরতনু নিরুপমার কাছ থেকে টিকিটের জন্য টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

নিরুপমার মনে এখন স্বস্তিভাব। পরমানন্দের বেশ কর্তব্যবোধ আছে, আর আছে সকল কাজে নিষ্ঠা।

কবে নিরুপমা পরমানন্দকে টিকিটের কথা বলে রেখেছিলেন, আজ ঠিক সময় মত সব কাজের মধ্যে তিনি সে কথা মনে রেখেছেন। নিজে আসতে পারেননি, কিন্তু গৌরতনুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নিরুপমা যখন এইসব ভাবছেন, তখন তাঁর পিছনে এসে কে যেন বললেন : হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

হঠাৎ বিস্ময়ে নড়ে ওঠেন নিরুপমা। পিছনে ফিরে দেখেন রঞ্জাবতী এসেছেন।

নিরুপমাও আজ বললেন, হরে কৃষ্ণ।

তারপর হাসিমুখে বললেন, আসুন, বসুন।

রঞ্জাবতী নিরুপমার কথামত বসলেন। তারপর তিনি বললেন, শুনলাম আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ ভাই। আজই যাবার ইচ্ছে আছে।

রঞ্জাবতী বললেন, আরো কয়েকদিন থেকে গেলে ভাল হতো না ?

উপায় নেই। অনেক কাজ ফেলে এসেছি। এই তো বেশ কিছুদিন আপনাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম। এখন সেই মধুর স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবন

আমার বেশ কেটে যাবে।

এই কথা বলে নিরুপমা রঙ্গাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রঙ্গাবতীর চোখ মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নিরুপমা আরও ল করেন : কি যেন একটা কথা বলতে চান রঙ্গাবতী, অথচ বলার ঠিক সুযো পাচ্ছেন না।

তাঁর চেহারার মধ্যে সেই শুচিস্নিগ্ধ, শান্ত ভাব আর নেই। কেমন যে অস্থিরতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সব দেখে শুনে নিরুপমাই কথাটা তুললেন। তিনি বললেন, আমার অনুমা আপনি বোধ হয় আমার কাছে কিছু জানতে চান।

রঙ্গাবতী কেন জানি না সরাসরি তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমার আপনাকে জিজ্ঞাসার কোন কিছু নেই। আমার এ সাক্ষাৎকার জানবে কেবল সৌজন্যমূলক। অনেক আগেই আমি দেখা করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সম করে উঠতে পারিনি।

নিরুপমা বললেন, আমি শুনেছি আপনাদের আশ্রম ছেড়ে দেবলীনা ও রুক্মিণী চলে গেছেন। সেই সব নিয়ে আপনি বোধ হয় খুব ব্যস্ত।

রঙ্গাবতী বললেন, ওঁরা চলে যাওয়ায় আমরা চিন্তিত নই। শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম ওঁরা স্বেচ্ছায় চলে গেছেন কি না?

এখন কি সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন?

রঙ্গাবতী বললেন, হ্যাঁ এখন আমরা নিশ্চিত যে ওঁরা আশ্রম ত্যাগ করেই গেছেন। কেননা যদি অন্য কোন বিপদ হতো, তা হলে সে দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়তো। আমাদের আশ্রমে বেশ কিছু নিরাপত্তা কর্মী আছেন, যাঁদের কাজই হলো আশ্রমের সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা। কাজেই শুধু বহিরাগত কেন, কারুরই পক্ষে আশ্রমের কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যবস্থা আপনাদের কত দিন ধরে হয়েছে?

রঙ্গাবতী বললেন, এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের, তবে রাধারাণীর মূর্তি চুরি যাওয়ার ঘটনার পর আরো জোরদার করা হয়েছে।

নিরুপমা বললেন, খুবই ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু এরই মধ্যে থেকে দুটি মেয়ে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল, আর আপনাদের নিরাপত্তা কর্মীরা তা ঘুণাক্ষরে জানতে পারল না।

তাঁদের কাছ থেকেই তো জানতে পেরেছি! ওঁরা চলে গেছেন।

নিরুপমা বললেন, ওঁদের বাধা দিল না কেন ?

না, সেটা নিয়ম নয়। বলে রঙ্গাবতী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর কি ভেবে তিনি বললেন, আশ্রম তো জেলখানা নয়। যাঁর ভাল াগবে না তিনি চলে যাবেন। সমস্তটাই আদর্শগত ব্যাপার। আজ যদি আমার তের মিল না হয়, তবে আমিও আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে পারি। তার জন্য ামাকে কেউই বাধা দিতে পারে না বা দেবে না। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন সত্তা াছে।

আজ যদি এই ধর্ম ও আদর্শের প্রতি আমার আস্থা না থাকে, তবে আমার ান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

নিরুপমা বললেন, আপনার কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ, তবে ওঁরা আশ্রম কর্তৃপক্ষকে লেই যেতে পারতেন।

রঙ্গাবতী বললেন, সেটাই উচিত ছিল। তবে যদি কেউ তা না করেন তো কি রা যাবে ? কারুরই ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করি না।

যখন এই সব কথা হচ্ছে, তখন পরমানন্দ এসে উপস্থিত হলেন।

নিরুপমা পরমানন্দকে দেখে বললেন, যাক্ আপনার সঙ্গে তা হলে যাবার আগে খা হয়ে গেল। মনে মনে শুধু এই কথাই ভাবছিলাম যে যদি একবার আপনার ঙ্গে আমার দেখা হয় তাহলে খুব ভাল হয়।

পরমানন্দকে দেখলে মনে হয় তিনি যেন বিধ্বস্ত। মুখে চোখে চিন্তাক্লিষ্ট ভাব। তবু পরমানন্দ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মুখে হাসি এনে বললেন, আপনার া আজ যাওয়া হচ্ছে না মা।

কেন বাবা ?

আপনি আমাদের ছেড়ে এইভাবে চলে যাবেন—তা বোধ হয় তাঁর ইচ্ছে নয়।

নিরুপমার কাছে কথাটি খুব হেঁয়ালির মতন মনে হয়। তবু তিনি স্পষ্ট করে নতে চান—কার ইচ্ছে নয়।

এবার পরমানন্দ বললেন, শ্রীরাধারমণের। যাঁর অধীনে আমরা আছি,যাঁর ায় আমরা বাঁচি মরি। সেই শ্রীরাধারমণের ইচ্ছে নয়, আপনি আমাদের ছেড়ে জ যাবেন।

নিরুপমা বললেন, টিকিট কাটতে আমি পাঠিয়েছি।

পরমানন্দ বললেন, গৌরতনু আপনার জন্য আগামীকালের টিকিট এনেছেন। জকের টিকিট তিনি পাননি। কাজেই আপনি আজ চলে যাবার জন্য যতই চেষ্টা

করুন, তা কোন ক্রমেই সম্ভব হলো না। তাই তো বললাম : সবই তাঁর ইচ্ছে তিনি যা করান, আমরা তাই করি।

নিরুপমার কাছে এখন ব্যাপারটা কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি এ ব্যাপার হাসিমুখেই মেনে নিলেন।

রঙ্গাবতী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি বললেন, কালই যাবেন। সে বেশ ভালো হলো।

এই বলে রঙ্গাবতী চলে গেলেন।

নিরুপমা লক্ষ্য করেন : যাবার সময় সবাই এখন তাঁর প্রতি আগ্রহ প্রকা করছেন। তাঁকে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। এমন কী ঘটলো— যার জন্য সবাই এখন আন্তরিকতা দেখাচ্ছেন। এ সবই এখন তাঁর বুদ্ধির অগম বলে মনে হয়।

রঙ্গাবতী চলে যাবার পর নিরুপমা পরমানন্দকে বললেন, শুনলাম আশ্রমে আপনাদের নিরাপত্তা কর্মী আছেন। তবে কিভাবে দেবলীনা ও রুক্মিণী সকলে দৃষ্টির অগোচরে আশ্রম থেকে চলে যেতে সক্ষম হলেন ?

পরমানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কোথায় নিরাপত্তা কর্মী ? কি লোক আছে যারা কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পাহারার কাজে নিযুক্ত আছে এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না।

নিরুপমা বললেন, এবার বুঝেছি। দেবলীনা বড় ভাল মেয়ে ছিল। তাঁর এ মতিভ্রম হলো কেন ?

পরমানন্দ ধীর স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন নিরুপমার দিকে। তাঁর চো তখন জল। বোধ হয় হৃদয়ের অনুচ্চারিত বেদনার প্রকাশ।

নিরুপমা এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলে শুধু পরমানন্দকে বললেন আপনাদের আথিথেয়তার কথা কোন দিন ভুলবো না। যদি পারেন তো আগামী কাল একবার আসবেন। যাবার আগে কিছু কথা বলে যাব, যা আপনাদে আশ্রমের পক্ষে মঙ্গলকর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরমানন্দ এরপর আর কোন কথাই বলতে পারেননি। কোনক্রমে নিজেকে সংযত করে নিরুপমাকে বললেন, এখন আমি আসি মা।

পরমানন্দ বহু কষ্টে এই কথা বলে নিরুপমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

নিরুপমা লক্ষ্য করেন : পরমানন্দের মধ্যে বেশ একটা বিনয়ী-ভাব আছে। ওঁ নম্র ও হৃদয়বান বলে মনে হয়। কিন্তু রঙ্গাবতীর চোখে মুখে কেমন যেন এক

হিংস্র ভাব। স্বভাবে জেদী, যা বৈষ্ণবের পক্ষে একবারে বেমানান।

এরপরের ঘটনা যেমন বিস্ময়কর, তেমন রহস্যজনক বলে মনে হয়।

নিরুপমার সত্যি আর কলকাতায় ফেরা সম্ভব হয়নি। পরের দিন নিরুপমাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর ঘরে। আত্মহত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু সে সম্পর্কে কেউই কোন কথা প্রকাশ করেনি। সুস্থ সবল মানুষের এইভাবে মৃত্যু নিঃসন্দেহে রহস্যজনক বলে মনে হয়। কিন্তু আশ্রমের ডাক্তার পরীক্ষা করে যে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে: 'ম্যাসিভ কার্ডিয়াক্ এ্যাটাক্।'

কাজেই এ নিয়ে কোন তদন্ত হয়নি বা কেউ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ বা অভিযোগ পেশ করেনি।

আশ্রমিকরা নিরুপমার এই মৃত্যুকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মত: নিরুপমা পুণ্যবতী ছিলেন, তাই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে দেহত্যাগ করেছেন। পুণ্যাত্মা না হলে এমন মৃত্যু হয় না।

আশ্রমিকরা নিরুপমার শবদেহ মহানদী তীরস্থ শ্মশানে মিছিল করে নিয়ে যান। সংকীর্তন ও হরিনাম স্মরণ করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় স্বামী মাধবানন্দের মনে কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। শুধু নিরুপমার মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন: হে শ্রীহরি, এঁর আত্মার যেন কল্যাণ হয়। আত্মার যেন শান্তি হয়।

। ১২ ।

শর্মিলা বহু চেষ্টা করেও অসিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। পুরি থেকে আসার পর প্রথমটা শর্মিলাই ইচ্ছে করে অসিতের কোন খোঁজ খবর নেয়নি। তার কারণ শুধু যাত্রাভঙ্গ নয়, আশাহতও হয়েছিল সে। আশাভঙ্গ বললেও বলা যায়। তাই একটা ক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে শর্মিলাকে নাড়া দেয়, যার ফলে সে খুবই কঠোর মনোভাব পোষণ করে। ফিরে এসে সে স্থির করে ফেলে অসিতের সঙ্গে আর মোটেই দেখা করবে না। কাজেই আর অন্য কোথাও যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শর্মিলার চলে আসার পর অসিতের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং

অসিত তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল কি না—তা জানতে খুবই ইচ্ছা করে শর্মিলার।

অফিসে কাজের মধ্যে থেকেও তার মনে হয়ঃ এই বুঝি অসিত এসে উপস্থিত হবে। তারপর শর্মিলার কাছে একটু জবাবদিহি করে, একটু তর্কাতর্কি করে, শেষে মাপ চেয়ে নিয়ে বলবেঃ ঘাট হয়েছে, এ রকমটি আর কোনদিন হবে না, শর্মিলা তখন সহজ ও তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অসিতকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করবে, যে আদরে অসিত সহজেই শর্মিলার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসবে। আর তখন অন্য কোন কথা নয়, শুধু আচার আচরণে স্পষ্ট হয়ে যাবে—আর কোন বিরোধ নেই। এতদিন যা বিরোধ ছিল তার সব অবসান হয়ে যাবে।

কিন্তু এ সবই শর্মিলার জাগর স্বপ্ন বলা যায়। তার মানে এ রকমটি হলে মন্দ হতো না। কিন্তু কোথায় অসিত? বহু চেষ্টা করেও শর্মিলা অসিতের দেখা পায়নি। এমনভাবে সে কোন দিন কোন ছেলের কাছে হার মানেনি।

অফিসে কয়েকবার অসিতকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে শর্মিলা। অসিত শর্মিলার গলা শুনে রিসিভার রেখে দিয়েছে। অসিতের এই ব্যবহারে তার জেদ আরো বেড়ে গেছে। একবার শর্মিলার মনে হয়েছে অসিতের ওপর সে এমন প্রতিশোধ নেবে যে তা সে কোন দিন ভুলতে পারবে না। ব্যস্ ঐ টুকুই। কিন্তু শর্মিলা কিছুতেই প্রতিশোধ নিতে পারেনি। আসলে প্রতিশোধ নিয়েই বা লাভ কি? অসিতকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত কাছে পাওয়া দরকার। তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন। কথা বলতে পারলে আজকে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে—তার অবসান হবে। অসিত অন্তত শর্মিলার মনের অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে। তাতেই সব কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু অসিতের দেখা নেই। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল শর্মিলা অসিতের দেখা না পেয়ে বেশ হতাশবোধ করে। এতদিন তার একটা অহঙ্কার ছিল। আজ এই মুহূর্তে সে অহঙ্কার সব চুরমার হয়ে গেছে।

আজ শর্মিলা তাই অফিস না গিয়ে অসিতের অফিসে যাবে। তার মুখোমুখি হয়ে সব কিছুর একটা সুষ্ঠু সমাধান করবে। কাজেই মনে মনে যা ভাবা, তাই করে বসলো শর্মিলা।

সকাল থেকেই সে শুধু ক্ষণ গুণছে কখন বেলা দশটা বাজবে। কেননা দশটায় অসিতের অফিস শুরু হয়। প্রথম দিকে ওকে ধরতে পারলে যা বলার তা বলা যাবে। এ জন্য শর্মিলার মানসিক প্রস্তুতি ভোরবেলা থেকেই হয়ে আছে। তা

ছাড়া দেরী করে গেলে অসিত তো অফিসের কাজে বাইরে চলে যেতে পারে। অফিসে কোন জরুরী মিটিং থাকলে সেখানে আটকে যেতে পারে। এই সব ভেবে-চিন্তে একরকম মরিয়া হয়ে শর্মিলা অসিতের অফিসে গিয়ে যতটুকু যে সংবাদ সংগ্রহ করলো—তার সারমর্ম হলো: অসিত অফিসের কাজে ইস্তফা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার কোন একটা বিষয় মনোমালিন্য হয়েছিল। সে কারণে অসিত মজুমদার তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে। যদিও সে জানিয়েছে তার এই ইস্তফা দেওয়াটা তার শারীরিক কারণে, কিন্তু আসলে তা নয়। কোম্পানী আমদানি রপ্তানীর ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি করে থাকে, যা অসিতের মোটেই মনঃপূত নয়, এমন কি নৈতিক দিক থেকেও তার ঘোর আপত্তির কারণ ছিল। শুধু বিদেশীমুদ্রা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন নয়, সেই সঙ্গে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা দেখে অসিত মজুমদার তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ অসিতকে চাকরিতে ইস্তফা না দেবার জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করে এবং মাসিক মাহিনাও বেশ ভাল বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু অসিত মজুমদার তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। • সে অন্যায়ের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করেনি, আর করেনি বলেই শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে চলে এসেছে।

অসিত এখন কোথায় আছে এবং কি করছে সে সম্পর্কে অফিসের কেউই কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু আভাসে ইঙ্গিতে অফিসের লোকেরা বুঝিয়ে দিল যে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অসিত মজুমদার ভাল কাজ করেনি। এর জন্য তার অনেক ভোগান্তি আছে।

এ সব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগেনি শর্মিলার। অগত্যা সে অসিতের বাড়ি যাওয়াই মনস্থ করলো। বাড়ি অর্থে অসিত এখন যে এ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। এই অ্যাপার্টমেণ্টটি অসিত নিজেই দেখে শুনে কিনেছে। কাজেই কোম্পানীর হলে হয়তো অসিতকে এখুনি তা ছেড়ে দিতে হতো। এখন অবশ্য এই অ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, অবশ্য অসিত যদি না স্বেচ্ছায় অন্য কোন কারণে কোথাও না গিয়ে থাকে। কাজেই শর্মিলা আর কোন সময় নষ্ট না করেই অসিতের ঠিকানায় রওনা হয়ে গেল।

সাদার্ন এভিন্যুর ওপর বহুতল একটি বাড়িতে এই অ্যাপার্টমেণ্ট। সামনে লেক, এখন হালফিল যার নাম হয়েছে রবীন্দ্রসরোবর। লিফটে করে সাততলার ওপর এই অ্যাপার্টমেণ্ট-এ আসতে হয়। অ্যাপার্টমেণ্ট নম্বর ডি-৩। শর্মিলা 'ডি' ব্লকের তিন নম্বর ফ্ল্যাটে এসে বেল টিপতেই অসিত নিজেই দরজা খুলে দিল।

শর্মিলা অসিতের মুখোমুখি হয়ে কোন কথা বলতে পারলো না। এতক্ষণ ধরে সে কত কথাই না বলবে বলে মনে মনে ঠিক করে এসেছিল, কিন্তু অসিতকে দেখে তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হলো না।

দরজা খুলে দিয়ে অসিত বলল, ভেতরে এসো।

শর্মিলা ভেতরে এলো, কিন্তু এই মুহূর্তে সে যেন এক দণ্ডিত আসামী। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হচ্ছে না।

শর্মিলা এই অ্যাপার্টমেণ্টে বহুবারই এসেছে, কিন্তু তবু আজ তার মনে হয় এই-ভাবে আসাটা বোধ হয় ভাল হলো না।

সামনেই বসার জায়গা। আসলে এটি একটি প্রশস্ত ঘর, যা সিটিং কাম ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শর্মিলা অসিত কিছু বলার আগেই একটি কোচে গিয়ে বসলো।

অসিতের পরনে ছিল পাজামা আর পাঞ্জাবী। সেও শর্মিলার সামনে একটি কোচে বসলো।

অসিতই প্রথম কথা শুরু করলো। সে বলল, কেমন আছো?

শর্মিলা মুখে কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল: ভাল আছি।

এবার অসিত জিজ্ঞাসা করলো, আজ হঠাৎ কি মনে করে আমার কাছে এসেছো?

শর্মিলা এর উত্তরে বলল, বহু দিন তোমাকে দেখিনি তাই এসেছি।

শুধু দেখতে এসেছো?

হ্যাঁ অসিত। শুধু দেখতে এসেছি। ভেবেছিলাম তুমি আমার অন্তত খোঁজ নেবে, কিন্তু যখন দেখলাম, এ বিষয়ে তোমার কোন আগ্রহ নেই, তখন নিজেই ছুটে এলুম শুধু তোমাকে দেখতে।

অসিত শর্মিলাকে কি বলবে তা ঠিক করতে পারছিল না, অথচ তার মনে মনে শর্মিলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। আজ এই মুহূর্তে অবশ্য সে ক্ষোভের কোন চিহ্নমাত্র নেই। তবু শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কিছু করবে না বলেই অসিত খুব সহজ-ভাবেই বলল, একটু কফি খাবে তো?

শর্মিলা বলল, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে তোমার বাহন দিবাকরটি বোধ হয় নেই।

অসিত হেসে বলল, হ্যাঁ, দিবাকর দুদিনের জন্য দেশে গেছে। তবে আমি তোমাকে কফি করে খাওয়াতে পারি।

হবেখন্, বলে শর্মিলা এবার অসিতের পাশে উঠে এসে বসল। তারপর সে বলল, বহুদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি, কিন্তু কিছুতেই দেখা পাচ্ছি না। আজ তোমার অফিসেও গেছলাম। শুনলাম তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছো। অগত্যা তোমার এখানে এসে দেখা পেলাম।

অসিত বলল, কি জন্য তুমি আমাকে খুঁজছো ?

শর্মিলা বলল, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই বলে শর্মিলা চোখের জল আর সামলাতে পারল না। কান্নায় একরকম ভেঙ্গে পড়ল বলা যায়।

মেয়েদের এটা মস্ত বড় অস্ত্র। সময় বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে খুব কাজ হয়। তা ছাড়া শর্মিলার চোখে জল অসিত অন্তত কোনদিন দেখেনি। সে কল্পনাও করতে পারে না, শর্মিলার মত মেয়ে এমনভাবে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে।

অসিত শর্মিলার এই অবস্থা দেখে সে যে কী করবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবু সে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, ছিঃ এমনটি করতে নেই। তোমার কি হয়েছে বলতো ?

শর্মিলা প্রথমটা চুপ করে থাকে। তারপর সে ধীরে ধীরে অতি শান্ত গলায় বলল, অসিত ভালবাসার যে এত জ্বালা তা আগে আমি কোনদিন বুঝিনি। বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, তাই আজ আমি খুব অনুতপ্ত। শুধু এই কথাটুকু তোমাকে জানানোর জন্য আজ আমি এখানে এসেছি। তোমার কাছ থেকে আমি আজ আর কিছু চাই না। শুধু তুমি একটি বার আমাকে বলো যে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো।

সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল অসিতের। তাই সে সহজ ও হাল্কা করার জন্য কাছে টেনে নিল শর্মিলাকে। তারপর নিবিষ্ট মনে তাকে আদর করলো। গালে মুখে চোখে চুমু খেয়ে আদর করে বলল, ফরগেট এ্যাণ্ড ফরগিভ।

কানের সঙ্গে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল, য়ু আর মাইন, আই নীড য়ু।

শর্মিলার সারা শরীরে তখন শিহরণ। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শর্মিলা। এমনি-ভাবে অসিতের বাহু বন্ধনে নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দিতে চায় শর্মিলা। এতেই তার যা কিছু আনন্দ, এতেই তার ইচ্ছাপূরণ।

অসিত এবার শর্মিলার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, এতদিন জানতাম, তুমি পুরুষদের নিয়ে খেলা করতেই ভালবাসতে। এখন দেখছি তুমি

আর পাঁচটা মেয়ের মত পুরুষকে আপন করে পেতে চাও। তোমার মধ্যে নারী-সত্তার স্বরূপটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আজ যত তোমাকে দেখছি, ততই আমার মনে হচ্ছে এ বুঝি আমার আবিষ্কার। আবিষ্কারে যেমন আনন্দ থাকে, তেমনি থাকে রোমাঞ্চ।

শর্মিলা নিজেকে এতক্ষণে বেশ সামলে নিয়েছে। তাই সে বলল, কফি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। এসো তোমার কিচেন-এ যাই।

অসিত বাধা দিয়ে বলল, তুমি কেন? আমি তোমাকে বানিয়ে দিচ্ছি।

তা কখন হয়? এসব মেয়েদের কাজ।

এই বলে শর্মিলা উঠে দাঁড়াল।

অসিত বলল, দিবাকর নেই, তাই আমি ইলেকট্রিক্ কেট্‌ল-এ জল গরম করে নিই। তারপর কফি করাতো খুবই সহজ।

অগত্যা শর্মিলাই কফি তৈরী করে নিয়ে এল। অসিত ঘরে যা স্ন্যাক ছিল তাই এনে রাখল টেবিলে।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শর্মিলা বলল, জানো অসিত মাঝে মাঝে মনে হয় তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধি। ছোট সংসার, শুধু তুমি আর আমি।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ আমাকে অন্য কোন ধাতুতে গড়েছেন, যার ফলে আমার মধ্যে সহনশীলতা বা ধৈর্য বলে কোন কিছু নেই। তাই তোমার গৃহিণী হবার লোভ থাকলেও সাহস পাই নে। তোমাকে হারাবার ভয় হয়। যা পাই তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি।

অসিত এবার বলল, তুমি ঘর বাঁধার মেয়ে নও। তোমার ইচ্ছেটা মাঝে মধ্যে তোমাকে খুব জেদী করে তোলে। তারপর যে মূহূর্তে তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায়—সেই মূহূর্তে তুমি হয়ে ওঠো অন্য জাতের মানুষ। পুরুষ সম্পর্কে তোমার ধ্যান-ধারণাও অন্যরকম। কদাচিৎ তা কোন মেয়ের সঙ্গে মেলে। আসলে তুমি নিজের বিষয় এত সচেতন যে অন্য কারুর মতামতকে মোটেই আমল দাও না। সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক।

শর্মিলা বলল, দোহাই অসিত, আজকের দিনটায় কোন তর্কাতর্কি নয়। জ্যামিতিতে বলা আছে: দুটো সরলরেখা কখন মেলে না। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে দুটো সরলরেখা খুব কাছাকাছি থাকতে পারে, এমন কি গায়ে গায়ে থাকলেও কোন দোষ নেই। শুধু পৃথক সত্তা, হয়তো বা সাদা চোখে দেখা যায় না।

অসিত বুঝতে পারে শর্মিলা কী বোঝাতে চাইছে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এ সব

নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না। তাই সে চুপ করে থাকে। অসিতকে চুপ করে থাকতে দেখে শর্মিলা বলল, কি হলো? চুপ করে কেন?

তোমার কথা শুনছি। তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

এরপর অন্য প্রসঙ্গে আসার জন্য অসিত জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা কেমন আছেন?

মা? ভালই আছেন। আমার কাছে এখন আর থাকেন না।

কোথায় থাকেন?

শর্মিলা বলল, পুণে। দিলীপ মামার সঙ্গে আছেন।

অসিত বলল, দিলীপ মামা কি পুণে থাকেন?

না। ওখানে উনি ভগবান রাজনীশের ধাঁচে একটি আশ্রম করবেন হয়তো। এতদিনে হয়তো অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে।

তা মাসীমা হঠাৎ ওই আশ্রমে যেতে গেলেন কেন?

তা জানি না। তবে দিলীপ মামার অনুরোধে মা গেছেন।

অসিত জিজ্ঞাসা করল, এই দিলীপমামা কি তোমার নিজের মামা?

শর্মিলা বলল, রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ছোটবেলা থেকেই ওঁকে মামা বলে ডেকে আসছি। বাবা মারা যাবার পর উনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। আমাদের দুঃখের দিনে দিলীপমামা আমাদের জন্য সবই করেছেন। তিনি যদি না থাকতেন তবে আজ হয়তো আমাদের অস্তিত্ব বলেই কিছু থাকত না। দিলীপমামা অকৃতদার এবং পরোপকারী ব্যক্তি। একসময় স্বদেশী করে জেল খেটেছিলেন। পরবর্তী জীবনে একটি বিদেশী সরকারী অফিসে চাকরী করতেন। এই মাস ছয়েক হবে অবসর গ্রহণ করেছেন। মার সঙ্গে দিলীপমামার আলাপ খুব ছোটবেলা থেকেই। আমার বাবার সঙ্গেও দিলীপমামার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এখন আমি বড় হয়েছি, চাকরিবাকরি করি, কাজেই মা হয়তো খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। তাই দিলীপমামার সঙ্গে একটা কিছু কাজের মধ্যে থাকতে চান বলেই গেছেন। আমিও মাকে যেতে দিয়েছি। তার কারণ কী জানো অসিত, তা হচ্ছে মা যদি শেষ জীবনে একটু সুখী হতে পারেন, তাতে আমার কিছুতেই বাধা দেওয়া উচিৎ নয়। কেননা আমি আর মাকে কতটুকু সুখীই বা করতে পারবো? তার চেয়ে দিলীপমামা অনেক অনেক বেশী সুখী করতে পারবেন। তা ছাড়া আমার রাঙামাসির একটা কথা আমার কানে আজও বিঁধে আছে। একদিন মা ও রাঙামাসির মধ্যে কী যেন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। রাঙামাসি

মাকে বলেছিলেন, দেখ ছবি, ছোটবেলার ভালবাসা সহজে ভোলা যায় না।

আমার রাঙামাসি খুব বিজ্ঞ না হলেও খুব বিচক্ষণ ছিলেন। আর মার ডাক-নাম ছবি ছিল বলে মা সেই মুহূর্তে ছবির মত স্থির, অচঞ্চল হয়ে গেছলেন। অনেকটা আজকের দিনে সিনেমার ভাষায় যাকে বলে 'ফ্রীজ সট্', ঠিক সেই রকম। তবু আমি বলবো, আমি আমার মাকে সত্যি খুব ভালবাসি। আর মাকে ভালবাসি বলেই দিলীপমামাকেও ভালবাসি। তাঁকে কোনক্রমেই আমার পর বলে মনে হয় না। মনে হয় দিলীপমামা আমার বড় আপনজন।

আজ মা নেই, আমিও তাই সাত সপ্তাহের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

অসিত এতক্ষণ সব কিছুই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। শর্মিলার এই কথায় সে জিজ্ঞাসা করল, বাইরে কোথায় যাচ্ছ?

শর্মিলা বলল, লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, টেক্সাস, কানাডা, ইটালি। এ ছাড়াও যদি সময় ও সুবিধে হয় তাহলে কনডাকটে্ড ট্যুরে আরো কয়েকটা দেশ ঘুরতে পারি। আমার সব কিছু ঠিক আছে। আজ সোমবার আর আগামী বুধবার আমি বিদেশ পাড়ি জমাবো।

উইস্ ইয়োর গুডলাক্। বলে অসিত একটা সিগারেট ধরাল।

তারপর সেই সিগারেটের ধোঁয়া কিছুটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ওদের দুজনের মাঝখানে জমাট হয়ে রহিল।

শর্মিলা বলল, ব্যস্, আর কিছু না?

অসিত বলল, তোমাকে শুভেচ্ছা জানালাম। অর্থাৎ তোমার শুভকামনা করলাম। এর বেশী কি চাও।

কিছু না। বলে শর্মিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শর্মিলার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে অসিত। আগের শর্মিলার সঙ্গে এ শর্মিলার অনেক প্রভেদ। সে কিছু বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। এতদিন ওকে আবেগের বশে কিছু করতে দেখা যায়নি। কিন্তু এখন ও যেন সব বিষয়ে আবেগতাড়িত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শর্মিলা বলল, চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেন?

ভাল লাগল না তাই।

খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল অসিত। কিন্তু এই উত্তর যে যথেষ্ট নয় এবং শর্মিলার কাছে এ কথা যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা জেনেই অসিত ওই কথা বলেছে।

এখন কি করবে ভেবেছো?

আর চাকরি নয়। এইটুকু তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে পারি।

তাহলে কি ব্যবসা শুরু করবে?

তাও ভেবে দেখিনি। তবে আর কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। আমি ক্রমেই প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী হয়ে উঠছি। কাজেই সে প্রতিষ্ঠানিক হোক বা ঘরগেরস্থালি হোক—সবেরই বিরোধীতা করা এখন আমার স্বভাব ধর্ম।

শর্মিলা বুঝতে পারে অসিতের মনে ঝড় বয়ে গেছে। এখন তার রেশ আছে। তাই আর এ বিষয় নিয়ে সে কোন কথা বাড়াল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা করার জন্য বলল, দিবাকর তো নেই তোমার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করছো?

বাইরে থেকে খাবার দিয়ে যাবে। দিবাকর যে কদিন না আসে আমি সেই রকম ব্যবস্থা করেছি।

বাইরে থেকে মানে? তোমার ওই ওয়ালিউল্লা লেন বা রিপন স্ট্রীটের প্রাইভেট 'কিচেন্ ফুড' খানা কুলি দিয়ে যাবে নাকি?

না না। পার্ক স্ট্রীটের বেশ নামকরা রেঁস্তোরার খাবার।

শর্মিলা বলল, তার চেয়ে চলো না দুজনে কোথাও লাঞ্চ সেরে আসি।

তোমার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে লোভনীয়, তবে আগে থেকে বলা আছে। এখন তা বদলাতে গেলে লাভের চেয়ে লোকসান হবে বেশী।

এই কথা বলে অসিত মিট মিট করে হাসতে লাগল।

শর্মিলা বলল, তুমি আজকাল লাভ লোকসান খুব খতিয়ে দেখতে শিখেছ।

তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। তবে আগে থাকতে যদি এ বিষয়ে একটু সচেতন হতাম, তাহলে আজকে আমার অবস্থার আরো হেরফের তোমার নজরে পড়তো।

শর্মিলা বলল, এটা আমার কমপ্লিমেন্টস কিনা জানি না, তবে আমার এখন খিদে পেয়ে গেছে।

অসিত আর ভণিতা না করেই বলল, 'ওয়ালড্রফ্' থেকে খাবার পাঠাবে, তাতে নিশ্চয় তোমার ও আমার দুজনের মধ্যাহ্ন ভোজন ভালই হবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি এসেছ আর তুমি খেয়ে যাবে না, তা কখন হয়? আমি তো তোমার সামনেই ফোনে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

শর্মিলা বলল, তুমি ফোনে কথা বলছিলে দেখেছি, তবে কাকে করছো, আর কি কথা বলছো সেদিকে তত নজর করিনি। তা ছাড়া ইংরিজিতে যাকে বলে 'এথিকস্' বা 'ম্যানার'—এ দুটোই আমি অন্তত খুব মেনে চলতে চেষ্টা করি। কাজেই তুমি

যখন ফোনে কথা বলছিলে তখন তোমার কথা শোনার মত কোন কৌতূহল জাগেনি।

অসিত ও শর্মিলা যখন এইসব কথা বলছে ঠিক তখনই বাইরের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

অসিত দরজা খুলতে দেখল : 'ওয়ালড্রফ্' থেকে লোক এসেছে খাবার নিয়ে।

বেয়ারাকে খাবার টেবিলে কেরিয়ার ছুটো রাখতে বলল অসিত।

তারপর বেয়ারাটা খাবার রেখে অসিতকে একটা সেলাম ঠুকে চলে গেল। মুখে সে কোন কথাই বলল না।

বেয়ারা যখন খাবার রেখে চলে গেল তখন অসিত দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল, এসো খাওয়া যাক। তুমি বলছিলে খিদে পেয়েছে।

শর্মিলা উঠেই অসিতকে তার চিরাচরিত পদ্ধতিতে আদর করে বলল, য়ু আর রিয়েলি সুইট অসিট্।

মডার্নে পড়া মেয়ে শর্মিলা। আদব কায়দা ও পুরুষ মানুষকে বাগে আনার পদ্ধতিতে সে সিদ্ধহস্ত বলা যায়।

একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ—এ শর্মিলার আশাতীত ছিল। তাছাড়া অসিত যে ক্রমেই সহজ হয়ে যাবে তা সে আশাও করেনি। তারপর যখন সে দেখল বা বুঝতে পারল অসিতের কোন রাগ নেই, তখন সে সত্যি খুব খুশিতো হলো, উপরন্তু এখন সে মনে মনে নিজেকে সুখী মনে করতে লাগল।

তারপর ছুজনে মুখোমুখি না বসে পাশাপাশি বসল। যেন বহুদিন পরে ছুজনে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। আর এমন সব খাদ্য অসিত আনিয়েছে—যা শর্মিলার খুব প্রিয়। খাদ্যদ্রব্যাদির স্বাদ গন্ধ শর্মিলা খুব ভাল করেই উপভোগ করছে। সহজ ও সরল ভাষায় যাকে বলা যায় তারিফ্ করছে। অবশ্য অসিতও যে পছন্দ করে না, তা নয়। সেও খুব ভালবাসে। আগে তো অসিত ও শর্মিলা কলকাতার দামীদামী সব রেঁস্তোরায় খেয়ে বেড়াত। কাজেই একজন অপরজনের পছন্দ অপছন্দ খুব ভাল করেই জানে। চিকেনের সব কিছুই ভাল লাগে শর্মিলার।

খেতে বসে কত না উচ্ছ্বাস। অসিতেরও এই খাওয়া, শর্মিলার আসা সব কিছু যেন আজ বেশী করেই ভাল লাগছে। আর শর্মিলার তো ভালই লাগবে। কেননা সে তো অসিতের কাছে যখন এসেছিল তখন যেন সে একজন দণ্ডিত আসামী। আর এই মুহূর্তে ওরা ছুজনেই যেন ছুজনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই ওদের সব কিছুর মধ্যে একটা অনাবিল আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। যখন খাওয়া

শেষ হলো তখন দেখা যায় ওদের মধ্যে পরিতৃপ্ত ভাব। শর্মিলা নিজেই খাবার টেবিল থেকে সব কিছু সরিয়ে পরিষ্কার করে দিল।

অসিত বলেছিল, তুমি অতিথি, এ সব কাজ তোমাকে করতে নেই।

শর্মিলা তার উত্তরে বলেছিল, এটা মেয়েদের কাজ। কাজেই তুমি আমাকে এ কাজে বাধা দিও না।

অসিত আর কোন কথা বলেনি। যখন খাওয়া দাওয়ার পাট সব চুকে গেল তখন শর্মিলা নিজেই বিছানায় তার দেহটা এলিয়ে দিল। অসিত বিছানার ধারে একটি ফোল্ডিং আরাম কেদারায় বসে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করছে। মনে মনে সে ভাবছে একটা মেয়ের উপস্থিতিতে কেমন সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে। কেমন যেন একটা শ্রী ফিরে আসে ঘরে ; এমন কী সবকিছুর মধ্যে ভাললাগার ছোঁয়াচ সংক্রামিত হয়ে যায়।

অসিত মুখ ফুটে কোন কথা বলে না, শুধু মনে মনে এই সব ভাবে আর তার আমেজ অনুভব করে। বহুদিন পরে তার মনটা এমনি ভাললাগার সীমানায় এসে থমকে যায়।

হঠাৎ শর্মিলার দিকে নজর পড়তে অসিত দেখে শর্মিলা এক মনে শুধু তাকে দেখছে। এমন ভাবে সে বিছানায় শুয়ে আছে—যাতে অসিত প্রলুব্ধ হয়। স্বচ্ছ শাড়ির আবরণে তার দেহের প্রতিটি রেখা, তার অবয়ব কাম-চিহ্নিত বলে মনে হয়। কিন্তু অসিতের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে অগত্যা শর্মিলা অসিতকে বলল, এই শুনছো···

কি ?

এখানে এসো একটা কথা আছে।

শর্মিলার কণ্ঠস্বর খুব অস্পষ্ট মনে হলো।

অসিত কোন কথা না বলেই শর্মিলার খুব কাছে গিয়ে বসলো। শর্মিলা অসিতকে কাছে পেয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, খুব ইচ্ছে করছে। প্লীজ, ভীষণ ইচ্ছে করছে।

অসিত তবুও মুখফুটে কোন কথা বলে না।

শর্মিলা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যেমন প্রবল জলস্রোত এসে সব কিছু ভাসিয়ে দেয়, অনেকটা সেইরকম আবেগের স্রোতে মুহূর্তের মধ্যে শর্মিলা ও অসিত দুরন্ত উচ্ছ্বাসে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে পরম ও চরম এক আনন্দকে আস্বাদন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শর্মিলা এমন ভাব দেখায় যেন

দীর্ঘদিন সে অভুক্ত থাকার জন্য সে এই মুহূর্তে পরিপূর্ণ কিছু একটা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। দুজন নর-নারী স্বাভাবিক কারণে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অসিত শর্মিলাকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্পেষিত করতে চায়। ঘন ঘন উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে শর্মিলার দেহে তাপ বিকিরণ হতে দেখা যায়। ঠিক এই মুহূর্তে অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার জন্য দুজনেই যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন আর অন্য কোন কথা নয়। আনন্দ, শুধু আনন্দ। শরীরের শিরায় শিরায় সে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। দুজনেই একই সঙ্গে অনুভব করে আনন্দ। পরম এক অনুভূতি ওদের সারা শরীরকে আচ্ছন্ন করে রাখে দীর্ঘ সময়। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দুটি দেহ প্রকৃতির নিয়মে হয়ে যায় পৃথক দুটি সত্তা। কিন্তু কিছু পরে দেখা যায় শর্মিলা অসিতকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। অনেকটা যেন অক্টোপাশের মত।

দুজনে কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছে না। বোধ হয় কথা বললে আমেজটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক এই জন্য, শুধু এইটুকু পাবার জন্যই শর্মিলা আজ অসিতের কাছে এসেছিল। পেয়েছে শর্মিলা অসিতকে নিঃশেষ করার অধিকার। তবু তার মনে হয়ঃ 'ওয়্যান্‌স্‌ ইজ নট ইনাফ্‌'। অর্থাৎ একবারই যথেষ্ট নয়। তার মানে শর্মিলার মনে হয়—আর একবার হলে ভাল হয়। তাই তার অসিতকে ছাড়তে মোটেই ইচ্ছে করে না।

শর্মিলাতো বহু পুরুষের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু অসিতের মতন কেউ নয়। ওর মধ্যে অদ্ভূত এক আকর্ষণ-শক্তি আছে। তা ছাড়া ওর আচার আচরণ পদ্ধতি সব কিছুই শর্মিলার কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়। অসিতকে তাই শর্মিলার বেশী পছন্দ। অসিতের সঙ্গে যে আনন্দ পাওয়া যায় অন্য কারুর সঙ্গে তেমনটি পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যায় না বলেই শর্মিলা অসিতের দেহাশ্রিত হয়ে সে দিনটি কাটিয়ে দিল। আর ওই যে ক্ষুধা, তা সহজে নিবৃত্তি হবার নয়। তাই বার বার মনে হয় শর্মিলারঃ 'একবারই যথেষ্ট নয়।'

কথাটা ওর মনের কথা। কামনা চরিতার্থের পক্ষে এ কথার যেমন গভীরতা আছে, তেমনি শক্ত হচ্ছে তার ব্যঞ্জনা। বিষয়টা হৃদয়ঘটিত হলেও দেহের কিন্তু বিরাট ভূমিকা আছে। তাই দেহমন এক না হলে ভালবাসা চরিতার্থ হয় না।

শর্মিলা সোমবার সকালে এসে তার পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরে তার বাড়ি ফিরে যায়। যাবার সময় অসিতকে আদর করে বলেছিলঃ মাই সুইট অসিট। তোমার তুলনা শুধু তুমি।

শর্মিলা সেই জাতের মেয়ে—যারা পুরুষ মানুষকে শয্যাসঙ্গী হিসাবে শুধু

প্রয়োজন বোধ করে, তার বেশী আর কিছু নয়। কাজেই যাবার আগে শর্মিলা অসিতকে যা বলে গেল, তার মধ্যে কতটুকু সততা তা কিন্তু ভাববার বিষয়।

।১৩।

শর্মিলা চলে যাবার পর অসিতের মনটা খুব মুষড়ে পড়েছিল। তার মনে হয়েছিল—শর্মিলা খুব জেদী ও আত্মপরায়ণ। যা কিছু তার প্রয়োজন সে তা জোর করে আদায় করতে জানে। জীবনকে উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা তার কখনই তৃপ্ত হয় না। ...ই জীবনের সব কিছু বিষয়ে তার কৌতূহলের শেষ নেই। সামান্য একটু ...ানন্দ পাবার জন্য শর্মিলা উচ্ছল হয়ে ওঠে। জীবনবিলাসী শর্মিলার এই ...বশিষ্ট্য যেন আজ অসিতের মনকে বেশী করে নাড়া দিয়ে যায়। মনে পড়ে ...র্মিলা সেনের সুগঠিত দেহে প্রাণের বন্যা যেন বাঁধা পড়ে আছে।

শর্মিলা এখন লণ্ডন কিম্বা প্যারিসে, তবু অসিতের মন থেকে তার একটি রাত্রির ...ন্তরঙ্গতার ঘটনা যেন কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। বার বার তার কথা মনে ...ড়ে, আর সেই সঙ্গে দেখা যায় চিত্তচাঞ্চল্য। কেন এমনটা হলো তা অসিত ...ছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে কত কিছু করবে বলে অসিত মনে করেছিল, কিন্তু শর্মিলার ...াবির্ভাবের পর অসিতের সেই সব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যেতে চলেছে।

অসিত নিজের মনেই বলে ওঠে: না না, এসব প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। ...র্মিলার মনোভাব তো অসিতের কাছে খুবই স্পষ্ট। সে তো পরিষ্কার বলে থাকে: ...ষকে সে শয্যাসঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। তার বেশী পুরুষের কাছ থেকে সে ...র কোন কিছু প্রয়োজনবোধ করে না।

যে মেয়ে এ কথা বলে, তার জন্য কোন আশা করা উচিত নয়। তার জন্য ...ন ক্ষোভ নয়। শর্মিলা হচ্ছে এক জাতের রানী মৌমাছি। ওরা নিজের ...ং আর নিজের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। এদের জীবনে পুরুষের ...কা গৌণ। কোন আন্তরিকতা নেই, আছে শুধু অন্তর্দাহ।

এমনি অনেক কথাই আজ মনে পড়ে অসিতের। হঠাৎ এমন সময় দিবাকর

এসে একটা চিঠি দিয়ে যায় অসিতকে। চিঠিটি ডাকে এসেছে, খামের ওপর পুরী ডাকঘরের ছাপ।

অসিত চিঠিটি খুলেই পড়তে শুরু করে। 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম' থেকে চিঠিটি লিখেছেন পরমানন্দ।

ভাই বাচ্চু,

আশা করি তোমার সব কুশল। তোমাকে একটা দুঃসংবাদ জানাচ্ছি যে তোমার নিরুমাসি গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। তিনি সত্যি খুব পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তা না হলে এই শ্রীক্ষেত্রে তাঁর জীবনাবসান হতো না। মৃত্যুর কারণ অবশ্য 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক'। আশ্রমিকরা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেছিলেন এবং আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ শবানুগমন করেন। নামসংকীর্তন ও শাস্ত্রীয়মতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আমরা নিরুপমা দেবীর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আর একটি বিষয়ে তোমাকে জানাচ্ছি যে আমাদের আশ্রমের দেবলীনা ও রুক্মিণী নামে দু'জন বিদেশিনী শিষ্যা কারুকে কিছু না বলেই আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছেন। কেন যে ওঁরা আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন তা জানি না, তবে আমার অনুমান ওঁরা বোধ হয় আশ্রমের শৃঙ্খলা বা অনুশাসনকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি, কিম্বা বৈষ্ণব ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। দেবলীনার জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছি। তোমাকে অনুরোধ—তুমি যদি কলকাতায় ওঁদের কোন সন্ধান পাও, তাহলে আমাকে অন্তত সে খবরটা জানিও।

ওঁদের আশ্রম ত্যাগের জন্য আমি যে খুব বিচলিত তা নয়, তবে এই ভেবে চিন্তিত যে ওঁরা যদি কোন বিপদে পড়েন বা কোন দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়ে যান, ইজ্জত খুইয়ে বসেন, তবে তা নিশ্চয় খুব পরিতাপের বিষয় হবে।

তুমি যে সেই চলে গেলে—তারপর তোমার আর কোন খবর নেই। তাই তোমাকে চিঠি লিখে সব বৃত্তান্ত জানালাম। যদি পার তো চিঠির উত্তর দিও।

প্রীতি নিও। শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—

দীনসেবক

পরমানন্দ গোস্বামী

পুনশ্চ: আমাদের আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে মৌনব্রত পালন করছেন। সে কারণে আমার ও রঙ্গাবতীর ওপর অনে

কাজের দায়িত্ব এখন বর্তেছে।

চিঠিটা পড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় অসিত। নিরুপমার মৃত্যু সংবাদে সে যে দুঃখিত না হয়েছে তা নয়, তবে দেবলীনার আশ্রম ত্যাগের কারণটা তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। রুক্মিণীকে অসিত ভাল করে চেনে না এবং তার বিষয় সে কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু দেবলীনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে অসিতের মনে একটা ধারণা হয়েছিল যে দেবলীনা এই আশ্রমের পরিবেশে বেমানান। ওর মধ্যে কী যেন যাদু আছে। দেখে ভাল লাগল। এক কথায় যাকে বলে মুগ্ধ হলো। মনে মনে ভালবেসে ফেলল, কিন্তু মুখে সে দিন কোন কথাই বলতে পারেনি অসিত।

প্রথম সুযোগেই অসিত শুধু দেবলীনাকে বলেছিল : যদি কোন দিন কলকাতায় আসো, তবে আমার সঙ্গে দেখা করো।

দেবলীনা এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হেসেছিল।

এরপর অসিত কলকাতায় ফিরে এসেছে। নানা কাজের মধ্যে দেবলীনার কথা মনে পড়েনি। ক্ষণিকের দেখা তা ক্ষণস্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজ পরমানন্দর চিঠি পড়ে দেবলীনার কথা তার বেশী করেই মনে পড়তে লাগল।

মনে পড়ে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

"লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড!
গণ্ডযুগ শোভে মধূক অখণ্ড ॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কহ্নাঞি ॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধর ॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল ॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে ॥

গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল ॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জর হরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥"

পদকর্তা চণ্ডীদাস শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে।

"দেব সরোবরে তোমার লাবণ্য হচ্ছে জল, কুন্তল শৈবাল, আর বদন পদ্ম। তাতে অলক রূপ ভ্রমর শোভা পাচ্ছে। তোমার নয়ন যেন নীলকমল, আর নাসিকা মৃণাল দণ্ড। তোমার গণ্ড যুগলে অখণ্ড মহুয়া ফুল শোভা পাচ্ছে! সুন্দরি রাধা, তুমি সরোবরময়ী। দুঃসহ বিরহ জ্বরে তোমার কানাই জর জর হল। তোমার হাস্য কুমুদ, দন্ত হচ্ছে পুন্নাগ ফুলের মত, আর ব্যক্ত অধর দেখলে মনে হয় যেন বান্ধুলি ফুল ফুটে আছে। তোমার বাহু মৃণাল, আর করতল তো রক্তপদ্ম। তোমার অপরূপ স্তনদ্বয় যুগল চক্রবাক, আর নাভিস্থানে ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। অর্থাৎ না কোরক, না প্রস্ফুটিত। তোমার ত্রিবলী ঘাটের স্বর্ণনির্মিত সোপান। গুরু নিতম্ব যেন সরোবর ঘাটের পাট শিলারূপে বিদ্যমান। বিধাতা শোভিত জঘনে স্বর্ণপাট আরোপণ করেছেন। গুরু উরু যুগল যেন মৃণালদণ্ড, আর তোমার পদদ্বয় হেমকমল। তাতে নূপুররূপ ভ্রমর সুললিত রব করছে। তোমাকে ছাড়া আমার বিরহ স্বর দুরীভূত করার আর কোন উপায় নেই।" বাসলীকে শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাহেন।

অসিত দেবলীনার কথা যেন আজ বেশী করে ভাবে। সর্বস্বত্যাগ করে যে মেয়ে আজ সন্ন্যাসিনী হয়েছে, আজ তাকে কামনা করা শুধু অন্যায় নয় অনৈতিক বলে মনে হয় অসিতের।

পৃথিবীতে এমন কিছু মেয়ে আছে যাদের দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। দেবলীনা হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে।

অসিতের মেয়েদের প্রতি তেমন কোন আসক্তি নেই। শর্মিলা সেনের সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তা হচ্ছে এক ধরনের অভ্যাস। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। যা কৈশোরে গড়ে উঠেছে, যৌবনে তার পূর্ণতা না বলে বলা যায় ব্যাপ্তি।

এখানে প্রেম ভালবাসা বলে কিছু নেই। জৈবিক প্রয়োজনে শুধু সাময়িক

উত্তেজনাকে প্রশমিত করা। শর্মিলা যেখানে শক্তি অসিত সেখানে শাক্ত। এখানে কোন প্রক্ষোভ নেই, নেই কোন প্রত্যাখ্যান। যা কিছু সবটাই প্রকৃতিগত।

দেবলীনার রূপ আছে, যৌবন আছে। তবে কেন সে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে এসে সন্ন্যাসিনী হল? এর কোন যথার্থ উত্তর পায় না অসিত।

কিন্তু দেবলীনার সঙ্গে বৈষ্ণব পদকর্তার শ্রীরাধার রূপ বর্ণনার কোথায় যেন সে একটা মিল খুঁজে পেয়েছে। তার মনে হয় দেবলীনার রূপ তো নয় যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

তাই তার অতীত জীবন ও আশ্রমত্যাগের প্রকৃত কারণ জানার দুর্নিবার ইচ্ছা জেগে ওঠে। বড় অস্থির হয়ে ওঠে অসিত।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অসিত দেবলীনার অন্বেষণে। কিন্তু কোথায় সে যাবে? শহর কলকাতার ভিড়ে দেবলীনাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

অসিত প্রথমেই খোঁজ করে ইস্কনের কলকাতা কেন্দ্র থ্রি, এ, অ্যালবার্ট রোডে। গেটের মাথায় লেখা 'রাধা রাসবিহারী মন্দির।' সেকেলে ধরনের একটা বাড়িতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সমিতির কেন্দ্র। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই সে দেখতে পেল ডান দিকের বড় ঘরটিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। ওইখানে দেখা হয়ে গেল সৎস্বরূপ দাস অধিকারীর সঙ্গে। তিনি অসিতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন পিছনের দিকের বারান্দায়। একটি মাদুর পেতে বসতে দিলেন অসিতকে। এই সৎস্বরূপ দাস অধিকারী হচ্ছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সমিতির মুখপত্র 'ব্যাক টু গড হেডের' সম্পাদক। কথায় কথায় তিনি জানিয়ে দিলেন: সুদূর 'ডালাস' থেকে তিনি কলকাতায় এসেছেন। মায়াপুরে চন্দ্রোদয় মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গেছে। সেখানে বহু ভক্ত আছেন। একদিন আসুন মায়াপুরে। কলকাতা থেকে আমাদের বাস আছে। ইচ্ছে করলে আপনি সেই বাসে যেতে পারেন। সামান্য খরচে আপনি মায়াপুর যেতে পারেন। তারপর একদিন বা দুদিন আমাদের অতিথিশালায় থেকে সব কিছু দেখে আসবেন।

অসিত মুখে কোন কথা বলে না। শুধু চারিদিক সে দেখতে থাকে। এখানে সকলেই প্রায় মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়াধারী, নগ্নপদ বিদেশী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ঘোরা ফেরা করছেন। পুরুষদের মধ্যে বেশীর ভাগই গেরুয়া বসনধারী, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যেমন দেখা যায় ছাপাশাড়ি, আবার গরদ, তসর শাড়ি রয়েছে তাদের পরিধানে। এদের একজনের নাম শোনা গেল রুক্মিণী দাসী।

অসিত এই নাম শুনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর কপালে সিন্দুর বিন্দু এবং তাঁর কোলে একটি শিশু তারও মুণ্ডিত মস্তক। শ্বেতচন্দনের তিলকের পরিবর্তে এই বিদেশিনীর কপালে সিন্দুর বিন্দু কেন? এ প্রশ্ন অসিত করেনি এবং রুক্মিণী নাম শুনে তার মনে যতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁকে দেখে ঠিক ততোধিক নিরুৎসাহিত হয়েছিল।

এখানে জয়পতাকা স্বামী, পূর্ণপ্রজ্ঞাদাস এমন অনেক ভক্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু অসিতের এখানে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য দেবলীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। হঠাৎ সৎস্বরূপ বললেন, আমার সন্ধ্যে আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে। আপনি এসেছেন যখন তখন আমাদের সন্ধ্যারতি দেখে যান। তারপর প্রসাদ খেয়ে যাবেন। এই কথা বলে সৎস্বরূপ উঠে চলে গেলেন।

অসিত তাকিয়ে দেখে মন্দিরের দরজা খুলে গেছে। এখানে দেখতে দেখতে দেশী ও বিদেশী ভক্তদের সমাগম বেশ লক্ষণীয়। অসিত লক্ষ্য করে: যুগল রাধাকৃষ্ণের মূর্তির মুখে হাসি। পাশে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি। দেয়ালে প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং করা শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর প্রতিকৃতি।

অসিত আরও লক্ষ্য করে এই শ্রীমৎ এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চৈতন্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সারা বিশ্বে আজ কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু কেন্দ্র। সন্ধ্যারতির পূর্বে দেখা গেল যোগাসনে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী পূর্ণপ্রজ্ঞা। তিনি ধ্যানস্থ। বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে কৃষ্ণনাম জপ করছেন।

এদিকে পর্দার আড়ালে মাথায় ঘোমটা দিয়ে কয়েকজন বিদেশিনী পূজোর যোগাড় করছেন। কেউবা চন্দন ঘষছেন, আবার কেউবা বঁটির ওপর উবু হয়ে বসে ফল কাটছেন। নৈবেদ্যর আয়োজন করছেন।

শুরু হলো পূজা, তারপর সন্ধ্যারতি। শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল ইস্কনের রাধাকৃষ্ণের মন্দির। ধূপ ধুনার গন্ধে একটা পবিত্র ভাব মনে উদয় হয়। মনে হয় সব কিছু যেন পবিত্রিত। বিদেশিনীরা ফল কাটছেন, ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, আবার সকলে মিলে উর্দ্ধে বাহু তুলে নেচে নেচে নামগান করছেন। সঙ্গে শ্রীখোল ও করতাল বাজছে।

অসিত শেষ পর্যন্ত সবই দেখল। নামকীর্তন শেষ হতে সবাই ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করলেন।

অসিত আসার সময় সৎস্বরূপ দাস অধিকারীকে বলল, বড় ভাল লাগল।

সৎস্বরূপ বললেন, মায়াপুরে গেলে আরো ভাল লাগবে। দেখবেন সেখানে সবাই কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে আছে।

অসিত বলল, আমি কালই যেতে ইচ্ছা করি।

সৎস্বরূপ বললেন, বেশতো কাল সকাল আটটায় এখানে আসুন আমি আপনার যাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

অসিত হাতযোড় করে নমস্কার করতে সৎস্বরূপ বললেন, হারে কৃষণ, হারে কৃষণ।

অসিতও তার প্রতিধ্বনি করে তখনকার মত অ্যালবার্ট রোডস্থ ইস্কনের কেন্দ্র থেকে বিদায় নিল।

বাইরে গাড়িতে বসে অসিত ভাবল: নিশ্চয় দেবলীনা মায়াপুরে আছে। কেন জানিনা অসিতের মন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। গাড়ি স্টার্ট করে সে যখন তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছল তখন তার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেবলীনা। কেন এমনটি হলো তা সে নিজেই জানে না। যে মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়নি, যে মেয়ে তাকে হৃদয়ের অনুচ্চারিত বেদনার কথা প্রকাশ করেনি, তার জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? এর কোন সদুত্তর দিতে পারবে না অসিত। তবু তার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটার মূলে আছে দেবলীনার একটি কথা। সে কথাটি খুব স্পষ্ট না হলেও বেশ ইঙ্গিতবহ।

অসিত যেদিন কলকাতায় ফিরবে ঠিক তার আগের দিনের কথা সন্ধ্যারতি হচ্ছে। দেবলীনা অসিতের পাশে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে। কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত সন্ধ্যা। অসিত নিজের মনে বলেছিল: এভাবে জীবন নষ্ট করছো কেন?

দেবলীনার কানে কথাটা কি ভাবে যেন যায়।

এর উত্তরে দেবলীনা বলেছিলেন, তুমি একটা কিছু করো না, আমি তোমার পাশে থাকব।

এ কথা শুনে অসিত দেবলীনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। তার সারা শরীর তখন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

ব্যস। এইখানেই সব শেষ, আর এই ছিল শেষ কথা। তারপর আর কোন কথা হয়নি।

আজ আবার সেইকথা মনে পড়েছে অসিতের। দেবলীনার অন্তর্ধানের পর সেই কথাটি বিশেষভাবে অসিতের মনকে নাড়া দিতে থাকে। তাই তার এই

অন্বেষণ।

রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে পরের দিন সকালে অসিত পূর্বব্যবস্থামত শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর কাছে নদীয়া জেলায় শ্রীধাম মায়াপুরে আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সোসাইটির চন্দ্রোদয় মন্দির। প্রাচীরের গায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণবন্ত আঁকা ছবি।

অসিত যখন মায়াপুর পৌঁছল তখন বেলা প্রায় এগারোটা হবে। সামনে সবুজ বাগিচা। নানা ফুলের সেখানে সমাবেশ। প্রথম যাঁর সঙ্গে অসিতের দেখা হলো তাঁর নাম পাণ্ডু দাস। আমেরিকান যুবক। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে সন্ন্যাসী হয়েছেন। মুণ্ডিত মস্তকে একগুচ্ছ শিখা, উপবীত ও ভারতীয় সন্ন্যাসীর গেরুয়া বহির্বাস। সাবেক জীবন থেকে তিনি এখানে এসেছেন কৃষ্ণ নামে মজে থাকতে। এই পাণ্ডু দাসই অসিতকে সহাস্যবদনে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন অতিথিশালায়।

অতিথিশালায় আসার পথে দেখা হয়ে গেল শতধন্য স্বামীর সঙ্গে। পাণ্ডু দাস অসিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শতধন্য স্বামীর সঙ্গে দেখা গেল একটি ফুটফুটে ছেলে। বয়স বড় জোর ছয় কি সাত হবে। পরনে গেরুয়া ধুতি, কপালে চন্দনের তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা।

অসিত ছেলেটিকে আদর করে জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার?

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না, শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অসিতের দিকে। শতধন্য স্বামীও আমেরিকান। তিনি বললেন, আপনাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে। ওর নাম শিবদ্বার। ওর বাবা জার্মান, মা ইংরেজ। এখানে আর পাঁচটা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে যায় গুরুস্কুলে। বাঙালী ছেলেদের সংস্পর্শে এসে খুব ভাল বাংলা বলতে পারে। এমন কী ইংরেজের মত অনর্গল কথা বলে।

শিবদ্বার অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, হারে কৃষণ, হারে কৃষ্ণণ।

অসিত প্রত্যুত্তরে বলল, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।

এই কথা বলে অসিত শতধন্য স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাণ্ডু দাসের সঙ্গে অতিথিশালায় এসে উপস্থিত হলো।

পাণ্ডু দাস বললেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। পরে আপনি আমাদের সার্বজনীন ভোজনাগারে আসবেন সেখানে প্রসাদ খাবেন।

অসিত বলল, আমি এখনও মন্দির দর্শন করিনি। আপনি যদি একটু অপেক্ষা

কয়েন তাহলে আমি পোষাক বদলে একবার মন্দির দর্শনে যাব।

পাণ্ডু দাস অসিতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অসিত কোন সকালে বেরিয়েছে তাই স্নানটাও সে সেরে নিল। তারপর ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে মন্দির অভিমুখে রওনা হলো।

অসিত লক্ষ্য করে: শ্রীধাম মায়াপুরের এই চন্দ্রোদয় মন্দিরে বিদেশী ভক্তদের ভিড় বেশী। কিছু ভারতীয় আছেন। সবাই কিন্তু সন্ন্যাসী নন। অনেকেই স্ত্রীপুত্র নিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করছেন। কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী এখানে পাকাপাকিভাবে আছেন। বোধ হয় আশ্রমের কাজ করেন। এদের মধ্যে কেউ সুতা কাটেন, আবার কেউ বা তাঁত বোনেন। রান্নাঘরের কাজে নিযুক্ত, অথবা গোশালায় গোপালনে নিয়োজিত। সকলেই এখানে সদা সর্বদা কৃষ্ণ নাম জপ করেন। শুধু কাজের সময়টি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে থাকেন।

পাণ্ডু দাস মন্দিরের অন্যতম পরিচালক ভবানন্দ স্বামীর সঙ্গে অসিতের আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি 'হাতে অনেক কাজ আছে' বলে বিদায় নিলেন।

ভবানন্দ স্বামী অসিতকে মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে যখন নিয়ে গেলেন, অসিত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তারপর দেবতার মূর্তি যখন খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করছে তখন একজন বিদেশী সন্ন্যাসী তাকে বললেন, এই নিন চরণামৃত।

অসিত হাত পেতে নিল এবং দেখল এদের সব কিছুই হিন্দু দেবস্থানের পুরোহিতদের মত। তাম্রপাত্রে চরণামৃত। কুশি দিয়ে তা দেওয়া হচ্ছে। দূরে কোথায় নামগান হচ্ছে।

এবার ভবানন্দ স্বামী আর একজন সন্ন্যাসী শ্যামসুন্দরকে ডেকে বলে দিলেন, অসিত বাবু কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁকে মন্দিরের সব কিছু দেখিয়ে দিন।

শ্যামসুন্দর অসিতকে বললেন, আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

একটা জিনিস অসিত লক্ষ্য করেছে: এখানকার বিদেশিনী ভক্তরা রঙিন শাড়ি পরে। মাথার সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দেয়। আসলে সধবার মত বেশভূষা। বৈষ্ণবীরা যেমন সাদা কাপড় পরে, চন্দনের রসকলি আঁকে, কণ্ঠে থাকে তুলসী মালা। এঁদের কিন্তু সে রকমটি নয়। মেয়েরা বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ী পরে। এলো খোঁপা বাঁধে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কপালে চন্দনের তিলক, হাতেও চন্দনের লেপন দেখতে পাওয়া যায়। এদের বেশীর ভাগই এসেছেন বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশ থেকে।

একটা জিনিস সত্যি এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা কেউই কোন নেশা করেন না। এমন কি চা পানও নিষিদ্ধ বলা যায়।

শ্যামসুন্দরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন:

নব্বুই বিঘা জমির ওপরে এই চন্দ্রোদয় মন্দির। এখানে সবাই ভক্ত। পূর্ব জীবন এঁরা সবাই ভুলে গেছেন। এখন সবাই বৈষ্ণব। এর প্রথম ও প্রধান কারণ: পাশ্চাত্য সমাজে যে সময় শূন্যতাবোধ ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময় ভারতের বৈদিক বাণী নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। ভাবের বন্যা এনে দিয়েছে। ছেষট্টি থেকে ছিয়াত্তর—এই দশ বছরে হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চৈতন্য সোসাইটির সদস্য হতে। এঁর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এ, সি, ভক্তিবৎসলম স্বামী প্রভুপাদ পশ্চিম দুনিয়ায় যখন মাত্রাতিরিক্ত ভোগ, নেশা, অবাধ ও অবৈধ যৌন সংসর্গ, মানুষের জীবনে অশান্তির ঝড় উঠছে—ঠিক তখনই ভারতীয় সন্ন্যাসী ভক্তিবেদান্ত স্বামী ভগবান প্রেরিত দূতস্বরূপ হয়ে হাজির হন। তাঁরই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভক্ত শুধু আমেরিকার পথে পথে শ্রীখোল ও করতাল সহযোগে শুধু কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে গেছেন: "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

তারপর বয়ে গেল কৃষ্ণ নামের জোয়ার। পৃথিবীর সব দেশেই এখন ইস্কনের কেন্দ্র আছে। আছে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণ ভক্ত। যারা বিত্ত বৈভব সব কিছু ত্যাগ করে এখন কৃষ্ণসাধনা করছে: কৃষ্ণ কথা তাঁদের জীবন, কৃষ্ণ নাম তাঁদের পাথেয়। এখন শুধু পাশ্চাত্য দেশেই এই কৃষ্ণভাবনা সীমাবদ্ধ নয়। এখন সারা বিশ্বে এর প্রসার ঘটছে।

কথা বলতে বলতে যখন বেশ সময় হয়ে গেছে তখন দেখা যায় ভবানন্দ স্বামী অসিতের কাছে এসে বললেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন আপনি আসুন আমাদের ভোজনাগারে।

অসিত ভোজনাগারে গিয়ে দেখে: একটি লম্বা বারান্দায় পিঁড়ি পেতে কলাপাতায় প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। অসিত ওই পঙক্তিতে বসে পড়ল। মাটির গেলাসে জল। কলাপাতায় দেওয়া হলো ভাত, পাতলা করে মুগের ডাল, মশলা দেওয়া আলুর তরকারি, আর সেই সঙ্গে ঘি মাখান দুখানা করে চাপাটি। এই খাওয়াতে কৃচ্ছ্রসাধন সুস্পষ্ট। কোন রকম বিলাসিতা নয়। সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন।

প্রসাদ খাওয়ার পালা শেষ হলো। অসিত ফিরে গেল অতিথিশালায় একটু

বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আজকের রাত্রিটা থেকে কালই সকালে সে কলকাতায় ফিরে যাবে।

একটা জিনিস খুব স্পষ্ট স্থানীয় লোকেরা এই সব সাহেব বোষ্টম ও মেম বোষ্টমী-দের সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের মনে হয় এ সবের পিছনে একটা মতলব আছে। এই যে এত সম্পদ, এই যে সংগঠন গড়ার জন্য এত খরচ—এ টাকা কোথা থেকে আসে?

অসিত এ প্রশ্ন করেছিল ভবানন্দ স্বামীকে। তিনি বলেছিলেন: বই বিক্রির টাকা থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের খরচ চলে।

অসিতকে আর অন্য কোন প্রশ্ন করতে না দিয়েই ভবানন্দ স্বামী বলেছিলেন: আমাদের 'ব্যাক টু গড হেড' পাক্ষিক পত্রিকাটি দশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়, এ ছাড়া এ. সি. ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদ রচিত 'শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা ও 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে আয় হচ্ছে। তাঁর বই প্রকাশ ও বিক্রির জন্য আমেরিকায় ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট গড়া হয়েছে। সর্বাধুনিক একটা বড় প্রেসে দিন রাত এই সব বই ছাপার কাজ চলছে।

জাপানী, ফরাসী ও চীন সমেত পনেরটি ভাষায় এই সব বই থেকে যা আয় হয়—তা ছ'মাসে প্রায় দু'কোটি টাকার মতন। এ ছাড়া বহু ভক্তদের ব্যক্তিগত দানধ্যান আছে। এই সব দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চলে যায়।

রাত্রি বাস করার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না অসিতের। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে থাকতে হলো। কাল সকালেই সে ফিরে যাবে। যে জন্য আসা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'। এমনি একটা কী যেন কথা আছে। অসিতের হয়েছে তাই। শুধু আশায় আশায় কাল গোনা সার। দেবলীনার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অসিতের মনে পড়ে কোন একটা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় একবার লিখেছিলেন: 'বিদেশী কৃষ্ণ ভক্তরা এদেশে কী করছে?' সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ইস্কনের বিষয় নানা কথা। প্রভুপাদের গৃহী নাম ছিল অভয়পদ দে। জন্ম কলকাতায়, ১৮৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। বোমবাইতে ছিল ঔষুধের ব্যবসা। জীবনে টাকা পয়সার তিনি যথেষ্ট মুখ দেখেছিলেন, কিন্তু যেই চুয়ান্ন বছর বয়স হলো অমনি তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন সারা বিশ্বে কৃষ্ণ নাম প্রচার করতে। অভয়পদ হয়ে গেলেন অভয়চরণ। অবশ্য এখন বলা হয় এ. সি. ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ। ইনিই ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা। এই সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯২২ সাল থেকে যখন তিনি মাত্র

ছাব্বিশ বছরের যুবক। ১৯৩৩ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাছে এলাহাবাদে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে অভয়পদ হয়েছিলেন ভক্তি-বেদান্ত। গুরুদেব তাঁকে ভগবৎ ধর্ম প্রচারের আদেশ করেছিলেন। এরপর তিনি শ্রীমদ ভক্তিবিলাস মহারাজকে বলেন, 'আমাকে সন্ন্যাস দিন, আমি সন্ন্যাসী হবো'। তিনি এ কথায় রাজি হননি। আগে ব্রহ্মচর্যের মানস শুদ্ধিপর্বের প্রয়োজন, তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ বিধিসম্মত। কিন্তু এতে অভয়পদের মন মানল না।

এ. সি. ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ চৈতন্যমঠ ছেড়ে চলে যান বৃন্দাবনে এবং ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

সালে গুরুদেবের আদেশে কপর্দক শূন্য অবস্থায় এ. সি. ভক্তিবেদান্ত মালবাহী জাহাজে করে আমেরিকা পাড়ি দেন 'কৃষ্ণনাম প্রচার করতে। অবশ্য এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর ডিরেকটর শ্রীমতী সুমতি মোরারজি। সেপ্টেম্বর 'জলদূত' জাহাজ এ. সি.-কে আমেরিকার বোস্টন শহরে পৌঁছে দিল। তারপর বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক। সেখানে 'টমকিন স্কোয়ার'-এ তিনি ভগবানের নামকীর্তন শুরু করলেন। একবছর ধরে এ. সি. বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। তারপর তিনি কৃষ্ণনাম শুনিয়ে সারা পশ্চিম দুনিয়া জয় করে বসলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সমিতি'। সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ইস্কন।

এই যে উত্তরণ তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এ. সি-র জনপ্রিয়তার মূলে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে সময় ও কাল।

ভক্তিবেদান্ত যখন আমেরিকার মাটিতে নামাবলী গায়ে দিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার শুরু করলেন তখন ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়। মূল্যবোধহীন সামাজিক পরিবেশ। বিপুল বৈভব ও বিলাসের জীবন সম্পর্কে তারা বীতশ্রদ্ধ। এক কথায় যাকে বলা যায় বিলাসব্যসনে সবাই ক্লান্ত। তখন বেশীর ভাগ কমবয়সী ছেলে মেয়েরা হিপি বা রকার, বাংক বা জোনার, বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে-যে নামেই বলা হোক না কেন সেই দিকে ঝুঁকেছে। সব কিছু ছেড়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে পথে। বহুতল বাড়ির অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেছে নিচ্ছে পথের জীবন। আসলে এমনি একটা মানসিকতায় তখন সমগ্র মার্কিনী যুবশক্তি আক্রান্ত।

একজন তো স্বীকারই করে বসলো—"যখন আমাদের মানসিক এমনি অবস্থা তখন আমরা দেখলাম, গৈরিক বসন পরিহিত কিছু মানুষ শ্রীখোল ও করতাল সংযোগে 'হরে কৃষ্ণ' নামে মুখরিত করে তুলেছে নিউ ইয়র্কের মত জনবহুল পথ

ঘাট। মনে হলো—বেশ একটা নতুন ব্যাপার, আর সেই সঙ্গে আছে তালে তালে উন্মাদনা। ভাল লাগল। একঘেয়েমি জীবনযাত্রা থেকে অন্তত কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ আছে। অনেকেই তখন কৃষ্ণ নামে মেতে উঠল। আমরা তখন প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মের বই পড়তে শুরু করলাম। অপ্রাকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য ধ্যান করার চেষ্টা করতাম।"

ঠিক এমনি সময় এ. সি. ভক্তিবেদান্ত নিউ ইয়র্কের কর্মমুখর অঞ্চলের পথে পথে মুণ্ডিত মস্তকে এক গুচ্ছ শিখা, নাকে রসকলি এঁকে গৈরিক বসনে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। খোল, করতাল আর সেই সঙ্গে যোগ হলো গীটার। আর মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।' এই সব কিছু মিলেমিশে সে কি উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা। নবীন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল নামগানে। এই সঙ্গে চলতে লাগল কৃষ্ণভাবনার ক্লাস। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যা। ওই সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা হয়েছে, "এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী যখন কৃষ্ণভাবনার অমৃতবাণী বিতরণে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে ভিন্নতর, সুদূরপ্রসারী এক রাজনৈতিক ভাবনায় ব্যস্ত হোয়াইট হাউসের মারকিন' সাম্রাজ্যের নায়করা। কারণ ষাটের দশকের গোড়া থেকেই সমুদ্রপারের বিশাল উপমহাদেশের জনমানসে ভিন্নতর রাজনীতির ভাবনা প্রকট হয়ে উঠছে—তৃতীয় বিশ্বজোড়া কম্যুনিজমের দ্রুত জনপ্রিয়তা তাদের চক্‌চকে কপালে ভাঁজ ফেলতে শুরু করেছে। কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু। এই জলতরঙ্গ রোধ করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা। ঠিক এমনি সময় সিনধিয়া সাম্রাজ্যের 'প্রেরিত পুরুষ' অভ্যুচরণের ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল। প্রায় একশো বছর আগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছিলেন: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন। যিনি কৃষ্ণভাবনার বাণী ছড়িয়ে বিশ্বজয় করবেন।"

এ. সি-ই সেই মহাপুরুষ হবেন না কেন?"

প্রচলিত সমাজ কাঠামোর একঘেয়েমিতে যারা হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাদের কাছে এ সি-র আবির্ভাব মনে হলো: 'সামথিং নিউ, সামথিং একসাইটিং।' ভিন্ন স্বাদ ও ভিন্ন স্বাদের জীবনের সন্ধান পেয়ে হাজার হাজার মানুষ 'কৃষ্ণভাবনায়' মেতে উঠলো!

রাত্রিটা কোনরকমে কাটিয়ে অসিত পরের দিন ভোর বেলায় যাত্রা করে সন্ধ্যের সময় কলকাতা ফিরল।

। ১৪ ।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অসিত দেবলীনার কোন সন্ধান করতে পারেনি। আর তা ছাড়া এত বড় কলকাতায় সহজে কারুকে খুঁজে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। দেবলীনা যে কলকাতায় আসবে তারই বা কী নিশ্চয়তা আছে। তবু অসিত সম্ভাব্য সব জায়গায় তার খোঁজ করেছে। এই সব নানা কথা ভেবে অসিত ইদানীং দেবলীনার আশা ছেড়েই দিয়েছে। তবুও কদাচিৎ যদি তার কথা মনে হয়েছে তখন অসিতের মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাও সাময়িক সে চিন্তা স্থায়ী হয়েছে বলা যায়। চাকরিটা ছেড়ে দেবার পর অসিত ভেবেছিল কোন একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবে যেখানে সে সর্ব সময়ের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করে রাখতে পারবে। কোন সমাজ কল্যাণ সংস্থা বা সেবাকেন্দ্র হলে ভাল হয়। অনুন্নত শ্রেণী বা উপজাতিদের মধ্যে গিয়ে যদি কোন কাজ করা যায় তবে সে কাজে আনন্দ আছে। আসলে গঠনমূলক কাজ। যে কাজের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ হবে, উপকৃত হবে সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষ। এর জন্য কোন প্রচার নয়, এর জন্য কোন নাম যশের প্রত্যাশা করে না অসিত। এমন অনেক আদিবাসী অঞ্চল আছে যেখানে রাষ্ট্রের কোন সুযোগ বা সুবিধা পৌঁছায় না। এখন তারা প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়ে আছে।

মাদার টেরেসা বা বাবা আপ্‌তে যে ভাবে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য কাজ করছেন, আর্তের সেবা করছেন ; অনেকটা সেই রকম কাজ করার ইচ্ছা অসিতের। একদিন ওঁরা তো নিজেদের প্রচেষ্টায় এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর জন্য খুব একটা টাকা পয়সার দরকার হয় না, যতটা দরকার হয় ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা। প্রথমে ছোট করে শুরু করলে তবে তা ভবিষ্যতে বিরাট হয়ে ওঠে। ওঁরাও তো তাই করেছিলেন।

অসিতের বাবা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন যাতে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীর শাসন থেকে মুক্ত করা যায়। দীর্ঘদিন তিনি কারান্তরালে ছিলেন। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছে সমগ্র জাতি। কিন্তু যখনই দেখা যায় ; সাম্প্রদায়িক

ভদকামী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দেশের সংহতি ও স্তকে খুন্ন করার চেষ্টা করছে, তখনই মনে হয় সাম্রাজ্যবাদীরা দেশ ছেড়ে গেলেও দের মদত-পুষ্ট তাদেরই বশংবদরা এখনও এ দেশে আছে এবং তারাই দেশের ভ্যন্তরীণ অস্থিরতার জন্য দায়ী।

অসিত ছোটবেলায় একবার তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : তোমরা কি-শা নিয়ে জেল খেটেছিলে ?

এই কথায় অসিতের বাবার দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন : খন আমাদের আশা ছিল একদিন আমরা স্বাধীন হবো। নিজের পায়ে দাঁড়াব, মির মালিক হবো, স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করবো এবং পরস্পরের যোগিতার দ্বারা স্বচ্ছন্দে আত্মসম্মান নিয়ে জীবন যাপন করবো।"

বাবার কথাগুলি অসিতের আজ খুব ভাল করেই মনে পড়ে। তার বাবা যদিও শ স্বাধীন হবার পর মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, বে আজকের ভারতবর্ষের চেহারা দেখে নিশ্চয় তিনি শিউরে উঠতেন।

গান্ধীজী তো অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক ংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য বহুবার অনশন করেছিলেন। আবার সেই সম্প্রীতি রক্ষা রতে গিয়ে তিনি আদর্শের জন্য আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর এই াত্মত্যাগ সে সময় বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে াগ হলো বটে, কিন্তু তারপর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র লে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু তারপর ? তারপর আবার ভাষাভিত্তিক জ্য ভাগ হলো, ধর্মের নামে বিদেশী মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাঝে মাঝেই থা চাড়া দিয়ে ওঠে, যাতে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়—তারই জন্য খেলায় মেতে ঠে। সফল হয় না বটে, তবে পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাস একবার বিনষ্ট হয়— া ফিরে আসতে তো বেশ সময় লাগে।

অসিত খবরের কাগজে পড়েছে : বাবা আম্‌তে কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর র্যন্ত সাইকেলে করে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এক অভিযান চালিয়েছেন—যাতে একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্র জীবন' বা 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' এই বাণীতে দীপ্ত হয়ে উঠুক সারা ভারতবর্ষ। কিছু না হোক, সবাই যেন নিজেদের অন্তত ারতীয় বলে মনে করে। শুধু এই আশা নিয়েই বাবা আম্‌তের এই অভিযান।

অসিতের মনে হয়—বাবা আম্‌তের জীবনাদর্শ তাকে বিশেষভাবে অভিভূত রেছে। কত অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেবার দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের নিরাময় ও

তাদের পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে আদিবাসী অঞ্চলে নানাবিধ প্রকল্প চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রকম কিছু একটা যদি সে করতে পারে তবেই তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

এই বিত্ত, এই বৈভব তো ক্ষণস্থায়ী। যাঁরা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়ে দিনের পর দিন সাধনা করে যাচ্ছে—তারা তো মোক্ষলাভ করতে চায়। শুধু ধর্ম ধর্ম করেই তারা দিন কাটিয়ে দেয়। এই তো অসিত দেখে এলো—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম', দেখে এলো 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সোসাইটি'র কলকাতা ও মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দিরের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের। তাঁরা শুধু নামগান করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু অসিতের মনে হয়: 'সব ধর্মের সেরা এবং সার 'মানুষের সেবা-ধর্ম।' আরো মনে পড়ে: 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এমনি নানা চিন্তায় অসিতের বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। পরিকল্পনার বীজ নিয়ে সে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পেলেই সে কাজ শুরু করবে। একজন কারুকে সঙ্গী হিসেবে পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু সে রকম সঙ্গী কোথায়? তাই 'একলা চলো'—এই কথায় বিশ্বাসী হয়ে সে তার পথ পরিক্রমা শুরু করবে।

*   *   *

দেবলীনা ও রুক্মিণী একই সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে এসেছেন। দুজনেই তাঁদের গৈরিক বসন সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছেন। মনের দিক থেকে তাঁরা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। একদিন আশ্রমের সব কিছু তাঁদের ভাল লেগেছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাঁরা ধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁরা যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তাই দেবলীনা ও রুক্মিণী দাসী সব কিছু পরিত্যাগ করে আবার তাঁদের সাবেক জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছুক। গৈরিক বসন, মালা জপ করা, পূজা অর্চনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এঁদের আশ্রম ত্যাগকে পলায়ন না বলে মহানিষ্ক্রমণ বলা যায়। রুক্মিণী তাঁর স্বদেশে ফিরে গেছেন। আর দেবলীনা এসে উপস্থিত হয়েছেন অসিতের বাসস্থানে।

দেবলীনা অসিতের ঠিকানা জানতেন না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি শুধু অসিতের কাছ থেকে তার কর্মস্থলের নামটুকুন জেনেছিলেন এবং সেই সূত্র ধরেই দেবলীনা অসিত মজুমদারের বাসস্থানে উপস্থিত হতে পেরেছেন।

অসিত দেবলীনার আগমনে যে খুশি হয়েছে সে কথা স্পষ্ট করে না বললেও

তার আচার আচরণে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অসিত দেবলীনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এতদিন দেবলীনা কোথায় ছিলেন এবং কেনই বা তিনি আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলেন—এ সব কথা দেবলীনা নিজেই জানিয়ে দিলেন অসিতকে।

দেবলীনা পুরী থেকে সোজা চলে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রথমে ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ.-তে উঠেছিলেন। তারপর ওখানে অসুবিধা হওয়ায় তিনি সাডার স্ট্রীটের একটি হোটেলে গিয়ে ওঠেন। তারপর ওই হোটেলের ম্যানেজারের সাহায্যে দেবলীনা অসিতের অফিসে যান এবং সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, অসিত চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অগত্যা হতাশ হয়েই ফিরছিলেন দেবলীনা, কিন্তু অফিসের রিসেপ্‌শনিস্ট্‌ মেয়েটি খুব ভদ্র। সেই দেবলীনাকে অসিত মজুমদারের বাসস্থানের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন।

দেবলীনা অসিতের ঠিকানা পেয়ে কালবিলম্ব না করে সোজা ট্যাক্সি করে চলে এসেছিলেন তার বাড়িতে। যদি সেদিন না এসে তিনি পরের দিন আসতেন, তাহলে হয়তো অসিতের সঙ্গে তাঁর দেখাই হতো না। কেননা অসিত মনে মনে ঠিক করেছিল, এর ঠিক পরের দিন সে বাঙলা ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে একটু ঘুরে দেখে আসবে।

যাই হোক, এর পরের ঘটনা অসিত দেবলীনাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর হোটেল থেকে সব জিনিসপত্তর নিয়ে আসে। এখানে এসে দেবলীনা বেশ স্বস্তি পান।

অসিতের অ্যাপার্টমেন্টটা দেখলে তার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ ছিমছাম সাজানো। দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহ। লেকের জলে স্নিগ্ধতার পরশ। দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার গাছ মাথা উঁচু করে সারিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া নানা রকমের পাখির ডাক শহরে থেকে শোনা এক রকম দুর্লভ বলা যায়। সেই সঙ্গে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দেখা যায় বিস্তৃত নীল আকাশ।

সব কিছু দেখে শুনে দেবলীনা অসিতকে বলেছিলেন, জায়গাটা আমার ভারী পছন্দ। আমাকে তোমার এখানে থাকতে দেবে?

অসিত বলেছিল, স্বচ্ছন্দে, তোমার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পার।

দেবলীনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু কোন সুবাদে?

অসিত তার উত্তরে বলেছিল, কেন বন্ধুত্বের সুবাদে।

এই উত্তরে দেবলীনা মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকেন।

অসিত দেবলীনাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হলো, চুপ

করে গেলে কেন? কিছু বলো।

দেবলীনা বলেছিলেন, সম্পর্কটা যদি শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে থাকে তবে তা স্বল্পায়ু হবে। এই কথা শুধু ভাবছিলাম।

অসিত বলেছিল, বন্ধুত্ব যদি গাঢ় হয়—তবে তা কিছুতেই স্বল্পায়ু হয় না। তখন তার সঙ্গে যোগ হয় আর এক মাত্রা। সে সম্পর্ক সহজে চিড় খায় না। দীর্ঘস্থায়ী হয়, মধুর হয়। সম্পর্ক যত সহজ হয় ততই ভাল হয়। ওই যে ভাললাগা আর ভালবাসা কথাগুলি বড় সেকেলে হয়ে গেছে। আমরা এক সঙ্গে বাস করবো সেখানে কিন্তু একটা এমন আকর্ষণ থাকা চাই—যা আমাদের উভয়েরই কাম্য, যা দুজনকে একই লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

অসিতের মুখে এ ধরনের কথা শুনে দেবলীনা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এতদিন তিনি বহু ছেলেকেই দেখেছেন, কিন্তু অসিত যেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জাতের মানুষ। কিন্তু অসিতই তো একদিন তাকে বলেছিল : এই ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে চলে এসো। গঠনমূলক একটা কিছু কাজ করো। তখন দেবলীনা বলেছিলেন : আমি তোমার পাশে থাকবো।'

এই ধরনের কথা। ভাষাটা আজ আর দেবলীনার মনে নেই। শুধু মনে আছে অসিত ফিস ফিস করে বলেছিল : 'আমি তোমার পাশে থাকবো।' এই কথাটি সেদিন খুবই ভাল লেগেছিল দেবলীনার। তারপর অসিত চলে এসেছে আর দেবলীনা শুধু কাল গুনেছেন কবে সে বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন। তারপর যখন সে সুযোগ এলো, দেবলীনা ছুটে চলে এসেছেন কলকাতায়। তিনি তো ইচ্ছে করলে রুক্মিণীর মত স্বদেশে ফিরে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। কেন যাননি সে কথা অসিত জেনে বুঝেও তা প্রকাশ করতে চাইছে না।

দেবলীনা গৈরিক বসন পরিহার করেছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় মেয়েদের মতন শাড়ি পরেন। হালকা নীল রং বা ফিকে হলুদ রং তাঁর বেশী পছন্দ। কলকাতায় এসে তিনি টাঙ্গাইল ও তাঁত সিল্ক পরতে শুরু করেছেন। শাড়ি পরলে দেবলীনাকে খুবই ভাল দেখায়। তাঁর সাজগোছ একেবারে বাঙালী মেয়েদের মত। কথা বললে অবশ্য বোঝা যায় তিনি বিদেশিনী।

কেন এ রকম সাজ? এ প্রশ্নের ভারী সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন দেবলীনা। তিনি বলেছিলেন, আমি মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে গেছি। এই যে শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা তুলে দেওয়ার রীতি—এটা আমার ভারি ভাল লাগে। এই সাজ সজ্জায় বেশ একটা শান্তশ্রী ভাব আছে। এতে মেয়েদের আরো রমণীয় করে

তোলে।

অসিত এ কথায় মোটেই বিস্মিত হয় না। তার কারণ মেয়েরা একটু আবেগ-প্রবণ হয়। কাজেই দেবলীনা এখানে এসে যা কিছু বলছেন বা করছেন তার মধ্যে আবেগ ও আবেশ এ দুটো থাকাই স্বাভাবিক।

দুদিন হয়ে গেল দেবলীনা এখানে এসেছেন। তাঁর জন্য পৃথক একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দিবাকর তাঁর সব কিছু দেখাশোনা করছে। সত্যিকথা বলতে কি দিবাকর যেন দেবলীনার বেশী অনুগত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সত্যিকারের কোন কাজের কথা হয়নি। অসিত ভেবে উঠতে পারে না কীভাবে সে কথাটা তুলবে। তার পরিকল্পনার কথা বলার জন্য তো একটা সময় দরকার। তার মানে দুজনে যখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে এবং তার মধ্যে আবার আন্তরিকতাও থাকা চাই, তবেই না সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু দেবলীনা এখন তেমন সুস্থির হয়ে উঠতে পারেন নি।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ তাঁর খুবই ভাল লাগছে। অসিত যদি কোন কাজের জন্য বার হতে চায় তবে দেবলীনা তাতে বাধা দেন। কাজের কথা বললে তিনি ফোনে সেরে নিতে বলেন, কিংবা দিবাকরকে পাঠাতে বলেন। আসলে তিনি অসিতকে মোটেই কাছ ছাড়া করতে চান না।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে অসিত পড়েছে। দেবলীনার অনুরোধ সে কিছুতেই এড়াতে পারে না। কিন্তু ঘরে বন্দী থাকতেও মন চায় না তার। তাই এক সন্ধ্যেবেলায় অসিতই প্রস্তাব করল দেবলীনাকে : চলো একটু ঘুরে আসি।

দেবলীনা বললেন, কোথায় যাব?

যেখানে হোক। গঙ্গার ধারে একটু খোলা জায়গায় গেলে ভাল লাগবে।

দেবলীনা রাজি হয়ে গেলেন। ওরা দুজনে গাড়ি নিয়ে গেল গঙ্গার ধারে গোয়ালিয়র মনুমেণ্টের কাছে। এখানে অনেকেই এ সময় বেড়াতে আসে। কেউ গাড়ি নিয়ে সপরিবারে, আবার কেউ বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে। ফেরিওয়ালারা জানে, এ সময় কিছু মানুষ আসে টুকিটাকি কিছু খায়। আইসক্রীম, চীপস্, পপ করন্, চক্‌লেট থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য। একজন গ্যাস বেলুন বিক্রি করছিল।

দেবলীনা নিজেই কয়েকটা বেলুন কিনলেন। অসিত দাম দিতে গেলে দেবলীনা তাকে বাধা দিয়ে নিজেই দাম দিলেন।

তারপর ওখান থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চে গিয়ে ওরা দুজনে

বসল। সামনে একটা বড় জাহাজ নোঙর করে রয়েছে। মাঝ গঙ্গা দিয়ে স্টীমার যাতায়াত করছে, দেশী নৌকাগুলোও এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করছে। এ সময় গঙ্গার ধারে এলে বসন্তের গন্ধ বাতাসে পাওয়া যায়। বাতাসে চুল এলোমেলো হয়ে যায়। দেবলীনা তাঁর হাতের বেলুনগুলো ছেড়ে দিলেন। বাতাসে বেলুন-গুলো বেশ উঁচুতে উঠে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

অসিত বলল, এ কি, সব ছেড়ে দিলে?

হ্যাঁ। আজকের সন্ধ্যাটা যাতে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

লাভ কি?

লাভ হচ্ছে এই মুহূর্তকে ধরে রাখা। বলে দেবলীনা অসিতের মুখোমুখি বসলেন। এবার অসিতের হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আচ্ছা অসিত তুমি কি এর আগে কোন মেয়েকে ভালবেসেছ?

অসিত বলল, না।

কোন মেয়ে তোমাকে ভালবেসেছে?

বোধ হয় না।

বোধ হয় কেন বলছো? স্পষ্ট বলো—হ্যাঁ কিম্বা না।

অসিত এবার দেবলীনার চোখে চোখ রেখে বলল, না। কোন মেয়ে আমাকে ভালবাসেনি। তবে······

তবে কি? বলে দেবলীনা অসিতের হাতে চাপ দিয়ে বললেন, তোমার কথা বলো অসিত। আমি তোমার কথা কিছু শুনতে চাই, তোমাকে আমি বুঝতে চাই। তারপর আমি তোমাকে আমার সব কথা বলবো।

অসিত এবার বলল, আমি শর্মিলা বলে একটি মেয়েকে জানি। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, তবে সে যে আমাকে ভালবাসে না তা আমি বেশ ভাল করেই জানি।

দেবলীনা বললেন, প্রথমে তো বন্ধুত্ব হয়, তারপর প্রণয়। আর এই প্রণয় থেকেই প্রত্যয়।

এ তো তুমি সাধারণ মেয়ের কথা বলছো।

তবে কি তোমার শর্মিলা অসাধারণ?

অসিত বলল, অসাধারণ না বলে আমি বলবো, সে এক রকম অস্বাভাবিক মেয়ে।

শর্মিলার বিষয় দেবলীনার জানবার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তাই বললেন,

অস্বাভাবিক কেন বলছো ?

অসিত বলল, শর্মিলা ভিন্ন জাতের মেয়ে। সে পুরুষকে যতটুকু তার প্রয়োজন তার বেশী সে পছন্দ করে না। কাজেই ভালবাসা, বিয়ে এ সব তার কাছে অর্থ-হীন, অবান্তর বলে মনে হয়।

দেবলীনা অস্ফুটস্বরে বললেন, স্ট্রেইনজ্… !

তারপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে রইলেন। কোন কথা নয়। অসিতের দুটি হাতেই দেবলীনার হাত তখনও বন্দী হয়ে আছে। উষ্ণতা অনুভব করে অসিত। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে না। ভাবটা হচ্ছে এই বেশ ভাল। মন বলে, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।' কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ হয়। তাই আর কোন কথা নয়। কিন্তু কিছু তো বলা উচিত। তাই অসিত নিজের হাত দুটিকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, আইসক্রীম খাবে ?

না থাক। চলো ফেরা যাক। বলে দেবলীনা উঠে দাঁড়ালেন।

অগত্যা অসিতও উঠে বলল, বাড়ি ফিরবে না অন্য কোথাও যাবে ?

দেবলীনা বললেন, বাড়ি। তোমার বাড়ি।

অসিত ও দেবলীনা এসে যখন গাড়িতে বসলেন তখন কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে ভিক্ষে চাইছে। অসিত এদের এইভাবে ভিক্ষে চাওয়াতে বেশ অস্বস্তি বোধ করে।

দেবলীনা অসিতের মুখের ভাব দেখে তা আন্দাজ করতে পারেন। তাই তিনি বললেন, এদের ভিক্ষে দিয়ে তুমি দেশ থেকে দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবে না। গাড়ি স্টার্ট করো। গাড়ি জোরেই চালায় অসিত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা ফিরে এলো।

গাড়ি গ্যারেজ করে ওপরে আসার সময় অসিত বলল, তুমি তো কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে কিছুদিন আশ্রমে ছিলে। সেদিন তুমি হাসির ছলে আমাকে বলেছিলে, 'আমি তুমি হয়ে যাবো, তুমি আমি হয়ে যাবো, তারপর তোমাতে আমাতে আর কোন তফাৎ থাকবে না।' তবে এরপরও কেন তুমি এই ব্যবধান রেখে চলেছো ?

দেবলীনা বললেন, ইচ্ছে হয়—কিন্তু ভরসা পাই না। পাছে যদি একাত্মা হবার সুযোগ না পাই। জানো অসিত, খুব সাবধানে পা ফেলছি, পাছে পা পিছলিয়ে না পড়ে যাই। তোমাকে হারাবার ভয় বেশী, তাই কোন কিছু প্রকাশ করতে সাহস পাই না।

অসিত বলল, আচ্ছা সত্যি করে বলতো আমার চোখে কি তোমার ছায়া

দেখতে পেয়েছ? ততক্ষণে লিফট্ এসে গেছে। ওরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়া
কিন্তু যখন লিফট্ চলতে শুরু করেছে—তখন অসিত স্পষ্ট অনুভব করলো দেবলীন
বুকটা তার বুকের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছে এবং তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্পষ্ট অনু
করা যায়। ওরা দুজনে এমনিভাবে ওপরে উঠে এলো। মুখে কিন্তু আর একটি
কথা নয়।

তারপর অন্যদিনের মত যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে দেবলীনা গেলেন তাঁ
জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে, আর অসিত ঘুমতে গেল তার ঘরে। কিন্তু আশ্চর্যের কথ
ওদের দুজনের চোখে কোন ঘুম নেই। দুজনেই বিছানায় শুয়ে শুধু ছট্‌ফট্ করছে
শুধু ঘুম না আসার জন্য যা একটা অস্বস্তি।

মাঝরাতে দেবলীনা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন অসিতের ঘরে। তারপ
অতি সন্তর্পণে তিনি অসিতের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা অসিত নিশ্চ
ঘুমোচ্ছে, কাজেই পাছে তার আগমনে অসিতের ঘুম ভেঙে যায়—তাই দেবলীনা এ
সাবধানী। কিন্তু অসিত বুঝতে পারে দেবলীনা তার ঘরে এসেছেন এবং বিছানা
একটি পাশে সন্ত্রস্ত হয়ে শুয়ে আছেন। কিন্তু এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। অসিত ভা
করে থাকে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসিত চায় দেবলীনা যেন এ
বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আর অসিত তার কোন প্রতিরোধ করবে না। নিজেকে
দেবলীনার কাছে সমর্পণ করে দিয়ে সব কিছুর নিবৃত্তি করবে।

দেবলীনা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না। এতদিন ধরে তাঁর মনে
যে অপূর্ণ বাসনা ছিলো তা পূরণ করার জন্য তিনি কেমন যেন মরিয়া হয়ে ওঠেন।
আবেগের সঙ্গে অসিতকে আদর করতে থাকেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে দীর্ঘ-
দিনের উপবাস করে থাকার পর এবার বুঝি ব্রতভঙ্গের আয়োজন চলছে। অথবা
ব্রত উদযাপনের এই বুঝি প্রক্রিয়া। অন্তত দেবলীনার আচরণে অসিতের মনে
সেই রকম একটি ধারণা হয়। কিন্তু জৈবিক প্রয়োজনে মানুষ এমনি মরিয়া হয়ে
ওঠে, ঠিক এমনিভাবে তার যা প্রয়োজন তা মিটিয়ে নেয়। এর কোন ব্যতিক্রম
নেই। শুধু যা আছে—তা ভিন্ন পদ্ধতি, ভিন্ন প্রকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই
যে একজনের অপরজনকে পাবার আকাঙ্ক্ষা—এ তো স্বাভাবিক এবং মিলনের জন্য
যে ব্যাকুলতা তা শুধু মুহূর্তের ওই আনন্দ বা শিহরণটুকু পাবার জন্য। যতক্ষণ না
ওই মুহূর্তকে পাওয়া যায়, ততক্ষণ কত উত্তেজনা, কত উৎকণ্ঠা সারা শরীরের শিরায়
শিরায় তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তারপর যখন অধীর আগ্রহের পর সেই
মুহূর্ত আসে তখন সারা শরীরে শোনা যায় আনন্দের প্রতিধ্বনি। পরম ও চরমকে

স্পর্শ করার আনন্দ। আর এই আনন্দ হচ্ছে 'বায়োএনার্জি'। দেবলীনা যা চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়ে গেলেন অসিতের কাছ থেকে। আনন্দের সঙ্গে রোমাঞ্চ সারা শরীরে আধিপত্য করতে শুরু করে দেয়। মুখে কোন কথা নয় শুধু অনুভব করতে হয়। আর এই অনুভব করতে ভাল লাগে বলেই নিস্তেজ, অবসন্ন দেহটা তখনও আদর করে যায়। পূর্বের আদরটা প্রস্তুতির জন্য এবং পরের আদরটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর এক অভিব্যক্তি।

যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন অসিত দেবলীনার চোখে নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখ রেখে খুঁজতে থাকে। কি খোঁজে তা ওরাই জানে। তারপর দুজনেই হেসে ফেলে। অসিত দেবলীনাকে তার বাহুবন্ধনে বন্দী করে রাখে। আর মনে মনে ভাবে: অপূর্ব এক জ্যোতির্ময়ী রূপে তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আছো। তোমার চোখে তৃপ্তি, তবু তোমার দেহের উষ্ণতা হৃদয়কে বিগলিত করে। নিস্তেজ শরীরের শিরায় শিরায় উষ্ণ প্রস্রবণ ধারা যেন অবিরাম বহে চলেছে। তার কোন ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। অগাধ তৃপ্তি, দুর্গজয় করার আনন্দ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেবলীনার তপ্ত নিশ্বাস অসিত তার গাল দিয়ে অনুভব করে। দুটি মানুষ তাদের ইচ্ছা পুরণের পর একটা আমেজের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না পাছে এর রেশ কেটে যায়। তারপর দেখা যায় দুটি দেহ যেন একই বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

দেবলীনার ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। একটা ঘোরের মধ্যে কাল রাত্রিটা তাঁর কেটেছে। এই মুহূর্তে তিনি নিজের সম্পর্কে যেন বেশ সচেতন হয়ে উঠলেন। অসিতকে না জাগিয়ে তিনি তাঁর ঘরে চলে এলেন। আয়নায় নিজেকে একবার দেখে তাঁর মনে হলো: গতরাত্রে যে ঝড় বহে গেছে তার চিহ্ন তাঁর মুখে চোখে বেশ স্পষ্ট। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে যেমন সারা দেহে কালচে ভাব দেখা যায় অনেকটা সেইরকম দেখতে হয়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল দেবলীনার সঙ্গে এইভাবেই যদি সারাটা দিন থাকা যেত তাহলে বেশ হতো। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? যা অতীত তাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হয়। জাগতিক নিয়মে তাই রাত্রির পর দিন।

স্নান সেরে সব কিছু বদলে নতুন বেশে নতুন রূপে দেবলীনা অসিতের সামনে উপস্থিত হবেন। ঘুমন্ত অসিতকে একবার তিনি দেখে নিলেন। ঘুমলে মানুষকে কেমন যেন অন্য রকম দেখায়। এক একজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে বেশ ভাল

লাগে। অসিত হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যাকে ঘুমন্ত দেখলে বেশ সুপুরুষ বলে মনে হয়।

দেবলীনা ত্রস্ত পায়ে স্নানের ঘরে চলে গেলেন।

। ১৫ ।

এক'দিন থাকার পর অসিত ও দেবলীনার সম্পর্কটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। এখন আর দেবলীনার মধ্যে কোন জড়তা নেই। ওরা অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে। বাজার হাট করা, ঘোরাফেরা ও কেনাকাটা করার মধ্যে এমন এক বন্ধনের সম্পর্ক নজরে পড়ে যা সচরাচর নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে দেখা যায়। ওরা গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যায়, আবার কখন-সখন সিনেমা বা অন্য কোন আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

দিবাকর অসিতের বিশ্বস্ত লোক এবং তার ভাল মন্দ দেখার ব্যাপারে খুবই সৎ লোক, এক কথায় যাকে বলে বিশ্বাসী। দেবলীনার আগমনে এবং অসিতের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতাকে সে স্বাগত জানায়। তার প্রধান কারণ অসিতের নিঃসঙ্গতার সে সাক্ষী এবং যেহেতু সে অসিতের অনুগত ভৃত্য, সেহেতু সে মনে করে দেবলীনাকে নিয়ে অসিত যদি সুখী হয়, তবে তা দিবাকরের পক্ষেও ভাল। কেননা দিবাকর চায় অসিত স্থিতু হয়ে বসুক। সুখী হোক।

মা মারা যাবার পর অসিত খুবই একা হয়ে পড়েছিল। তারপর চাকরী নিয়ে সে দিন-রাত মেতে থাকতো। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হলো সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিল। যদিও টাকা পয়সার তার তেমন কোন অভাব নেই। যা টাকা আছে তা হিসেব করে চললে কোনদিনই খুব একটা অসুবিধা হবে না। তবে আগে মাঝে-সাঝে বন্ধুবান্ধবরা এসেছে। মেয়েরাও দু'একজন যে না এসেছে তা নয়। তাদের নিয়ে বাড়িতে পার্টি, আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু ইদানীং সে সব পাট চুকে গেছে।

পুরী থেকে ফেরার পর অসিতের মতিগতি অন্যরকম হয়ে গেছল। সব সময় তাকে দেখা গেছে চিন্তাক্লিষ্ট। হালে দেবলীনা আসার পর অসিতকে সহজ মনে হয়। তার মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

এসব কারণেই দিবাকর দেবলীনার আগমন ও অসিতের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেই খুশি। সে চায় অসিত সুখী হোক, তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। এর বেশী সে কিছুই চায় না বা বোঝে না। সে কারণে সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে দিবাকরের তীক্ষ্ণ নজর, রান্নাবান্নায় তার দ্বিগুণ উৎসাহ। এই সব দেখে অসিত ও দেবলীনা দুজনেই দিবাকরের প্রতি প্রীত বলা যায়। কেননা এখনকার দিনে যা লোকজনের অবস্থা, সেখানে দিবাকরের মত বিশ্বস্ত, সৎ ও কর্মনিষ্ঠ মানুষের দেখা পাওয়া চিন্তার বাইরে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে দেবলীনা বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানতে চান। অসিত তাঁকে নিয়ে বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। অসিত বলেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ ছিলেন। তাঁকে বলা হয় পরমহংসদেব। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সাধক বলেন। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্বধর্মের সমন্বয়ের প্রবক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন, 'যত মত তত পথ'। তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে যেমন আছে গূঢ় তত্ত্ব, তেমনি আছে চৈতন্য উদয়ের বাণী। তাঁর ভক্তরা বলেন: 'যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ' একাধারে রামকৃষ্ণ।' এর বেশী আর আমি কিছু জানি না। তবে একটা কথা সত্যি যে, সারা বিশ্বে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত ও দর্শন নিয়ে মানুষ চর্চা করছে। এমন কী রুশদেশের মানুষও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। তিনি মনে করতেন আর্তজনের সেবাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মুক্তপুরুষ। আর তাঁর শিষ্যা নিবেদিতা ছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। বিদেশিনী হয়েও তিনি ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা, সমাজ-সেবা ও ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আসল কথা কি জানো, ভক্তিমার্গে থেকেও এঁরা কেউই কোন অলৌকিক কিছু করার প্রয়াসী হননি। তাই এখন মানুষ তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

এতক্ষণ দেবলীনা অসিতের মুখে সব কথা শুনছিলেন। তারপর কী ভেবে যেন তিনি বলে ওঠেন, দেখো অসিত, আমার ধর্মের ওপর আর কোন আস্থা নেই। আমি তাই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আজ এখানে চলে এসেছি। কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, তা হচ্ছে—ভারতের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্তি আমাকে খুব বিস্মিত করে। সমাজের ধনীরা এ বিষয়ে নিস্পৃহ। জনসাধারণ যেন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে সহজরূপে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক

স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও কেউ পায়নি। অথচ কী আশ্
কেউই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেনি। ধর্মের নামে কুসংস্কার রাজ
করে চলেছে। এখনও জাতপাত নিয়ে চলেছে নিত্য সংঘর্ষ। গণতন্ত্রের নামে কি
মতলববাজ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমার ইচ্ছে কর
এসো আমরা দুজনে মিলে কিছু একটা করি। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে গিয়ে কা
করি। যেমন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যা নিবেদিতা। সেবা ও কুসংস্কা
থেকে মুক্ত করার কাজে আমরা ব্রতী হবো। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তির জ
আমরা সকলকে নিয়ে সংগ্রাম করবো। আমার মনে হয়—আমরা আমাদে
সাধ্যমত চেষ্টা করবো। আমার বিশ্বাস—যদি আমরা এইরকম কিছু একটা ক
তখন আমাদের সঙ্গে অনেকেই এসে যোগ দেবে।

দেবলীনার কথার মাঝে অসিত বলেছিল, এসব করতে গেলে বেশ কিছু টাকা
দরকার হয়।

দেবলীনা বলেছিলেন, টাকার জন্য তুমি ভেবনা অসিত। তুমি যদি আমা
সঙ্গে থাকো তবে আমি আমার যথাসর্বস্ব টাকা এখানে নিয়ে আসবো। আর
টাকা ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ের হারে বেশ মোটা অঙ্কেরই টাকা হবে। কিন্তু একট
শুধু শর্ত—তুমি আমার পাশে থাকবে।

অসিত দেবলীনাকে স্পর্শ করে বলেছিল, আমি তোমার পাশে চিরকাল থাকবো

দেবলীনা বলেছিলেন, কিন্তু অসিত তুমি আমার কোন পরিচয় জানো না
তুমি আমার সাবেক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না। তারপর হঠাৎ যদি কি
জানতে পারো তখন তুমি আমাকে ত্যাগ করে বসবে। তখন কিন্তু সে জ্বালা আ
সহ্য করতে পারবো না।

যদি বলি তোমার অতীত যাই হোক না কেন, আজ তোমার মধ্যে আ
নিজেকে খুঁজে পেয়েছি, তাই বর্তমানকে নিয়ে আমি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব
এই কথা বলে অসিত দেবলীনার খুব কাছ ঘেঁষে বসলো। তারপর আবার
শুরু করলো: জীবনে আমি অনেক টানা-পোড়েনের মধ্যে কাটিয়েছি। আ
যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে ফেরার কোন প্রশ্ন নেই। তোমাকে দেখেই
মনে হয়েছে—এ মেয়ের সঙ্গে থাকলে আমি আমার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে
পারবো। তারপর তুমি যখন এলে তখন আমার মনে হলো, যে কাজ আমি করতে
চাই, সে কাজের তুমি যোগ্য সহচারিণী। এই মাত্র তুমি যে কথা বললে—তা
আমার মনের কথা। কাজেই তোমার অতীত যা হয় হোক না কেন, তুমি

আমার কাছে দেবলীনা হয়েই থাকবে। তার বেশী আর কিছুই আমি জানতেও চাই না, বুঝতেও চাই না।

দেবলীনা বললেন, তোমার এই বিশ্বাসের আমি কোনদিন অমর্যাদা করবো না। তবে তোমাকে একটা গল্প বলবো। এ গল্প তোমার ও আমার দুজনেরই সংশয় যদি কিছু থাকে তা দূর হবে।

এই কথা বলে দেবলীনা শুরু করলেন :

'তিন বছর আগে ফ্রিডা স্কুলের হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি এসেছে। তার মা মারা গেছেন অনেক দিন। বাড়িতে থাকেন বাবা ব্রায়ান। বিপত্নীক ব্রায়ান সুযোগ পেলেই প্যারিসের স্ফূর্তিতে ডুবে থাকেন। বাইরে রাত কাটিয়ে তাঁর তৃপ্তি নেই, বাড়িতেও চাই নারীসঙ্গ। ব্রায়ান তাঁর বাড়িতে প্রণয়িনীদের এনে রাখেন। প্রথম প্রথম ফ্রিডা বাবার এ সমস্ত পছন্দ করত না। মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো। কিন্তু ব্রায়ানের চরিত্রের একটা মাধুর্য ছিল যে সে আমুদে এবং সব সময় আমোদ প্রমোদে ডুবে থাকতে ভালবাসত। কাজেই এই স্বভাবের জন্যই ব্রায়ান সকলকেই আকৃষ্ট করতে পারত। সহজে কেউ তার ওপর রাগ করে থাকতে পারত না। নিজে যেমন স্বাধীনতা ভোগ করত, মেয়েকেও ঠিক তেমনি স্বাধীনতা দিতে তার কোন বাধা থাকত না। বাবা ও মেয়ের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা রীতিবিরুদ্ধ, ব্রায়ান তা মোটেই মানত না। সে কারণে বাবার নিত্যনতুন প্রণয়িনী দেখে ফ্রিডার ঠাট্টা-তামাসা করতে মোটেই বাধত না। ফ্রিডা এই পরিবেশে থেকে প্রথম প্রেমের রঙীন স্বপ্ন দেখার কোন সুযোগ পায়নি। তা ছাড়া বাবার সান্নিধ্য ও প্রভাব ওকে বয়সের তুলনায় সহজেই বেশ বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। সে কারণে ওর বয়স যত বাড়ন্ত না দেখাত তার চেয়ে বেশী বাড়ন্ত ছিল ওর মন।

গ্রীষ্মকাল। সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে ফ্রিডা তার বাবার সঙ্গে। মেরিনা এবার সঙ্গিনী। এই মেরিনা হচ্ছে ব্রায়ানের নতুন প্রণয়িনী। একে সঙ্গে আনার জন্য ফ্রিডা মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু বাবার মুখের ওপর কোন কথা বলার মত তার সাহস হয়নি। তার কারণ ব্রায়ানের স্বভাব-মাধুর্য যে কোন মানুষকে সহজে বশ করে ফেলে। ফলে তাকে কিছুই বলা যায় না। সে কারণে ফ্রিডা মেরিনাকে সহজভাবেই গ্রহণ করল এবং ওদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল।

এই সমুদ্রতীরে কিছুদিন বাস করার পর ফ্রিডার সঙ্গে আলাপ হলো তারই সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে, নাম ডেরিক। সমুদ্র স্নান, পাইন বনে বেড়ান, সাঁতার

কেটে ফ্রিডা ও ডেরিকের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। ডেরিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু বয়সের স্বভাবধর্ম তাকে রঙীন এক স্বপ্নজালে আচ্ছন্ন করে রাখে। কখনও পাইন বনে ওরা ঘুরে বেড়ায়, আবার কখনও বা বেলাভূমিতে পাশা-পাশি শুয়ে ফ্রিডার কুমারী হৃদয়ের ঘুম ভাঙ্গায় ডেরিক। ফ্রিডা এর আগে কখন প্রেমে পড়েনি। রাত্রে তার চোখে ঘুম আসে না। তার চোখের সামনে রাত্রি ধীরে ধীরে দিন হয়ে যায়।

হঠাৎ এই আনন্দোচ্ছল জীবন ধারায় ছেদ পড়ে গেল। ব্রায়ানের নিমন্ত্রণে এখানে বেড়াতে এলো ম্যাভিস মনরো। শ্রীমতী মনরো ফ্রিডার মা'র বন্ধু। মধ্য-বয়সী এই মহিলা বিধবা। বড় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই ব্রায়ানের নিমন্ত্রণে তিনি যেন নতুন এক জীবনের স্বাদ পাবেন বলে ছুটে এসেছেন। অন্তত একঘেয়েমীর হাত থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। বয়স হলেও তার শরীরের বাঁধন অটুট বলা যায়। পুরুষ মানুষকে আকৃষ্ট করার মত তাঁর এখনও সৌন্দর্য আছে।

এখানে এসে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমতী মনরো যেন সংসারের সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। ব্রায়ান এসব ব্যাপারে তত মাথা ঘামান না। তাঁর যা কাম্য তা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু ফ্রিডার মধ্যে শ্রীমতী মনরোর আগমনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তার অসহ্য মনে হতে লাগল শ্রীমতী মনরোকে। কেননা তিনি ফ্রিডাকে ডেরিকের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দিলেন। এমনকি নতুন করে আবার পড়াশুনা করা এবং এক রকম গৃহবন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করলেন শ্রীমতী মনরো। এতে ফ্রিডার মনে ক্রোধ আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

শেষে ফ্রিডা একদিন ডেরিক ও মেরিনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল যাতে শ্রীমতী মনরো খুব জব্দ হয়ে যান। ঠিক হলো মেরিনা ডেরিককে নিয়ে পাইন বনে পথের ধারে শুয়ে থাকবে। এমনভাবে শুয়ে থাকবে যাতে তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে সন্দেহ হয়। ফ্রিডার কথামত ওরা ওইভাবে সমুদ্রতীরস্থ পাইন বনে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়েছিল। ব্রায়ান এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে ঈর্ষা জেগে ওঠে। নিজের বয়স সম্পর্কেও সেই সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠেন।

এর ঠিক পরের দিন ব্রায়ান মেরিনাকে নিয়ে ঠিক ওইভাবে পাইন বনে শুয়েছিলেন। ফ্রিডা ব্যাপারটা জানতে পেরে শ্রীমতী মনরোর কানে তুলে দেয়। প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি ম্যাভিস মনরোর, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার পর তাঁর চেহারা যেন ঝলসে গেল। ব্রায়ানের নারীদেহের প্রতি এই লোলুপতা তাঁর মনকে বিষিয়ে

দিল। তিনি তো তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে ব্রায়ানকে সুখী করতে চেয়েছেন। কিন্তু না—ব্রায়ান চান বহু নারীর সঙ্গ। তাঁর যা স্বভাব, তাকে সুখী করা শ্রীমতী মনরোর পক্ষে সম্ভব নয়।

ফ্রিডা লক্ষ্য করে শ্রীমতী মনরো ছুটতে ছুটতে আসছেন। তারপর তিনি বাড়িতে না এসে সোজা গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি বার করে বেরিয়ে পড়লেন। ফ্রিডা প্রথমটা শ্রীমতী মনরোর ওই রকম অবস্থা দেখে খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু যখন সে জানল—শ্রীমতী মনরো গাড়ি চালিয়ে এমন এক পথে গিয়েছিলেন যেখানে টার্ণিং পয়েণ্ট অ্যাকসিডেন্ট্ হতে বাধ্য, তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শ্রীমতী মনরোর মৃত্যুটা সে চায়নি। আর সমস্ত ব্যাপারটার জন্য ফ্রিডা নিজেকে দায়ী মনে করে এবং সে কারণে তার অনুতাপের কোন শেষ নেই। ফ্রিডা যেটাকে নিছক কৌতুক করার অভিপ্রায়ে করেছিল, তার পরিণাম যে এমন মর্মান্তিক হতে পারে তা ফ্রিডা আশা করেনি। এবার অসিত বলল, তারপর ?

তারপর ফ্রিডা ও ব্রায়ান সমুদ্রতীর থেকে প্যারিসে তাদের নিজেদের বাড়ি চলে আসে। কিছুদিন ব্রায়ান খুব মনমরা হয়েছিল। তারপর মেরিনার মত অন্য কারোকে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সে ভুলে যেতে পেরেছিলো। কিন্তু ফ্রিডার ভুলতে বেশ সময় লাগে। সে কিছুদিন লণ্ডনের বাউণ্ডুলেদের মধ্যে কাটিয়ে দেখল যদি একটু শান্তি পায়। কিন্তু পেল না। তারপর হিপিদের সঙ্গে মিলে ইয়োরোপ, আমেরিকা, বিভিন্ন শহর ঘুরেও শান্তি পেল না। এমনকি ভগবান রজনীশের শিষ্যা হয়েছিল। সেখান থেকে সে পালিয়ে কয়েকজন মিলে চলে আসে ভারতবর্ষে। কেননা ফ্রিডা দেখেছিলো : হিপি বা রকার, বাংক বা জোনার, বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে—যে নামে ডাকা যাক না কেন তাতে না আছে সুখ, না আছে শান্তি। হেরোইন, হাসিস ও মারিজুয়ানায় বুঁদ হয়ে থাকা যায়, কিন্তু জীবন থেকে বহু দূরে সরে যেতে হয়। ফ্রিডা এসব জীবনের স্বাদ খুব ভাল করেই জেনেছিলো। শেষে সে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কখন কালিফোনিয়ায় 'বেদান্ত মঠে', আবার কখন বা সিডনীতে 'জোয়াভাস্ উইটনেস্' বা 'সেভেন ডেজ্ এ্যাড্ভ্যানটিস'-দের মধ্যে গিয়ে ফ্রিডা তার অভীষ্টকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথাও সে পায়নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে দেখেছে সাধু, তস্কর, প্রতারক, ভণ্ড, পাগল, নেশাখোর, চোরাচালান-কারী, মেয়েপাচারকারী, বেশ্যা, কামুক, লম্পট চরিত্রের মানুষকে। এমনকি বিচিত্র ধরনের এক কৃপণকে। যে কৃপণ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে অথচ তার

সঞ্চিত টাকা থেকে একটি টাকাও নিজের জন্য খরচ করতে রাজি নয়। তার বউ ছেলে মেয়ের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

অসিত বলল, ফ্রিডা যে ইস্‌কনে গিয়েছিল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রমে গিয়েছিল, সে কথা এবার বলো।

দেবলীনা হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই বেনামী বন্দরে এসে নোঙর করেছি। ওই যে তোমাকে বললাম, ধর্মের ওপর আর আমার আস্থা নেই। ভাবছি নতুন করে আবার জীবন শুরু করবো। এখন তুমি আমার সঙ্গে আছো তাই আমার বল ভরসা। আগে যা কিছু করেছি সবই একা একা।

অসিত বলল, ভগবান রজনীশ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

দেবলীনা বললেন, তুমি কি জানতে চাও তা জানি না। তবে রজনীশের ধ্যান ধারণাটা একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁর কথা শুনলে মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমি তাঁকে দেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওরেগনে'। পাঁচ হাজার মানুষ সেখানে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। যেখানে ধনী দরিদ্র সব সমান। যার যখন যা চাই সে তাই পেত। কিছুর অভাব নেই। অথচ কারো কাছে কোনো টাকাকড়ি না দিয়েই এই ব্যবস্থা। রজনীশ বলতেন, 'এখানে সকলের একটি মাত্র পরিচয়—তা হচ্ছে 'মানুষ'। এই হিসাবে আমি পাকা কম্যুনিষ্ট। হ্যাঁ। ধর্মীয় কম্যুনিষ্ট। আমার বৈভব, আমার বিত্ত, রজনীশপুরমের সমাজতন্ত্র আমেরিকা সরকারের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করলে আমি সারা আমেরিকাকে জয় করতে পারি। খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন-বোধ করবে। সবাই আমার অনুগামী হয়ে যাবে। তাই আমার ভয় আমেরিকান সরকার যে কোন দিন আমাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।'

অসিত বলল, তুমি তাঁর দর্শন, তাঁর জীবনবোধ সম্পর্কে তোমার যা ধারণা তাই বলো। কেননা রজনীশ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনেক কিছুই পড়েছি। এখন আমি তোমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

দেবলীনা বললেন, রজনীশের বেশভূষায় একটি রাজকীয় ভাব আছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত জোব্বায় ঢাকা। মাথায় জোব্বার সঙ্গে রং মেলান টুপি। পায়েও মানান সই ভেলভেটের চটি জুতো। মাথার বিরল কেশ টুপি দিয়ে ঢাকা। বুক পর্যন্ত তুষারশুভ্র দাড়ি। প্রথম দর্শনেই তাকে ঋষিপ্রতিম বলে মনে হয়। খুব ধীরে ধীরে তিনি কথা বলেন। আর যখন কিছু বলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে ভেসে ওঠে গভীর আত্মবিশ্বাস। তাঁর কোন কথাকেই অসত্য বলে মনে হয় না। কাছ

থেকে তাঁর চোখের দিকে তাকান যায় না। কারণ তাঁর চোখে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে সহজেই মানুষ তাঁর বশীভূত হয়ে পড়ে। আমি অন্তত তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভয় পেতাম। অনেকটা 'হিপ্‌নটিক্‌ আই' বললে ভুল হবে না। সে যাই হোক্‌, রজনীশ ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে খুব ভালবাসেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টার বা টেলিভিশনের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের রজনীশ খুব পছন্দ করেন। তার কারণ, তাঁদের কাছে তাঁর মতামত প্রকাশ করার সুবিধা অনেক। প্রথম কথা—প্রতিবাদের কোন ভয় থাকে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—প্রচার হলে মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে এবং পাঁচ হাজার অনুগামী তখন পাঁচ লাখ হয়ে যেতে পারে। এখানেই তাঁর সাফল্যের চাবি-কাঠি।

রজনীশ হচ্ছেন ধনীদের গুরু। কিন্তু তিনি এ কথা অবশ্য অস্বীকার করবেন। তিনি বলবেন, আমার কাছে ধনী দরিদ্রর কোন ভেদাভেদ নেই। আমার কাছে সবাই সমান। অথচ এই রজনীশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন দরিদ্র দেশ বলে। মুখে বলেছিলেন, 'ভারত তাঁর মত মহামানবের পক্ষে বসবাসের অনুপযুক্ত।'

কেউ যদি রজনীশকে প্রশ্ন করেন: আপনি কি ভগবান?

রজনীশ তার উত্তরে বলেন, 'ওরা আমাকে ভগবান বলে ডাকে। আসলে ওরা আমাকে ভালবাসে। ভগবানের কাছে ওরা যা আশা করে আমার কাছে ওরা তাই পেয়ে থাকে। ওদের কাছে আমি সাক্ষাৎ ভগবান। ঈশ্বর অলৌকিক। আমি লৌকিক। ঈশ্বর অবাস্তব, আমি বাস্তব।'

এসব আলোচনা ও কথা শুনতে ভালবাসে রজনীশের অনুগামীরা। তারা রজনীশকে ঈশ্বররূপী মানুষ বলে মনে করে।

ধর্ম সম্পর্কে রজনীশ চিরদিনই বিরূপ মন্তব্য করে এসেছেন। তিনি বলেন, 'মানুষ তো জন্ম থেকেই মুক্ত। সে কেন তবে নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবে। মানুষের পরিচয় হল সে নিজে। তার জাত নয়, ধর্ম নয়, রং নয়। ধর্ম হচ্ছে প্রেম। ধর্ম হচ্ছে ভালবাসা। প্রেমের বন্ধনে সারা বিশ্ব প্রেমিক হয়ে উঠুক। মানুষ মানুষকে ভালবাসুক এটাই ধর্ম। ধর্ম মানে, প্রেমের বন্যায় সব মানুষ একভাবে বাঁচতে শিখুক, এক অধিকার নিয়ে।'

'মানুষকে ভালবাসতে শেখ। যদি ভালবাসতে পার তবেই বুঝবে এর মর্যাদা। তোমার প্রেমিক সামান্য যদি কিছু উপহার দিয়ে থাকে, তবেই বুঝবে সেই উপহারের মহিমা কতখানি। আমার শিষ্য শিষ্যারা আমার দেওয়া উপহার শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। ভালবেসে দিয়েছি বলে কেউ ফেরাতে পারে না।'

রজনীশ আরো বলে থাকেন : 'কোন নিষেধাজ্ঞা না রেখেই মানুষকে আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করাই। এবং এও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আমার দর্শনের মূল কথা হল ওই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। যাকে আমি মেডিটেশন বা ধ্যান বলে থাকি। এটাই হল সাধনার মূল কথা। ধ্যানের প্রক্রিয়া আমি আমার অনুগামীদের শেখাই। যারা সফল হয়, তারা জানল কী তারা পেল। একেই আমি দিব্যজ্ঞান বলি। সাধারণের সঙ্গে আমার পার্থক্য একটাই। তারা নিদ্রিত, আমি জাগ্রত। তাদের জাগাতেই আমি এসেছি। সেই জাগরণ আনতে পারে একমাত্র আমার দর্শনের মাধ্যমে। যে দর্শন হল ধ্যান করে যাও। চব্বিশ ঘণ্টা। এই ধ্যানের ১১২টি প্রক্রিয়া আছে। তবে যখনই যা করবে সজ্ঞানে করবে। যে অবস্থায় আছো সেখানেই থাক জ্ঞানত একশ ভাগ। এটাই ধ্যান। ধ্যান মানে নয় মুদ্রিত নয়নে আরাধ্য দেবতার ছবি বা মূর্তির সামনে চুপচাপ বসে থাকো। ধ্যান হল সর্বদাই সজ্ঞান আচরণ। এই সজ্ঞান আচরণের দ্বারা মানুষ তার জাগ্রত অবস্থার চূড়ান্তে পৌঁছতে পারে।'

রজনীশ বিশ্বাস করেন : 'যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষ বাধাহীন, অনুশাসনহীন জীবন যাপন করবে। আমি যৌনতার গুরু নই, প্রেমের গুরু। যৌনতার জন্ম প্রেম থেকেই। যেখানে প্রেম মুখ্য, যৌনতা সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। লোকেরা আমার যৌনতাটাই দেখেছে, প্রেম নয়। সেক্স হল জৈব শক্তি বা বায়ো এনার্জি। যে শক্তি সঠিক উপায়ে খরচ করতে পারলে মানুষ তার সাধনার শীর্ষে পৌঁছতে পারে।'

রজনীশ তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন : 'খাবার সময় ধ্যানস্থ হও। উপলব্ধি কর আঙুলের ডগায় খাদ্যের নাড়াচাড়া, জিহ্বার স্বাদ, খাদ্যনালী দিয়ে খাদ্যের প্রবেশ। এই সব উপলব্ধি করাই মেডিটেশান। তেমনি যৌন মিলনের সময়ও ধ্যান করা যায়। ধ্যানের সময় সেক্স নয়, সেক্সের সময় ধ্যান কর। উপলব্ধি কর। আর তাহলেই এক সিদ্ধ পুরুষের জন্ম হতে পারে। তা না হলে শুধুই জৈবিক তাড়নার নিবৃত্তি।'

রজনীশ জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলে থাকেন : 'সারা পৃথিবীটাই যে যৌন বুভুক্ষু। ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ যৌনতাকে জয় করতে পারলে, দেখবে মানুষের জীবনে সেক্সের কোন প্রাধান্যই থাকবে না। থাকবে না কোন ভূমিকা। যা থাকবে তা হল জৈবশক্তিকে সঠিক পথে উত্তরণের প্রচেষ্টা। পৃথিবীর সব সিদ্ধ পুরুষই যৌনতাকে জয় করতে পেরেছেন। তাঁরা

শিখিয়েছেন মানুষের জীবনে যৌনতার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু সন্তান উৎপাদন ছাড়া। এটুকু বলেই অন্যরা খালাস। কিন্তু যৌনতা যে অকিঞ্চিৎকর, তা যৌনতাকে দেখে, জেনে, বুঝে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি কর। নচেৎ যৌন বুভুক্ষু হয়েই পড়ে থাকতে হবে চিরকাল। আমার শিষ্য শিষ্যারা কেউই যৌন বুভুক্ষু নয়। এদের কাছে যৌনতার কোন দাম নেই। সকলেই একে জয় করেছে। তবে কেউ কখনও এর তাগিদ অনুভব করলে তা চরিতার্থ করে। তবে সজ্ঞানে। ধ্যানস্থ অবস্থায়। অর্থাৎ তুমি কখনই ধ্যানের সময় যৌনক্রিয়া করতে পার না। কিন্তু সর্বদাই যৌনক্রিয়ার সময় ধ্যানস্থ হতে পারো।'

দেবলীনা বললেন, রজনীশ নিজেকে ভগবান বলেন না, তবে তাঁর শিষ্য শিষ্যারা তাঁকে ভগবান বলে মনে করেন। আর একটা বিষয়ে রজনীশ স্পষ্ট বলেন, তা হল—ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তিনি বলেন : 'সবাই বলে বিশ্ব সংসার ঈশ্বরের দান। আমি বলি প্রকৃতির। কেন বলি? না, ভগবান বলে কোথাও কিছু নেই।' এ অভিমত রজনীশের দীর্ঘদিনের। তবে এটা ঠিক রজনীশ দারিদ্র্যকে ঘৃণা করেন। তাঁকে বলতে শুনেছি, 'এটা ঠিক দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু দরিদ্রকে নয়। আসলে দরিদ্রের কাছে দর্শনের কপাট বন্ধ থাকেই। কেননা তার চিন্তা তো শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানকে ঘিরেই। দরিদ্র মানুষ শুধু খাদ্যে দরিদ্র নয়, জ্ঞানেও তারা দরিদ্র। রাজনীতিবিদরা যথেচ্ছ হারে সন্তানবৃদ্ধির ওপরই বেঁচে থাকেন। বেশি সন্তান বৃদ্ধি মানেই বেশি দরিদ্র মানুষের সমাবেশ। আর দারিদ্র্যই তো রাজনীতির হাতিয়ার।'

একটানা অনেক কিছু বলে গেলেন দেবলীনা।

অসিত বলল, ইসকন ও দয়াল আশ্রমের মধ্যে কি কোন পার্থক্য দেখেছিলে?

দেবলীনা বললেন, প্রথমটা বুঝিনি। ইসকনে সবই হয় তবে ওদের কৃত্রিমতাটা চোখে পড়ে। সেই ভাগবৎ গীতা পাঠ, পূজা-আরতি, নামসংকীর্তন। অর্থ ও সম্পদের দিক থেকেও ইসকন বেশী ধনী। কিন্তু 'দয়াল আশ্রম' সত্যি ভক্তদের আশ্রম। গোঁড়ামি নেই বলে সনাতন হিন্দু বলে কোন বাচ বিচার নেই। বৈষ্ণব মনে প্রাণে হলেই হবে। তার জাত বা রং নিয়ে কোন তর্ক নেই। স্বভাবতই যারা ইস্‌কনে গিয়ে মন বসাতে পারে না বা ইস্‌কনের পূজা পদ্ধতিতে সায় দিতে পারে না—তারা সোজা চলে আসে এই 'শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ দয়াল আশ্রমে।'

দুপুরের খাওয়ার পালা শেষ। অসিত ও দেবলীনা বিছানায় তাদের দেহ এলিয়ে দিয়ে গল্প করছে। দেবলীনা তাঁর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার

কথা বলছিলেন। পাশাপাশি শুয়ে গল্প করার মধ্যে একটা আমেজ আছে, যে আমেজ শুধু অনুভব করা যায়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কী মনে হলো অসিত জিজ্ঞাসা করল, দেবলীনা নামটা তোমাকে কে দিয়েছেন?

ভগবান রজনীশ। আমার আসল নাম ফ্রিডা লুই। বাবা ইংরেজ মা ফরাসী। প্যারিস তাই বাবার ও আমার খুব প্রিয়। ওখানকার জীবনের সঙ্গে কলকাতার জীবনের বেশ মিল আছে। যখন আমি রজনীশের আশ্রমে যাই তখন আমার এই নামকরণ হয়। দেবলীনা নামটা অনেকেই পছন্দ করে, তাই আমি আর বদলাইনি। সেই থেকে ভারতে অন্তত দেবলীনা নামটা আমার সত্তার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তোমার পছন্দ হয় না অসিত?

অসিত বলল, আমারও খুব ভাল লাগে তাই জানতে ইচ্ছে করছিল এ নাম তোমার কে রেখেছিলেন। তুমি বললে, ভগবান রজনীশ। আমি রজনীশের অনুরাগী না হয়েও তাঁর রসবোধের তারিফ না করে পারিনে। এবার দেবলীনা বললেন, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির উপাসনা দেখে। শুনেছি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় রাজাদের আমলেই বৈষ্ণবধর্ম এক অবতার-বাদী ভক্তিমূলক উপাসনাপদ্ধতিতে পরিণত হয়। এই সেনযুগেই কবি জয়দেব রচনা করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ'। জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে সব পদাবলী রচনা করে গেছেন, তা রতিরসে সিক্তিত। রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ বলা যায়। রাধাকৃষ্ণের লীলা মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। কোন জ্ঞান থাকে না। একটা ভাব এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই বলে ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া। আমিও বহুবার বিভোর হয়ে গেছি। আসলে মানে বুঝতে হবে। মানে বুঝলেই তখন গভীরে প্রবেশ করা যায়। আর মানে না বুঝলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তখন সবটাই কৃত্রিম বলে মনে হয়। পূজা আরতি—এ সব যেন একরকম পূজো পূজো খেলা। যেই তার অর্থ বুঝবে তখনই তার গভীরে যেতে পারবে। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে। চৈতন্য উদয় হবে। আর এই চৈতন্যর জন্যই তো সব। এত পূজো, কর্ম ও নিষ্ঠার অভিনিবেশ। অসিত দেবলীনার ঠোঁটে আবেগের সঙ্গে চুমু খেয়ে বলল, এবার আর কোন কথা নয়। এবার শুধু কাজ। তুমি আর আমি এখান থেকে চলে যাব।

দেবলীনা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব?

অসিত বলল, আমরা যাব বাঙলা ও বিহার সীমান্তে এমন একটা জায়গায় যেখানে শুধু আছে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ। আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে কাজ

করব। এই যে ধর্ম ধর্ম করে মানুষ সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে—আমরা তাদের মধ্যে জাতপাত, ধর্ম, অধর্ম, পাপপুণ্যবোধ সম্পর্কে নতুন এক আদর্শের কথা বলব, যা তাদের মনে এনে দেবে উদারতা। সকলেই একটা মুক্ত মনের অধিকারী হবে। নিখিল বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা কাজ করে যাব। আর্তের সেবা হবে আমাদের পরম ধর্ম। কুষ্ঠাশ্রম করার পরিকল্পনা আছে আমার। যেখানে একযোগে চিকিৎসা ও নিরাময়ের পর পুনর্বাসন। নাম দেব 'সোহাগপুরা'। এই 'সোহাগপুরা'য় যারা থাকবে তারা স্বনির্ভর হবে। আগে আমরা একটা গ্রাম নিয়ে ছোট করে কাজ শুরু করব। তারপর আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে দেখবে কত মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবছ—এ বুঝি আমার এক কল্পরাজ্য বা ইউটোপিয়া। কিন্তু না ভারতবর্ষ দরিদ্রদেশ। এখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করব। গড়ে তুলবো এক নতুন সমাজ, যারা শুধু কাজের বিনিময়ে তাদের ন্যায্য পাওনা পাবে। এখানে শোষণ বা শোষিত কেউই থাকবে না। আমরাও ওই 'সোহাগপুরা'র কর্মী থাকব।

দেবলীনা বললেন, আমাদের কথা শুনলে লোকে ভাববে, আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি, কিন্তু অসিত আমি তোমার সঙ্গে যে কোন জায়গায় গিয়ে যে কোন কাজ করতে পারি। আমি তো সব কিছু ছেড়েই চলে এসেছি। কাজেই আমার কোন পিছটান নেই।

অসিত বলল, তোমার কথা ঠিক। আমাদের এ সব কথা শুনে অনেকেই হয়তো হাসবে, কিন্তু বাবা আম্‌তে বা মাদার টেরেসা তো আমাদের সামনে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা সফল হয়েছেন, আমরা চেষ্টা করলে ওঁদের মত সফল না হলেও ব্যর্থ হব না। তবে শুরু করতে কিছুটা টাকার দরকার। আমি কি ভাবছি জানো?

কি?

আমার এই ফ্ল্যাট, গাড়ি, আসবাবপত্র সব বেচে দিয়ে চলে যাব।

দেবলীনা অসিতের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ও সব এখন থাক। তুমি তো ইচ্ছে করলেই তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিতে পার। তার চেয়ে আমি আমার যা কিছু টাকা পয়সা এখানে নিয়ে আসি। আর তা দিয়ে আমাদের 'সোহাগপুরা' গড়ার কাজ খুব ভালভাবেই হবে। তুমি টাকার চিন্তা করো না। শুধু দেখ আমরা যেন সঠিক পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যেতে পারি।

এই প্রথম অসিত দেবলীনাকে আদর করে বলল, 'হাউ সুইট য়ু আর।'

। ১৬ ।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে 'সোহাগপুরা'। পাশ দিয়ে বহে গেছে সুবর্ণরেখা নদী। অদূরে অযোধ্যা পাহাড়। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শুধু সাঁওতাল নয়, আছে ওঁরাও, কোল, মুণ্ডা, হো, কিষাণ, বিরজিয়া ও অল্প সংখ্যক খেড়িয়া! মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ও বীরভূম। চারদিকে শাল মহুয়া ও পলাশের জঙ্গল। সুবর্ণরেখা ও করকরি নদীর সঙ্গে অযোধ্যা পাহাড়ের ব্যাপ্তি ও দলমা পর্বতমালা এখনও আদিম জঙ্গলের লীলাভূমি।

প্রথম কয়েক একর জমি নিয়ে শুরু হয় 'সোহাগপুরা'। ছোট একটি হাসপাতাল ও তার সঙ্গে বহির্বিভাগ চিকিৎসাকেন্দ্র। হাসপাতালটিতে প্রথম কুড়িটি শয্যা নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন সেখানে চারশোর মত শয্যার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে দেবলীনা ও অসিত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই অঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কাজ করে ওরা বুঝেছে, শুধু অর্থ নয় জনবলও একান্ত প্রয়োজন।

'সোহাগপুরায়' কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এখানে ডাক্তার কার্লেকারের অধীনে চার পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন—যাঁরা এই কেন্দ্রের সব কিছু দেখা-শোনা করে থাকেন। 'কুষ্ঠ বংশগত রোগ নয়।' 'কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসা করলে নিরাময় হয়।' 'কুষ্ঠরোগ প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করালে সহজেই নিরাময় হয় এবং সুস্থ সমাজজীবন যাপন করা সম্ভব।' 'কুষ্ঠরোগের উৎপত্তির কারণ এক ধরনের ভাইরাস।' কাজেই এই রোগ সম্পর্কে গোপন করা উচিত নয়।'

এমনি অনেক কথাই চারিদিকে লেখা আছে। তবু মানুষের মন সংস্কারমুক্ত নয়। কাজেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মানুষকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। চেহারার রূপান্তর আর সেই সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা, যা তাদের তীব্র আত্মিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। কুষ্ঠ রোগ ছোঁয়াচে, এমনি ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু রুগীকে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়। এ সবই অজ্ঞতার কারণ। এক জাতীয় জীবাণু থেকেই এ রোগের উৎপত্তি এবং চিকিৎসা

করলে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হওয়া যায়। তবে কিছু কুষ্ঠরোগ আছে—যা থেকে সংক্রমণ হওয়াটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সমাজে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে, যার ফলে তারা এতকাল সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এদের পুনর্বাসনের কাজের পথপ্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী, মাদার টেরেসা, বাবা আম্‌তের মতন কিছু মহান্ ব্যক্তি।

অসিতের মনে এঁরা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কেননা খুব ছোটবেলায় অসিত বাইবেলের গল্প অবলম্বনে একটি সিনেমা দেখেছিল, যে সিনেমায় একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল : কুষ্ঠ রোগীরা পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আসার জন্য চেষ্টা করছে। যেখানে জনবসতি আছে, খাদ্য আছে, আর আছে একটু আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ প্রান্তে সবল, সুস্থ মানুষরা তাদের দিকে এলোপাথাড়ি শুধু পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছে। যারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষ তারা এই পাথরের আঘাতে আহত হচ্ছে। আবার অনেকেই নিহত হচ্ছে। কী বীভৎস সে দৃশ্য। সেই অমানবিক আচরণ অসিতের কিশোর মনে বিভীষিকা হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, যা উত্তরকালে তাকে এমনি এক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রেরণা যোগায়।

অসিত এ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে জেনেছে : 'প্রাগ ঐতিহাসিককাল থেকে কুষ্ঠরোগ হয়ে আসছে। চরক সংহিতায় এই রোগের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৩০০-১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। খ্রীষ্টান মিশনারী ফাদার ডামিয়েন এই রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মানবতার আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁর দেখাদেখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মিশনারীদের এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়।'

একদিন চায়ের টেবিলে বসে দেবলীনা ডাঃ কার্লেকারকে এই কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। অসিতও এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী। চা পান করতে করতে ডঃ কার্লেকার বলেছিলেন :

'১৮৭৩-৭৪ সালে নরওয়ের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হেনরিক আরমাউর হ্যানসন 'মাইক্রো ব্যাকটিরিয়াস লেপ্রি' অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের জীবাণু 'লেপ্রা ব্যাসিলাস' আবিষ্কার করেন। সেজন্য তাঁর নামানুসারে এই জীবাণুর নামকরণ করা হয়েছে 'হ্যানসন ব্যাসিলাস'। অনেকটা টিউবারকুলোসিস ব্যাসিলাসের মত এসিড ফাস্ট। আর এই আবিষ্কারের ফলে 'কুষ্ঠ বংশগত রোগ' এ ধারণাটাও পালটে যায়। এরপর ১৮৯০ সালে 'হিডনোকার্পাস ওয়েল' ও ১৯৪৩ সালে 'সালফোন' এবং ১৯৬০ ও

কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। আসল কথা হলো—লেপরা জীবাণু থেকেই কুষ্ঠরোগ হয়। তবে অনেকের ধারণা এ রোগ সংক্রামক, সেটা কিন্তু ভুল। তবে শতকরা আশিভাগ কুষ্ঠরোগ সংক্রামক নয়, বাকি কুড়ি ভাগ সংক্রামক। এবং এই কুড়ি ভাগ সংক্রামক কুষ্ঠরোগ মাত্র ছ'সপ্তাহ চিকিৎসা করে সংক্রামক মুক্ত করা সম্ভব।

অসিত এবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা ডঃ কার্লেকার এ রোগের উপসর্গ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন, তা হলে ভাল হয়।

ডঃ কার্লেকার একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলেন: 'দেহের চামড়ার কোন অংশে যদি দেখো রঙটা অন্যরকম হয়েছে এবং সেই অংশে আংশিক বা পূর্ণমাত্রায় অসাড় হয়ে গেছে, অর্থাৎ ছুঁচ ফোটালে সাড়া পাওয়া যাবে না। এমন কি গরম বা ঠাণ্ডার কোন বোধশক্তি থাকবে না। তাহলেই বুঝতে হবে এই রোগের জীবাণুর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ছাড়া হাতের বা পায়ের নার্ভগুলো যদি ফুলো ফুলো হয়ে ওঠে এবং তা টিপলে বিদ্যুৎ চমকানোর মত ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে, তখন কোনক্রমেই অবহেলা করা উচিত হবে না। কেননা এর ফলেই পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। আবার কারো কারো চামড়ার অংশ বিশেষ অনেকটা সুপারীর মত ফুলে ওঠে। এগুলো চুলকায়, কিন্তু আগুনে পুড়ে গেলে বা কেটে গেলে ব্যথা বোধ করে না। এ সব ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আবার আর এক ধরনের উপসর্গ দেখা যায়—তা হচ্ছে ঘন ঘন সর্দি হয়, নাক দিয়ে সব সময় শিকনি ঝরে বা রক্ত পড়ে। এদের এই হাঁচি থেকেই জীবাণু সংক্রামিত হয়। এদের সম্পর্কে খুব বেশী সাবধান থাকা প্রয়োজন এবং এ সব উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে অতি অবশ্যই যাওয়া উচিত। প্রাথমিক স্তরে চিকিৎসা করলে এ ব্যাধি থেকে নিশ্চয় মুক্তি পাওয়া যায়।'

এবার দেবলীনা বললেন: আচ্ছা ডাক্তারবাবু দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অনেকেই তো বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু হয়ে যেতে দেখা যায়। এদের সম্পর্কে আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা করতে পারি?

ডঃ কার্লেকার বললেন, অপারেশন করে তাদের আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

দেবলীনা বললেন, আমরা তো মাত্র তিনবছর হলো কাজ শুরু করেছি। এখন এখানে পরিকল্পনা মত কাজ করতে আরো পাঁচ বছর লাগবে।

এবার অসিত বলল, আমার ও দেবলীনার মনের বাসনা হচ্ছে: আমরা এমন

একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো, যেখানে মানুষ আসবে তাদের একটা বিশ্বাস নিয়ে। আর সেই বিশ্বাস হচ্ছে—আশা, এখানে এলে নিশ্চয় ব্যাধিমুক্ত হওয়া যাবে। তারপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে, যার ফলে এদের নিয়ে গড়ে উঠবে নতুন এক সমাজ।

দেবলীনা বললেন, ভেলোরে লোকে ছুটে যায় সুচিকিৎসা হবে এই আশা নিয়ে। ভেলোর তো মিশনারি পরিচালিত সংস্থা। তাদের অর্থবল ও জনবল দুইই আছে। আমাদের কিন্তু ওই দুটিরই বড় অভাব।

ডাঃ কার্লেকার এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং তারপর বললেন, অনেকে একক প্রচেষ্টায় কত কি করে। আমরা কিন্তু তিনজন। কাজেই চেষ্টা করলে নিশ্চয় আমরা কিছু করতে পারবো। কেননা তিনজনেরই নিবেদিত প্রাণ। ইংরিজিতে বললে বলা যায়, 'ডেডিকেটেড লাইফ'। আর আমাদের সম্পর্ক? সম্পর্ক হচ্ছে: ম্যান, উম্যান এ্যাণ্ড ম্যান। তার মানে—পুরুষ, প্রকৃতি ও পুরুষ।

আমাদের প্রধান কাজ কি জানেন? সারা ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। আমাদের লক্ষ্য হবে—কুষ্ঠরোগকে নির্মূল করা এবং কুষ্ঠরোগমুক্ত লোক যেন সামাজিক ও আর্থিক ন্যায় বিচার লাভ করে।

এই কথা বলে ডাঃ কার্লেকার হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে তখনকার মত অসিত ও দেবলীনার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

অসিত ও দেবলীনা হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ, কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদ ও লেপ্রসি মিশনারি সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে। 'সোহাগপুরা'য় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়ে থাকে। আর চিকিৎসার ব্যাপারটা ডাঃ কার্লেকারের তত্ত্বাবধানে বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলে। মাঝে মাঝে অসুবিধা দেখা দেয়—তার কারণ এই রোগের চিকিৎসার জন্য যে সব ওষুধের সব চেয়ে প্রয়োজন সেগুলির দুষ্প্রাপ্যতা।

আজকাল দেবলীনার সঙ্গে অসিতের কথা বলারই কোন সুযোগ থাকে না। সারাদিন নানা কাজের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে যে সময় কেটে যায়—তা ওরা বুঝেই উঠতে পারে না। অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর রাত্রে যখন শোবার পালা, তখন আর তেমন কোন কথা হয় না। দায়িত্ব আসার পর থেকেই মানসিক একটা চাপ অন্য সকল চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। তখন শুধু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলে। কাজেই ওদের মধ্যে কথা তেমন হয় না। আর যদি বা হয়, তা এই প্রতিষ্ঠানের বিষয় নিয়েই হয়। আগে যেমন অসিত ও দেবলীনা

খুব কাছাকাছি হলে অন্য চিন্তা আসতো, এখন কিন্তু সে সব চিন্তা মনেই আসে না। এখন শুধু কাজ আর কাজ। এখন শুধু চিন্তা কি করে দুর্গতদের পাশে থেকে মুক্তির নিশানা দেখাতে পারে। এখন শুধু চিন্তা কি করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাধিমুক্ত করে আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

এ সবের বাইরে যদি কখন কোন কথা হয়—তা ওই খাবার টেবিলে বসে। অথবা শোবার সময়। রাত্রে শোবার সময় ইদানীং তেমন কোন কথা হয় না। তার প্রধান কারণ, অসিত ও দেবলীনা সারাদিনের পরিশ্রমে এত ক্লান্ত থাকে যে, বিছানায় শুলেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য মাঝে মাঝে যে এর ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়।

এই তো সেদিন ওষুধ, রোগীদের নিয়ে কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ডাঃ কার্লেকার প্রসঙ্গে কথা উঠতে অসিত বলেছিল, ওঁর জীবনে একটা শোক আছে। এই শোককে ডাঃ কার্লেকার কিছুতেই ভুলতে পারেননি। যার জন্য তিনি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে জীবনের শোককে ভুলে থাকতে চান।

কি সেই শোক? জিজ্ঞাসা করলেন দেবলীনা।

অসিত বলল, সে কাহিনী একদিকে যেমন করুণ, অপরদিকে তেমনি মর্মান্তিক। বিলেত ফেরৎ ডাক্তার কার্লেকার। ওঁর বাবা ছিলেন বৃটিশ আমলের জাঁদরেল রাজকর্মচারী। সেকালের সিভিল সার্ভিসে যোগ্যতা প্রমাণের মাপকাঠি ছিল—স্বজাতি নিধন ও নিপীড়ন। প্রভুভক্ত বলতে যা বোঝায়—তাই ছিলেন ডাঃ কার্লেকারের বাবা। সাত পুত্র ও এক কন্যার জনক ছিলেন ডাঃ কার্লেকারের বাবা। বহু উচ্চপদে তিনি আসীন ছিলেন। বিপ্লবীদের ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নির্বিচারে অত্যাচার চালানোর জন্য তিনি টেগার্ট সাহেবের সমকক্ষ ছিলেন। যার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ কার্লেকারের বাবার সাংসারিক জীবন সুখের ছিল না। বড় ছেলে বদ্ধ উন্মাদ, মেজ ছেলে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে যায়। সেজ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করে। এমনি সব ছেলেরাই কেউ মদ্যপ ও জুয়াড়ী, কেউবা আফিমের চোরাচালানের ব্যবসায়ে ধৃত হয়ে জেল খাটছে। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ডাঃ কার্লেকার। এমনকি একমাত্র কন্যাও স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে পিতৃগৃহে থেকে ভ্রাতৃবধূদের নির্যাতনে পারদর্শিনী হয়ে ওঠে। মোট কথা পরিবারটিকে অভিশপ্ত পরিবাব বলে চিহ্নিত করা যায়।

ডাঃ কার্লেকার যেন এই পরিবারের কেউ নন। বিলেত থেকে পাশ করে' এসে ইনি কলকাতায় তাঁর চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। বিয়ে করেন এক বাঙালি মহিলাকে। যার জন্য তিনি পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। শেষে তিনি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরূপে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁরও জীবনে এ সুখ বেশী দিন সহ্য হলো না। তাঁর একমাত্র পুত্র আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। যার ফলে ডাঃ কার্লেকারের জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। এর কিছু দিন পরে ডাঃ কার্লেকারের স্ত্রী মারা যান। তখন ডাঃ কার্লেকার একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে যাবার জন্য তিনি এক রকম প্রস্তুত। এমন সময় আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় আমারই এক বাল্যবন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মারফৎ। তাঁর সব কথা শুনে আমি শুধু বলেছিলাম : দেশত্যাগী হয়ে আপনি আপনার লোককে ভুলতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা সেবাপ্রতিষ্ঠান করবো। সেই সেবার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন আতুর জনের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করবো, তেমনি তাদেরই মধ্যে আমরা নতুন করে জীবনকে খুঁজে পাব।

ডাঃ কার্লেকার আমার কথা শুনে আর দ্বিরুক্তি করেন নি। তিনি তাঁর যথা সর্বস্ব বিক্রি করে এখানে চলে আসেন। এখন তিনি আমাদের ট্রাস্টের একজন সদস্য। এমন একজনকে আমরা যদি না পেতাম, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতো কিনা সন্দেহ হয়।

এতক্ষণ দেবলীনা চুপ করে অসিতের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন. সংগঠনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না উঠলে কোন কিছুরই সফল রূপায়ণ হয় না। ডাঃ কার্লেকারকে দেখলে বোঝা যায় না তাঁর জীবনে এত দুঃখ আছে। সদা হাস্যময় এই প্রবীণ মানুষটিকে দেখলে মনে হয় : তিনি যেন ঈশ্বর প্রেরিত কোন মহামানব, জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর এই আবির্ভাব।

অসিত দেবলীনার এ কথার কোন উত্তর দিল না।

দেবলীনা অসিতকে একটু নাড়া দিয়ে একরকম তার বুকের ওপর বুক দিয়ে' চোখে চোখ রেখে বললেন, সত্যি করে বলতো আমি ঠিক বলছি না?

অসিত দেবলীনাকে তার দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।

নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে এবার দেবলীনা অসিতকে জিজ্ঞাসা করল, কুষ্ঠরোগ ও তার নিরাময়ের জন্য তুমি কেন আগ্রহী হলে? সমাজসেবা ও গঠনমূলক তো

আরো অনেক কাজ ছিল। সে সব ছেড়ে দিয়ে তুমি এই কাজে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করলে। এর পেছনেও কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

অসিত বলল, এ রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা ভীতি আছে। রোগমুক্ত হবার পরও সমাজে তাদের ঠাঁই মেলে না। এমন কি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই রোগ সম্পর্কে একটা কুসংস্কার আছে। তাই আমি মনে করি, এদের সেবা করা সত্যিকারের কাজ করা। মানবতার জন্য অন্তত সকলেরই করা উচিত। তা ছাড়া বাইবেলের গল্পে ওই দৃশ্যটা বেশী করে আমাকে প্রভাবিত করেছে।

দেবলীনা বললেন, আমার ধারণা ছিল তুমি 'শাম্ব উপাখ্যান' থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছ।

অসিত বলল, ওটা মিথ্। ধর্ম মিথ্‌কে আশ্রয় করে মানুষের মনকে জয় করে। তোমার কি মনে হয়?

দেবলীনা বললেন, আমি তোমার মত অত গভীরভাবে কিছুই ভাবি না। আশ্রমে থাকতে শুনেছিলাম। 'শাম্বর উপাখ্যান' শুনে আমি খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। একজন নির্দোষ মানুষকে অভিশাপ দেওয়া হলো। তার অপরাধ সে রূপবান, বীর, আর পিতৃভক্ত। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বজ্ঞ হয়েও মহর্ষি নারদের এই কূটচালটি বুঝতে পারলেন না? আর একটা বিষয় আমাকে ওই সময় খুব ভাবিয়েছিল, তা হচ্ছে—যিনি মহর্ষি তিনি অতি একটা তুচ্ছ ব্যাপারে এত রুষ্ট হবেন কেন? শাম্ব মহর্ষিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেনি। গোপ রমণী পরিবৃত হয়ে শাম্ব শুধু ওদের লক্ষ্য করছিল। এ নয় যে শাম্ব সে সময় গোপ রমণীদের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মগ্ন হয়েছিল এবং মহর্ষির উপস্থিতিকে গ্রাহ্যে আনেনি। আসলে শাম্বর অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখে গোপরমণীরা বিমোহিত হয়ে যায়। রমণীসুলভ চপলতায় তাদের মধ্যে এমনই উচ্ছাস প্রকাশিত হচ্ছিল যে তা দেখে শাম্ব শিহরিত না হয়ে বিস্ময় বোধ করেছিল। মহর্ষি নারদ এতে রুষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবের গোচরে আনার জন্য কূটকৌশলের চিন্তা করেন। মহর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর পুত্র শাম্বর কথা তুলেছিলেন। বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান বংশধরটির প্রতি মহর্ষি এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণকে সরাসরি বলেছিলেন: আপনার ষোল হাজার গোপ রমণী শাম্বর সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হতে আমি দেখেছি। তাই পাপের ছায়া দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত।

এ অসম্ভব! শাম্ব সম্পর্কে এ অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষিকে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন।

মহর্ষি বলেছিলেন, আমি দ্বারকা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। যথা সময়ে আপনি স্বচক্ষে যখন দেখবেন তখন বিশ্বাস করবেন।

এই বলে মহর্ষি তথনকার মতন দ্বারকা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার মহর্ষি নারদ দ্বারকায় এসে প্রথমেই গেলেন শ্রীকৃষ্ণের রৈবতক পর্বতের গহনে প্রমোদ কাননে। সেখানে তিনি দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোল সহস্র রমণীদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। নানা ক্রীড়া কৌতুক ও উচ্ছাসে রমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে জলক্রীড়ায় মত্ত তখন মহর্ষি নারদ জাম্ববতী তনয় শাম্বকে বললেন, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বীর শাম্ব, যুদ্ধ বিশারদ শাম্ব, রূপবান শাম্ব মহর্ষির কথাকে সত্য মনে করে শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদকাননে গিয়ে উপস্থিত হলো।

শাম্বকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ একটু বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু ষোল সহস্র গোপরমণী শাম্বের রূপলাবণ্য দেখে এমনই বিহ্বল হয়ে পড়ল যে তাদের আচরণে প্রকাশ হয়ে পড়ল তারা কামাতুরা। শাম্বর সঙ্গলাভ যেন তাদের একমাত্র কাম্য।

রমণী চরিত্র সম্পর্কে মহর্ষি অভিজ্ঞ ও ত্রিকালদর্শী। তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। যার অর্থ—আর অবিশ্বাস করার কিছু আছে? শ্রীকৃষ্ণ উঠে এসে শাম্বর দিকে একবার তাকালেন। তারপর তার এই অপ্রতিম রূপলাবণ্য লক্ষ্য করে বললেন, তোমার এ রূপ বিনাশ হোক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।

শাম্ব শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পড়ে আকুতি মিনতি করে বলল, কোন্ অপরাধে আমাকে এই অভিশাপ দিলেন পিতা? আমি তো কখনো পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করিনি। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি ও প্রদ্যুম্ন যদুবংশের অন্যান্য বীরদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছি। আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন রমণীগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হয়। জ্ঞানত আমি আপনার কখনো অবাধ্য হইনি। তবে কেন আপনি আমাকে এই অভিশাপ দিলেন? এ তো সেই 'অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার।' আমাকে ক্ষমা করুন পিতা।

শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর শাম্বর ব্যাকুলতা দেখে শান্তস্বরে বললেন, এ তোমার ভবিতব্য। আমার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হলো।

দেখতে দেখতে অপূর্ব কান্তি শাম্বর দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তার সারা দেহে কুষ্টরোগের প্রকোপ দেখা গেল। তবু শাম্ব পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও মহর্ষি নারদকে প্রণাম করে দ্বারকা ছেড়ে চলে গেল। বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান পুত্রটি

সারা অঙ্গে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে তারপর থেকে ভিক্ষায়ে জীবনযাপন করতে লাগল।

দেবলীনা এই বৃত্তান্ত শেষ করে বললেন, শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে আমরা একরকম দেখি, আবার মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অন্যরূপে, কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও নির্দোষ পুত্রের প্রতি যে ব্যবহার করলেন, তা প্রকৃতই নিষ্ঠুর। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এ হচ্ছে ঘোর অন্যায়। স্বাভাবিক কারণে শাম্বর প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অসিত বলল, এই উপাখ্যানে দুটি মহৎ ইঙ্গিত আছে। একটি হচ্ছে নারী চরিত্র সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়টি হলো—শাপগ্রস্ত শাম্ব অন্ধদের শাপমুক্তির পথ দেখাবে।

দেবলীনা বললেন, রূপই কাল হয়েছিল শাম্বর। ঈর্ষাই তার এই পরিণতির জন্য দায়ী।

অসিত বলল, ওই কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমি কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে পারি: 'রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব।'

এই বলে অসিত দেবলীনাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করল। দীর্ঘদিন পরে বলেই তা দীর্ঘস্থায়ী হলো।

। ১৭ ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দয়াল আশ্রম এখন যেন কি রকম ম্রিয়মাণ বলে মনে হয়। আগে যেমন সব সময় উৎসবে মুখরিত থাকত, চারিদিকে শুধু আনন্দে মাতোয়ারা বলে মনে হতো, এখন সে তুলনায় কেমন যেন নিষ্প্রভ। অপরাহ্নের আলোর মত নিঝুম, নিস্তব্ধ, প্রাণহীন বলে মনে হয়। অথচ আশ্রমে যথারীতি সন্ধ্যারতি, নাম-সংকীর্তন সবই হয়ে থাকে। ভক্তরা সমবেত হন এবং বিদেশী শিষ্য শিষ্যারা পূর্বের মত তাঁদের যা কিছু করণীয় তাই যথাযথ করে থাকেন, তবুও আশ্রমের কিসের যেন অভাব। কী যেন নেই। আশ্রমের চরিত্র যেন বদলে গেছে।

স্বামী মাধবানন্দ আর আশ্রমের দায়ভার বহন করতে অনিচ্ছুক। তিনি তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীকে এই আশ্রমের প্রধান পদে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ

করেছেন। অনেকেই আছেন যাঁরা স্বামী মাধবানন্দের স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য। কিন্তু পরমানন্দ ও রঞ্জাবতী স্বামীজীর অতি বিশ্বাসভাজন। সেকারণে ভক্তদের মধ্যে এ নিয়ে একটু যে গুঞ্জন হয়নি তা নয়, তবে সরাসরি এ বিষয় নিয়ে কেউই আলোচনা করেননি। স্বামী মাধবানন্দ যা স্থির করবেন—তার ওপর আর কোন কথা নয়। তিনিই তো সব এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে সকলেই স্বীকার করে নেবেন। এর কোন দ্বিরুক্তি নয়।

যথা সময়ে সেই দিনক্ষণ ঠিক হলো। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। মন্দির চত্বরে খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন হচ্ছে। পূজা শেষে স্বামী মাধবানন্দ রঞ্জাবতীকে আহ্বান করলেন। মন্দিরের কপাট বন্ধ হয়ে গেল। স্বামী মাধবানন্দ রঞ্জাবতীকে বীজ মন্ত্র দেবেন। স্বামীজী তাঁর ভক্তাগ্রগণ্যকে এতদিন যা কিছু সঞ্চয় করেছেন সবই তা উজাড় করে দেবেন। এই দেওয়ার মধ্যেই তো মোক্ষ, আর রঞ্জাবতী হবেন শুদ্ধাপ্রাণা। গুরুর কৃপায় তিনি হবেন পরম সাধিকা।

দীর্ঘ সময় ধরে মন্দিরের কপাট বন্ধ থাকে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে দুটি মানুষ পূণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের জন্য আকুল হয়ে পড়ে থাকেন। বাইরে তখন খোল করতাল সহযোগে নাম-সংকীর্তন হচ্ছে।

এইভাবে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। একটা ঘোরের মধ্যে ভক্তবৃন্দ শুধু নামগান করে যাচ্ছেন। কিন্তু মনে মনে সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন স্বামী মাধবানন্দের ভাষণ শোনার জন্য। অবশ্য তিনি যদি ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার পর অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মুখে অবশ্য কেউই তা প্রকাশ করেন না। তবে কী স্বামী মাধবানন্দ রঞ্জাবতীকে গুরুবাদী পরকীয়া বৈষ্ণবী শক্তির আস্বাদনে দীক্ষা দিচ্ছেন, না অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে দীক্ষিত করছেন? আসলে সকলেই প্রকৃত তথ্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। এবার ভক্তগণ আকুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এমন সময় মন্দিরের কপাট খুলে গেল। রঞ্জাবতী দাঁড়িয়ে আছেন যেন অগ্নিময়ী শিখা। রঞ্জাবতীকে দেখে ভক্তগণ সাশ্রুনয়নে শুধু তাঁকে দেখতে লাগলেন। আর কোন ক্রন্দনধ্বনি নয়। নাম সংকীর্তনও বহু আগে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে। রঞ্জাবতী ভক্তগণের উদ্দেশ্যে বললেন, স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেছেন।

ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন, স্বামীজীর সূক্ষ্ম দেহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহটির কী হলো?

এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি রত্নাবতী। শুধু তিনি জানালেন: স্বামীজী তাঁকেই এই আশ্রমের প্রধানা করে গেছেন। তিনিই স্বামীজীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

কিন্তু স্বামী মাধবানন্দের এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের বিষয় আর কেউই কোন আলোকপাত করতে পারেননি। নিরুপমার মৃত্যুও যে রহস্যজনক সে বিষয়ে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু সে রহস্যের কোন কিনারা হয়নি। কোন অজ্ঞাত কারণে এমন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেল তা কেউই কিছু বলতে পারেননি। শুধু নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন গত্যন্তর দেখা যায় না। এর পরের ঘটনা আরো করুণ বলে মনে হয়।

পুরীর সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের প্রবেশ পথে পরমানন্দ ব্রহ্মচারীকে দেখা যায় —আকুলি বিকুলি করে কাঁদছেন। মাঝে মাঝে শুধু অস্ফুট স্বরে বলছেন, হে মহাপ্রভু, কোন পাপে আজ আমার এই মহাব্যাধি হলো। আমি অভিশাপগ্রস্ত বাসুদেব পুত্র শাম্বর মতন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। আমি তো জ্ঞানত কোন পাপ করিনি! তবে কেন আমার এই মহাব্যাধি হলো? তবে কি আমি ব্রহ্মচর্য যথাযথ পালন করিনি? তাই কি আমার সারা অঙ্গে এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছে? তবে কি এও আমার ভবিতব্য বলে আমি স্বীকার করে নেব? আমি যদি কোন পাপ করে থাকি তবে তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে করেছি। আমি যদি ব্রহ্মচর্য পালন কালে কোন ভ্রষ্টাচারণ করে থাকি, তবে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ।

হে মহাপ্রভু, আমি তো শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছিলাম। তবে কোন্ মহাপাপে আজ আমার দেহের এই বিকৃতি ঘটল? কোন্ মহাপাপে আমার বহিরাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল? আমাকে নিদান দিন প্রভু। আমাকে নির্দেশ দিন, কীভাবে আমি এই ব্যাধিমুক্ত হবো।

আমি এই বীভৎসতা থেকে মুক্তি চাই, আমি এই কুশ্রীতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই। এই মহাব্যাধি কালে কালে আমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনার এই পদপ্রান্তে আত্মাহুতি দেওয়া অনেক শ্রেয়।

গৌরতনু পরমানন্দকে এইভাবে মন্দিরের প্রবেশ পথে আকুলি বিকুলি করে কাঁদতে দেখে জনৈক প্রবীণ এক তীর্থযাত্রী বেশ বিচলিত বোধ করেন। তিনি পরমানন্দকে দেখে বুঝেছিলেন: ইনি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। মুণ্ডিত মস্তক ও শিখা এবং পরনে শ্বেতশুভ্র ধুতি ও চাদর। কণ্ঠে তুলসীমালা। অনুমান করতে ভুল হয় না যুবকটি বৈষ্ণব। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের প্রবেশ পথে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মহাপ্রভুর

কাছে তার আকুল আবেদন জানাচ্ছে। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সামনে বহু কুষ্ঠরোগীকে তিনি ভিক্ষা করতে দেখেছেন, কিন্তু পরমানন্দকে দেখে তাঁর কি রকম মায়া হলো। কেননা তিনি অনেকক্ষণ ধরে সব কিছু লক্ষ্য করেছেন এবং পরমানন্দের আর্তি দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি উঠে দাঁড়ান। কি হয়েছে আপনার?

পরমানন্দ ভদ্রলোকের কথামত উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দেহের যে সব স্থানে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়েছে সেগুলি শুধু দেখিয়ে দিলেন। মুখে কিছু বললেন না।

ভদ্রলোক পরমানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মুখমণ্ডলের বহু অংশে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। অপূর্ব এক রূপবান ব্যক্তি এই মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি হতাশ হবেন না। কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। চিকিৎসা করলে আপনি আবার সুস্থ হয়ে যাবেন। আমি নিজে ডাক্তার। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমি আমার এক পরিচিত বন্ধু আছে তাঁর কাছে চিঠি লিখে দিতে পারি। দেখবেন কিছুদিন চিকিৎসা করালে আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

পরমানন্দ বললেন, আমার এ কুষ্ঠ সারার নয়। আমার হাতের আঙ্গুলগুলি অবশ হয়ে গেছে। এরপর আমি বিকলাঙ্গ হয়ে যাব।

না, আপনি কিছুতেই বিকলাঙ্গ হবেন না। শুনুন, কুষ্ঠরোগে বিকলাঙ্গ হলেও অস্ত্রোপচার করার পর আবার অনেক স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কিন্তু এখানে চারিদিকে তো কুষ্ঠরোগী দেখি। তারা পচে গলে পথের ধারেই মরে পড়ে থাকে। এদের তো চিকিৎসা করা যায়।

ভদ্রলোক বললেন, কেন যাবে না? তবে এরা অনেকেই চিকিৎসা করাতে চায় না। ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকতে চায়। এটাই এদের জীবন ধর্ম।

ভদ্রলোক নিজে ডাক্তার এবং অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি বললেন, এক কাজ করুন, আপনি আমার সঙ্গে কাল চলুন। কালই আপনাকে ওখানে পৌছে দিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাব।

এবার পরমানন্দ বললেন, কিন্তু এ রোগ তো ছোঁয়াচে।

ভদ্রলোক পরমানন্দর হাতটি ধরে বললেন, সব কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে নয়। কিছু কিছু আছে যেগুলি সংক্রামক। এই তো আমি আপনাকে স্পর্শ করলাম। ছোঁয়াচে হলে কি এমনভাবে আপনার হাত ধরতাম?

এই কথায় পরমানন্দের পুচ্ছহীন চোখ দুটি জলে ভরে গেল। কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের ইচ্ছা করে পরমানন্দর, কিন্তু পারেন না। বোধহয় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মনে সঙ্কোচের ভাবটা বেশীভাবে দৌরাত্ম্য করে। চোখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, মুখ হয়ে যায় বাক্যহীন।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি এখানে থাকেন কোথায়?

পরমানন্দ বললেন, আগে থাকতাম আশ্রমে। এখন থাকি পথে। আমার যা রোগ তাকে মানুষ ঘৃণা করে। কাজেই আমি মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থাকি।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

এই কথায় পরমানন্দ খুব বিস্ময়বোধ করেন।

তারপর ভদ্রলোক পরমানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, আপনি আজকের দিনটি আমার সঙ্গেই থাকবেন। আমি এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠেছি। আগামীকাল আমরা যাত্রা করবো আমাদের গন্তব্যস্থলে। এবার আপনাকে আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম ডাক্তার হিরণ সান্যাল। আদি নিবাস ছিল রাজসাহী। বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা। সরকারী হাসপাতালে চাকরি করতাম। সেই সুবাদে বহু হাসপাতালে কাজ করতে হয়েছে। বছর পাঁচেক আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু এখন চিকিৎসা করে থাকি, তবে যারা গরীব, দুঃস্থ কেবল মাত্র তাদের। এজন্য সপ্তাহে একদিন বাঁকুড়া ও একদিন বীরভুম জেলার সিউড়িতে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্র আছে—সেখানে যাই। বাকি দিনগুলি কলকাতায়। এ সবই দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্র। এই সব জায়গায় বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয় এবং ওষুধ পত্তরও আমরা যতটা পারি বিনা পয়সায় দিয়ে থাকি। আমার মতন কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক আছেন তাঁরাও আমার সঙ্গে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকেন। সরকার তো বিনা খরচে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করে থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেসরকারি এই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। একটা কথা সত্যি, গরীব মানুষরা তবুও চিকিৎসার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এজন্য আরো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রয়োজন। এটা অবশ্য আমার নিজের কথা।

এতক্ষণ পরমানন্দ ডাক্তার হিরণ সান্যালের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এবার ডাক্তার সান্যাল একটি বাড়ির সামনে এসে বললেন, আমরা এখন পৌঁছে গেছি। এই বাড়ি। আসুন বলে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন।

পরমানন্দ কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরমানন্দকে আসতে না দেখে ডাক্তার সান্যাল বললেন, কি হলো ভেতরে চলে

ম্বন।

পরমানন্দ বললেন, আপনাকে বিব্রত করছি না তো?

না। কোন ক্রমেই নয়। এটা এখন আমার বাসস্থান। আমার অতিথিকে খানে নিয়ে আসার অধিকার আছে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আসুন।

পরমানন্দ ভিতরে এলেন। তিনি ডাক্তার সান্যালকে যতই দেখছেন ততই স্মিত হচ্ছেন। পরমানন্দর জন্য অবশ্য পৃথক একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে লেন ডাক্তার সান্যাল। তারপর বললেন, আপনি স্নান করে নিন। আপনার রের পাশেই বাথরুম আছে। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা সেরে আমরা বিশ্রাম রবো।

এসব দেখে শুনে হতবাক হয়ে যান পরমানন্দ। মনে মনে ভাবেন: ডাক্তার ন্যাল কী তাহলে মহাপ্রভু প্রেরিত কোন মহান্ ব্যক্তি। এতটা তো আশা রেননি পরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

যাই হোক স্নান ও আহারের পর্ব শেষ হতে ডাক্তার সান্যাল তাঁর ধুতি ও ঞ্জাবী দিলেন পরমানন্দকে।

আগামীকাল আপনি আপনার পোষাক বদল করে নেবেন। এখন থেকে পনি সাধারণ মানুষের মত ধুতি আর পাঞ্জাবী পরবেন। তারপর রোগমুক্তির আবার ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করবেন।

পরমানন্দ কাপড জামা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতদিন ধরে বিশ্বাস তিনি লালন করে আসছেন, আজ এই মুহূর্তে তা পরিহার করা খুবই ঠিন।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, আপনি কৃষ্ণভক্ত। এ শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা আপনি ব্যাধি- হয়ে আবার তাঁর সেবা করবেন। আরাধনা করবেন।

পরমানন্দ বললেন, আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেছলাম। আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রদর্শিত পথেই চলবো। যদি আমি রোগ্য লাভ করি তবে আমি আপনার অনুগামী হবো।

এবার আপনাকে একটা কথা বলি, কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। চিকিৎসা লে আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য মরা এই রোগকে গোপন করি। মৃত্যু অবধারিত মনে করে হতাশাগ্রস্ত হই। এটা হচ্ছে একধরনের লেপরা জীবাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। হিডনো- র্পাসওয়েল চিকিৎসা বা সালফোন চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়

হয়ে যাওয়া যায়। ওই যে আপনি বলছিলেন : এ পাপের ফল। মহাপাতকের
এই মহাব্যাধি। তাহলে আপনাকে বলি—ভবিতব্য-টবিতব্য সব বাজে কথা।
জীবাণু সংক্রামক হলে এ রোগ হবেই। আবার চিকিৎসা করলে নিশ্চয় সারে।
তবে আমাদের সমাজ এখনও খুব রক্ষণশীল। তাদের বদ্ধমূল ধারণা কুষ্ঠ সংক্রামক
ব্যাধি। এমনকি এ ব্যাধি বংশ পরম্পরাগত বলে ধারণা। প্রকৃতপক্ষে তা নয়।
কুষ্ঠরোগীর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ সংক্রামক, বাকি ৮০ ভাগের রোগ সংক্রমণ করার
ক্ষমতা থাকে না। আর চিকিৎসা করলে কুষ্ঠরোগ ১৮ মাস থেকে ২৪ মাসের মধ্যে
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়।

পরমানন্দ বললেন, আপনার কৃপা লাভে আমি ধন্য।

কৃপা নয়, কৃপা নয় পরমানন্দজী। এ হচ্ছে মানবতার ধর্ম। আমরা বিশ্বাস
করি 'সেবাই পরম ধর্ম।' আর আপনারা বিশ্বাস করেন ধর্মের উপাচার। মনুষ্যত্ব
বিসর্জন দিয়ে ধর্মের নামে আত্মকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কোন
কিছুতেই অন্ধবিশ্বাস থাকা ভাল না। আমাকে ক্ষমা করবেন পরমানন্দজী যদি
আমি আপনার ধর্ম বিশ্বাসে কোন রকম আঘাত করে থাকি।

এই কথা বলে ডাক্তার হিরণ সান্যাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

পরমানন্দ বললেন, যে যার বিশ্বাস নিয়েই চলে। এ নিয়ে কোন রকম গোঁড়ামি
থাকা ভাল নয়।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, ডাক্তার কার্লেকার আমার বিশেষ বন্ধু। আমি
কালই আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। দেখবেন আপনি ব্যাধিমুক্ত হয়ে নতুন
জীবন ফিরে পেয়েছেন।

যাত্রার পূর্বে পরমানন্দ তাঁর শ্বেতশুভ্র বসন ও তুলসীকাঠের কন্ঠিমালা পুরীর
সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। এখন আর তাঁর কোন বৈষ্ণবীয় চিহ্ন রইল
না। জীবনের একটি অধ্যায় তাঁর এইভাবেই শেষ হয়ে গেল।

। ১৮ ।

ডাক্তার সান্যাল পরমানন্দকে নিয়ে উপস্থিত হলেন 'সোহাগপুরায়'। ডাক্তার কার্লেকারের চিকিৎসাধীনে থেকে তিনি যাতে আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন তার সব কিছু ব্যবস্থা করে গেলেন। ডাক্তার কার্লেকারকে দেখে এবং তাঁর আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে গেলেন পরমানন্দ। তিনি তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে এ যুগে এমন ষিপ্রতিম ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে এমন আপন করে নিতে পারেন। যে যুগে মানুষ অবিশ্বাস, হানাহানি ও স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই বোঝে া, সে যুগে এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। পরমানন্দ শুনে এসেছেন শ্চান মিশনারিরা নাকি এইভাবে সেবা, যত্ন করে থাকেন, কিন্তু সেখানেও কটা স্বার্থের সম্পর্কের আঁচ পাওয়া যায়। আর এখানে এসে পরমানন্দ দেখছেন াক্তার কার্লেকার ও তাঁর সহযোগীরা যা কিছু করছেন—তার আন্তরিকতা ও মত্বের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

পরমানন্দ এখানে এসেছেন চিকিৎসার জন্য। এ খবরটি অসিত প্রথম জানতে ারে। অসিত দেবলীনাকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে আসে।

ওদের দেখা মাত্র পরমানন্দ শিশুর মতন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অসিত ও দবলীনা কেউই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

অসিত পরমানন্দর হাত ধরে বলল, তুমি এতো বিচলিত হচ্ছো কেন রমেশ্বরদা। তুমি ভাল হয়ে যাবে। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তোমার কান ভয় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পরমানন্দ শান্ত হলেন। দেবলীনার দিকে তাকাতে তাঁর কমন যেন কুণ্ঠার ভাব। কারুরই চোখের দিকে তিনি তাকাতে পারছেন না। ই মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। নিজেকে তিনি বড় াট মনে করছেন।

এবার পরমানন্দ বললেন, বাচ্চু, আমি ঘোর পাপী। আমার পাপের জন্য ামার সারা দেহে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আমার মৃত্যু অবধারিত।

তোমরা আমাকে যতই স্তোকবাক্য শোনাও না কেন আমি জানি—আমি মৃত্যু পথ যাত্রী।

অসিত বলল, এ ধারণা তোমার ভুল। চিকিৎসা করলে তোমার নিশ্চয় রোগ সেরে যাবে।

দেবলীনা কিন্তু কোন কথা বলেননি, তিনি শুধু পরমানন্দকে দেখছিলেন—স্বর্ণ কান্তি, অপরূপ দেহলাবণ্যের অধিকারী পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর এ কী দুর্দশা হয়েছে পুচ্ছহীন চক্ষু, স্ফীত মুখমণ্ডল, বিকৃত নাসিকা, সারা দেহে কুষ্ঠব্যাধিতে এক বীভৎস চেহারা নিয়ে শয্যাশায়ী। অথচ একদিন এঁর মধ্যে ব্রহ্মচারীর দিব্যকান্তি যে হিরণ্যপ্রভার ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করতো। অপরূপ সে রূপলাবণ্য, এককথা বলা যায়, তিনি রূপে গুণে ছিলেন রমণীমোহন। দেখলে দুঃখ হয় দেবলীনার কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ আজ মহাব্যাধিতে আক্রান্ত।

এবার দেবলীনা বললেন, স্বামীজী, আমরা আপনারই মতন সাধারণ মানুষ আপনাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য শুনিয়ে আমরা কোনক্রমেই লাভবান হবো না। সে কারণে আপনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আমি আপনার সেবা করবো দেখবেন আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনি যে ওই সব পাপপুণ্যের কথা বলছেন—ও সবই অসার। ওই নিয়ে তর্ক করা যায়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে ও সবের কোন সম্পর্ক নেই। কি অসিত তুমি কিছু বলো।

অসিত এবার বলল, দেবলীনা আপনার সেবার ভার নিয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে। যাই হোক আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'সোহাগপুরা'। আমি, দেবলীনা ও ডাঃ কর্লেকার এই তিনজনে মিলে বহু কষ্টে এই সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। এখানে শুধু চিকিৎসা নয় আরোগ্যলাভের পর আমরা এইসব সভ্যমুক্ত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকি। কেননা এখনও আমাদের সমাজে এদের কোন ঠাঁই হয় না। তা ছাড়া তুমি হয়তো জানো না একবার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলে সেমানুষ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্য বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। কলকারখানায় চাকরিতে আর পুনর্বহাল করা হয় না। তুমি জানো না, দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ইংরেজ আমলের ১৮৯৮ সালের লেপারএ্যাক্ট অব ইণ্ডিয়া অনুসারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহু বিষয়ে এখন একবার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে আরোগ্য লাভ করলেও তারা ন্যায় বিচারে বঞ্চিত হয়। আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছি তখনও এইসব হতভাগ্যরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

তোমাকে এতসব কথা বলার একটা কারণ—আমরা এইসব নানা কথা ভেবেই এমনি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যেখানে সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম। পরমানন্দ অসিতের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন।

এবার তিনি বললেন, বাচ্চু, আমি আশাই করতে পারিনি তোমাদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। এবার যখন দেখা হয়েছে—তখন আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকবো। একজন কর্মী হিসাবে।

দেবলীনা বললেন, আমরা কিন্তু সকলেই কর্মী। যদি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে খুবই ভাল হয়।

পরমানন্দ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এবার শুধু সাহস করে অসিতের হাতটি চেপে ধরলেন।

যার অর্থ বোধ হয়: 'আমিও তোমাদের একজন।'

এরপর খুব দ্রুত পট পরিবর্তন হয়। প্রায় দুটি বছর ধরে পরমানন্দর চিকিৎসা করার পর তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন। দেবলীনা সত্যি এই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সেবা করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে আবার পরমানন্দকে সুস্থ করে তুলেছেন। দিন নেই রাত্রি নেই সর্ব সময় দেবলীনা শয্যাপাশে থেকে শুশ্রূষা করে গেছেন। বিরামহীন এই পরিচর্যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ডাক্তার কার্লেকারও তাঁর সাধ্যমত এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে যে বিধি আছে সেইরূপ বিধান দিয়েছেন, যাতে রুগী দ্রুত আরোগ্যলাভ করে।

শুধু দেবলীনা নয় সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় পরমানন্দের রোগমুক্তি সম্ভব হয়েছে। এখন আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর অপূর্ব দেহ লাবণ্য। এখন তাঁকে দেখলে মনে হবে তিনি দেবকান্তির অধিকারী। দেখে মনেই হবে না তিনি কখন মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

দেবলীনার সেবার জন্য তিনি একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা করেছিলেন। দেবলীনা তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আমি যা করেছি তা আমার ধর্মের অনুশাসন। আজ আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলেও আমি তা করতাম।

এ কথার পর পরমানন্দ দেবলীনাকে আর অন্য কোন কথা বলতে সাহস পান নি। পরমানন্দর প্রতি দেবলীনার যে দুর্বলতা আছে সে কথা তিনি ঘুণাক্ষরে আর কারুকেই বুঝতে দেন নি। কেননা যা অন্তরের বস্তু তাকে বাহিরে প্রকাশ করে লাভ কি? তা ছাড়া কাল ও পরিবেশ তো অনেক বদলে গেছে। কাজেই যা

অন্তরের জিনিষ তা অন্তরেই থাকুক।

পরমানন্দ এখন সোহাগপুরার কাজের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। প্রশাসনিক কাজে তিনি বেশ দক্ষ। কাজেই তাঁর মতন কোন ব্যক্তি 'সোহাগপুরায়' থাকলে সংগঠনের দিক থেকে সেটা খুবই আশাপ্রদ। তবে পরমানন্দ আশ্রম ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে আশ্রমের প্রভাবমুক্ত করতে পারেননি। তিনি নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত। কাজেই আমিষ খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন না। এটা অবশ্য সংস্কার নয়, তার রুচি। এতে তেমন কোন দোষ দেওয়া যায় না।

আর একটা বিষয় পরমানন্দ বড় অস্বস্তি বোধ করেন, তা হচ্ছে—সন্ধ্যাহ্নিকের সময় তিনি কেমন যেন আনচান করেন। এসব অভ্যাস। এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে সময় লাগবে।

অসিত ও দেবলীনা পরমানন্দর এই সব ভাবগতিক লক্ষ্য করে। তাই একদিন সন্ধ্যার সময় দেবলীনা পরমানন্দকে বললেন, আপনি তো খুব ভাল গান করেন। আসুন আজ আপনি আমাদের একটা গান শোনান।

যে সময় দেবলীনা পরমানন্দকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন সেখানে ডাক্তার কার্লেকার, অসিত ছাড়াও 'সোহাগপুরার' অনেকেই ছিলেন।

কী ভেবে পরমানন্দ বললেন, তবে তাই হোক।

পরমানন্দ গান শুরু করলেন :

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানিনে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো ;
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥"

গান শেষ হবার পর বহুক্ষণ তার রেশ রইল। চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। পরমানন্দর কণ্ঠস্বর মধুর এবং তিনি আবেগে যে গান করলেন তা উপস্থিত সকলের মনকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় মর্মস্পর্শী হয়েছিল। পরমানন্দ যে এত ভাল গান করতে পারেন তা দেবলীনা ছাড়া কেউই

জানতেন না। সকলে এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে কারোর মুখে কোন কথা আসছিল না। তা ছাড়া 'সোহাগপুরার' কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অবকাশ কোথায়? শুধু রাত্রে নিদ্রা যাওয়া ছাড়া বিশ্রামই হয় না। আবার বহুক্ষেত্রে বহুজনের ভাগ্যে রাত্রে নিদ্রা যাওয়াও হয়ে ওঠে না। তারা দিনের বেলা কিছুটা সময় শয্যা গ্রহণ করে নিদ্রার জন্য। কাজেই গান গাওয়া বা গান শোনার যেমন অবকাশ নেই, তেমন সুযোগও হয়ে ওঠে না।

পরমানন্দকে পেয়ে তাঁর কণ্ঠে গান শোনার পর সকলেই বেশ বিমোহিত হয়ে ওঠেন। মন প্রফুল্ল হলে কাজ করার আবার ইচ্ছা হয়।

দেবলীনা প্রথম কথা বললেন, ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ভজন গান শোনাবেন, কিন্তু আপনি তন্ময় কণ্ঠে যে গানটি গাইলেন—তা শুধু সুখশ্রাব্য নয়, হৃদয়গ্রাহী। বহুদিন পরে আমরা এমন মনোরম সন্ধ্যাকে উপভোগ করলাম।

এরপর একজন কে যেন বললেন, আর একটা গান করুন।

পরমানন্দ খুব বিনীতভাবে বললেন, আজ আর নয়। অন্য আর একদিন গান শোনাবো। এখানে সহজ ও স্বাভাবিক হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। তাই বোধ হয় পরমানন্দ বিনীতভাবে অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন।

অসিতও পরমানন্দকে সমর্থন করে বলল, অন্য আর একদিন হবে। এবার থেকে আমরা মাঝে মাঝে সবাই মিলে বসবো, আর সেখানে গান হবে।

পরমানন্দ এতদিন এখানে আছেন, কিন্তু একটি বারের জন্যও দেবলীনাকে জিজ্ঞাসা করেন নি—কেন তুমি আশ্রম ত্যাগ করলে? কিভাবে তোমার সঙ্গে অসিতের যোগাযোগ হলো, বা এখন তোমার ও অসিতের সঙ্গে সম্পর্কটা কি?

এর প্রধান কারণ, দেবলীনা শিকল-কাটা পাখি। সহজে সে পোষ মানবার মত মেয়ে নয়। তা ছাড়া, যে মেয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে, তার বিবেক, বিবেচনা করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। নিজের ভাল মন্দ বোঝার মত বয়সও হয়েছে। অহেতুক এই প্রশ্নে জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। তার চেয়ে অতীতের কোন কথা না বলাই ভাল। কেননা পরমানন্দ দেবলীনার কাছ থেকে সঠিক উত্তর তো পাবেই না, উপরন্তু তাকে বিব্রত করা হবে।

পরমানন্দ অতীতকে ভুলতে চান। তিনি বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন।

এদিকে দেবলীনার কিন্তু আশ্রম জীবনের বহু কথাই মনে পড়ে, কিন্তু তিনি তা মোটেই প্রকাশ করেন না। এই যে প্রকাশ না করা, তা তাঁর নারীসুলভ স্বভাবের

কথাই মনে করিয়ে দেয়। অন্য মেয়ে হলেও যা করতো দেবলীনাও তাই করেছেন; তিনি তার ব্যতিক্রম নন।

পরমানন্দ কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারেন অসিতের সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্কটা শুধু বন্ধুত্বের নয়, তার চেয়েও কিছু বেশী।

এ ব্যাপারে 'সোহাগপুরার' কেউই তেমন মাথা ঘামায় না। তা ছাড়া, এ কথা তো খুবই সত্যি যে অন্তরের একটা নিবিড় সম্বন্ধ না গড়ে উঠলে দুটি মানুষ কখনই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন একটা কর্মযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করতে পারে না। কাজেই অসিত ও দেবলীনার সম্পর্ক প্রশ্নাতীত। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কারোর সময় নেই। এখন সবাই এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের সামিল হয়েছে। শুধু একটি কথা সত্য যে কারোর মনে কোন কপটতা নেই। সকলেরই নিবেদিত প্রাণ।

* * * * *

বেশ কিছু দিন হলো অসিতকে দেখা যায় 'সোহাগপুরার' কাজে সে ডুবে থাকে। খাওয়া ঘুমের তার সময় হয় না। একটা অনিয়মের মধ্যে সে নিজেকে কেমনভাবে জড়িয়ে ফেলে। দেবলীনা অসিতের এই সাম্প্রতিক কাজকর্মকে মোটেই অনুমোদন করেন না। আপত্তি জানিয়েছেন। অসিত কিন্তু যুক্তি দিয়ে সে সব আপত্তি খণ্ডন করে দেয়।

একদিন রাত্রে অসিত যখন শুতে এসেছে তখন দেখে দেবলীনা না ঘুমিয়ে জেগে বসে আছেন। তাঁর চোখে মুখে উদ্বিগ্নের চিহ্ন।

অসিত ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। তাই সে খুব নম্রভাবেই দেবলীনাকে বলল, তুমি এখন ঘুমোওনি? রাত্রি হয়ে যাওয়ার জন্য আমি সত্যি খুব দুঃখিত।

দেবলীনা বললেন, আজ আমি তোমার জন্য জেগে বসে আছি।

অসিত বিস্মিত হয়ে বলল, কেন? আজকাল তো আমি দেরী করেই ফিরে থাকি। তুমি তো জানো আমি দূরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ শুরু করেছি। তুমি কেন আমার জন্য না ঘুমিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে?

এই কথা বলে অসিত তার জামা কাপড় বদলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। দেবলীনাকে বলল, এসো শুয়ে পড়ো।

দেবলীনা কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকল বটে, কিন্তু ওরা দুজনেই অনুভব করছিল—কোথায় যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

দেবলীনা তাই সরাসরি কিছু বলতে চাননি। শুধু একটাই প্রশ্ন তিনি করে

ছিলেন, অসিত তুমি কি অসুখী ?

কেন এই প্রশ্ন ?

অসিত, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব অসুখী।

অসিত এবার বলল, তুমি তার আগে আমাকে একটা কথা বলবে ?

কি কথা ? দেবলীনার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক মনে হলো।

তুমি কি পরমানন্দ ব্রহ্মচারীকে ভালবাস ?

দেবলীনা বললেন, হ্যাঁ।

তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। তারপর তিনি বললেন, আর কিছু জানতে চাও না ?

অসিত বলল, না। যা জানতে চেয়েছিলাম তা জানা হয়ে গেছে।

দেবলীনা বললেন, সব জানা তোমার হয়নি। তবে শোন : আমি তোমাকেও ভালবাসি। এখন তুমি বলবে, তা কি করে সম্ভব ? আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেব—তা সম্ভব। একটি মেয়ে দুজন পুরুষকে ভালবাসতে পারে। তবে সে ভালবাসার জাত আলাদা। একের সঙ্গে অপরের কোন মিল খুঁজে পাবে না। এমন কি তুলনা করাও যাবে না।

অসিত বলল, আমি অনুমান করেছিলাম তুমি পরমানন্দজীকে ভালবাস। এখন তুমি স্বীকার করাতে আমি স্বস্তি পেলাম।

অসিত আত্মপ্রবঞ্চনা করো না। তুমি কিছুতেই স্বস্তি পেতে পারো না। তুমি আরো অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করলে। শোন অসিত, দেহ ও মন দুটি ভিন্ন সত্ত্বা। তোমাকে যা বললাম তা আমার অকপটে এক স্বীকারোক্তি। তুমি বোধ হয় প্রকৃত ভালবাসার অর্থ বোঝ না। তা যদি বুঝতে তবে তুমি এই অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে এতদিন ঘুরে বেড়াতে না। তোমাকে যে ভালবাসি তার মধ্যে কোন খাদ নেই। তুমি আমার দুঃখ, আমার ভালবাসার মূল্য কিছুই বোঝনি। তা যদি বুঝতে তবে পরমানন্দর নামটা পর্যন্ত করতে না। তবে হ্যাঁ, আমি তাঁর সেবা করেছি প্রাণ পাত করে। কিন্তু কেন বলতো ? তুমি তো সে নিয়ে একটিবারও আমাকে কিছু বললে না। ওই ভাবে সেবা করার জন্য আমাকে নিষেধ করতে পারতে। তবে শোন কেন আমি সেবা করেছিলাম ? আমি সেবা করেছিলাম শুধু তোমার জন্য। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁকে ওই ভাবে সেবা করেছি। পরমানন্দজী না থাকলে তো তোমাকে আমি কোনদিন পেতাম না। আজ যে আমি তোমাকে পেয়েছি তা পরমানন্দজীর জন্যই তো। কাজেই তাঁকে সে কারণে ভালবাসি।

আর তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমাকে সুখী করেছো। আমার জীবনের সব কিছুই তোমার জন্য বদলে গেছে। শোন অসিত, ঈর্ষা ভালবাসাকে ধ্বংস করে, আবার ঈর্ষা ভালবাসাকে মহিমান্বিত করে তোলে।

অসিত আর কোন কথা না বলে দেবলীনাকে খুব কাছে টেনে নিল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, ভালবাসার কি জ্বালা বুঝবে না দেবলীনা। আমার সারা দেহ পুড়ে পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

দেবলীনা অসিতকে আদর করে বললেন, এমন ভুল তুমি আর কখন করো না। যখনই দেখবে অবিশ্বাস এসে গেছে তখনই জানবে ভালবাসার অপমৃত্যু হয়ে গেছে। এই দেখ না তোমার ও আমার সম্পর্ক কোন আইন বা ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। আমরা দুজনেই মুক্ত। ভালবাসাই আমাদের বন্ধন। ভালবাসাহীন জীবন যে কি দুঃসহ তা কি তুমি বুঝতে পার? তাই বলি, তুমি নিজেকে কত কষ্ট না দিয়েছ। যখনই মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবে তখনই তুমি আমাকে বলবে। এতে ভুল বোঝাবুঝি কম হবে। ভালবাসায় কিছুতেই চীড় খাবে না।

অসিত দেবলীনার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, দোহাই তোমাকে, তুমি আর ওই সব কথা বলো না।

তারপর অসিত ও দেবলীনার আর কোন কথা হয়নি।

পরমানন্দ এখন 'সোহাগপুরার' সক্রিয় কর্মী। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা এখানে খুব কাজে লেগেছে। দেবলীনা, অসিত ও কার্লেকার এখন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। পরমানন্দকে পেয়ে তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন বলে আশা করেন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে 'সোহাগপুরায়'। শুধু চিকিৎসা নয়, সেই সঙ্গে পুনর্বাসন। প্রত্যেকে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য বহুমুখী কর্মধারা মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। পরমানন্দ পেয়েছেন নতুন দিগন্তের সন্ধান। এই সব মানুষ 'সোহাগপুরার' সুখ দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এখানে সেবাই ধর্ম এবং কর্ম হচ্ছে জীবন। কাজেই মতান্তর বা মনান্তরের কোন স্থান নেই।

দেবলীনা পাশ্চাত্যে বৈদান্তিকের মুখনিঃসৃত বাণী শুনেছেন। ধর্ম নিয়ে আলোচনারত বহু সাধু ও সন্তকে দেখেছেন। তারপর দেখেছেন ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জীবন। আস্বাদন করেছেন বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে কীভাবে ওই ধর্মে সহজযানের প্রভাবে পূতিগন্ধময় প্রণালীর দ্বারা

[illegible]

একালের রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব এবং বিদেশীদের কাছে নব চেতনা। দেবলীনাও মেনে নিয়েছিলেন : 'সামথিং নিউ, সামথিং একসাইটিং' বলে। তারপর ভেদাভেদ তত্ত্বা 'রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।'

এ সব থেকে মুক্ত হয়ে দেবলীনা চলে এলেন 'সোহাগপুরায়'। এখানে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষকে। নানা জাতি, নানা ধর্মের মানুষ এখানে আসে, আর তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তৃপ্তিলাভ করেন দেবলীনা। এ কাজে যে আনন্দ আছে তা তিনি উপলব্ধি করেন। এ সবেরই মূলে অসিত। আর অসিত যদি না থাকত তাহলে দেবলীনাও বোধ হয় এখানে টিঁকতে পারতেন না। দেবলীনা অসিতকে ছাড়া এখন আর থাকতে পারে না।

কদিন হলো অসিত গেছে জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশনে যোগদানের জন্য। কথা ছিল দেবলীনাও যাবেন সঙ্গে। কিন্তু শেষমুহূর্তে সে কর্মসূচী বাতিল হয়ে যায়। দেবলীনা সাতদিনের ব্যাপার বলে তেমন কোন আপত্তি করেন নি। আজ অসিত ফিরবে। এই কটা দিন বেশ মনকষ্টে কেটেছে দেবলীনার। কিন্তু মুখে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। আসার সময় অসিত প্যারিস হয়ে ফিরবে। এইটুকু দেবলীনার পরম সান্ত্বনা কিন্তু আসার সময় পার হয়ে গেলে দেবলীনা খুব অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁর এই মুহূর্তে খুব অসহ্য বলে মনে হয়।

হঠাৎ ডাক্তার কার্লেকার একটা খবরের কাগজ হাতে করে ছুটতে ছুটতে এসে দেবলীনাকে একটি দুঃসংবাদ জানিয়ে গেলেন। যে বিমানে অসিতের কলকাতা ফেরার কথা সেই বিমানটি আকাশ পথে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান ধ্বংসের কারণ এখনও জানা যায় নি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিমানে দুশো এগারো জন যাত্রীর সকলেই নিহত হয়েছে।

এ সংবাদে দেবলীনা স্তম্ভিত হয়ে যান। মুখে তিনি কোন কথাই বলেন নি। শুধু দেখা যায় তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। এই প্রথম দেখা গেল দেবলীনার চোখে জল, তিনি কাঁদছেন। তাঁকে কেউ কখন কাঁদতে দেখেনি।

'সোহাগপুরায়' সেদিন শোকের ছায়া নেমে আসে।

এর পরের ঘটনা আমার সঠিক কিছু জানা নেই। তবে দেবলীনা ইংরাজিতে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম 'দ্য প্রাইস অফ লাইফ'। এই বইটিতে দেখান হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায় অসিতের মৃত্যু হয়নি। অসিত কয়েকদিন পরেই 'সোহাগপুরায়' ফিরে এসেছিল এবং দেবলীনা এরপর থেকে অসিতকে আর কখন

খুশী হয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন পরমানন্দ। অথচ এই পরমানন্দ একদিন সুস্থ হয়ে উঠে অসিতকে বলেছিলেন, এখানে ধর্ম কোথায়?

অসিত বলেছিল, ধর্ম না থাক, সেবা আছে। আর এখানে সেবাকে যদি বলি ধর্ম, তাহলে সব তর্কের অবসান হয়ে যায়।

হতে পারতো এটা একটি বেদনাবিধুর কাহিনী, কিন্তু তা না হয়ে এটি হয়ে উঠলো শাস্ত্র ও প্রথা বিরোধী অন্তর দর্শনের কাহিনী।

গ্রন্থশেষে দেবলীনা লিখেছেন: প্রেমে আনন্দে আমরা পরস্পরের দায়বদ্ধ। কাজেই অসিতের সঙ্গে আমার অনন্তকালের বন্ধন। ইচ্ছে করলেই কি সে 'মুক্তি' পেতে পারে? মুক্তি তারও নেই আমারও নেই। প্রেমের জগতে 'মুক্তি' কথার মানেই নেই। জীবন এ রকমই।